তারীখে মিল্লাত (২য় খণ্ড)

খেলাফতে রাশেদা

(পরিমার্জিত সংস্করণ)

মূল

কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী

অনুবাদ

মাওলানা লিয়াকত আলী

দাওরায়ে হাদীস , লালবাগ জামিয়া

বি.এ. অনার্স এম. এ. (সাংবাদিকতা)

মুহাদ্দিস মাদ্‌রাসা দারুর রাশাদ

www.e-ilm.weebly.com

খেলাফতে রাশেদা

মূলঃ কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী

অনুবাদ ঃ মাওলানা লিয়াকত আলী

অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশঃ
আগষ্ট ১৯৯৩

দ্বিতীয় প্রকাশঃ
এপ্রিল ১৯৯৭

পরিমার্জিত তৃতীয় প্রকাশঃ
ডিসেম্বর ২০০৩

প্রাপ্তিস্থান

* **আল কাউসার প্রকাশনী,**
৫০ বাংলাবাজার (আন্ডারগ্রাউন্ড, ঢাকা)

* **আল কাউসার লাইব্রেরী,**
মুসলিম বাজার, মিরপুর-১২,
পল্লবী, ঢাকা-১২১৬।

* **থানভী লাইব্রেরী,**
কবাজর, ঢাকা।

* **মাদরাসা দারুর রাশাদ,**
মিরপুর-১২, পল্লবী, ঢাকা।

[অনুবাদক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

মূল্য ঃ আশি টাকা।

কম্পিউটার কম্পোজঃ
আল-কাউসার কম্পিউটার্স
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

মুদ্রণঃ মোহাম্মাদী প্রিন্টিং প্রেস

www.e-ilm.weebly.com

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ

অফিস ৮৯ /১/ ই , নয়া পল্টন লাইন, ঢাকা- ১০০০

সূত্র নং- তারিখ-

নাহমাদুহু অনুসল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম।

ইতিহাস মানব সভ্যতার অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইতিহাসই মানুষকে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা দিতে পারে। অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা নিয়ে জাতিকে অগ্রসর হতে হয় উন্নতির দিকে । আল্লাহর শোকর, গৌরবময় কীর্তির ইতিহাস একমাত্র ইসলামই পেশ করতে পারে যা আজও অক্ষত আছে। ইসলামের গৌরবময় কীর্তির ইতিহাস মুসলিম মিল্লাতের নিত্য পাঠ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় হলেও বাংলা ভাষায় ইসলামের ইতিহাসের প্রামাণ্য গ্রন্থের সংখ্যা একেবারেই বিরল। এ বিষয়ে উর্দু ভাষায়ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশী নয়। ফলে পাঠ্য তালিকায় কোন পুস্তকখানা অন্তর্ভূক্ত করা যায়, তা ছিল আমাদের এক বিশেষ চিন্তার বিষয়। কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী লিখিত তারীখে মিল্লাত উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় তা বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া, বাংলাদেশ (বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড) এর পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত। উম্মতে মুহাম্মাদীর দিক নির্দেশনা এ যুগেই নিহিত। তাই খেলাফতে রাশেদার ইতিহাস ইসলামী উম্মাহর জন্য অতীব জরুরী। বাঙালী মুসলমান ভাইবোনদের সে চাহিদা মেটাতে তারীখে মিল্লাতের খেলাফতে রাশেদা অংশ (২য় খণ্ড) বাংলা ভাষায় প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হচ্ছিল। স্নেহাস্পদ মাওলানা লিয়াকত আলী সে চাহিদা মেটাতে প্রয়াস চালিয়েছেন। আশা করি পুস্তকখানা ইতিহাসের শিক্ষক-শিক্ষার্থী-গবেষক ও সাধারণ পাঠক সকলেরই উপকারে আসবে। আমি পুস্তকখানার বহুল প্রচার কামনা করি।

আব্দুর জব্বার

তারিখ- ২০/০৭/১৯৯৩

সাধারণ সম্পাদক

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ।

www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

প্রথম যে দিন তারীখে মিল্লাতের খেলাফতে রাশেদা খণ্ডটি হাতে পাই সেদিনই আমি এর বিষয়বস্তুর সমৃদ্ধি ও বর্ণনাশৈলীতে চমৎকৃত হই। খেলাফতে রাশেদা সম্পর্কিত যেসব তথ্য খুঁজে বের করতে বৃহদায়তন কিতাবসমূহ দিনের পর দিন ওলট-পালট করতে হতো, এ পুস্তকে তা পেয়ে যাচ্ছিলাম অতি অনায়াসে। গ্রন্থকার নেহায়েত পরিশ্রম করে ইসলামের ইতিহাসের এ বিশেষ অধ্যায়টি বিন্যস্ত করেছেন অতি নৈপুণ্যের সাথে। অসংখ্য কিতাব ঘেঁটে ইতিহাসের সঠিক বর্ণনাটি তিনি বের করে এনে এখানে সন্নিবেশিত করেছেন। তাই এমন একখানা পুস্তক বাংলা ভাষার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করুক এ কামনা ছিল প্রথম থেকেই। বর্তমান প্রয়াস সে আকাংক্ষারই অভিব্যক্তি। তবে এ প্রচেষ্টায় কতটুকু সফল হয়েছি তা বিচার করবেন পাঠকবর্গ। কোথাও কোন অসংগতি ধরা পড়লে আমার দুর্বলতাই এজন্য দায়ী হবে। পুস্তকখানার উন্নয়নে সহৃদয় পাঠকবর্গের পরামর্শ স্বাগত জানাতে সদা প্রস্তুত থাকবো আমরা। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সাধারণ ও শিক্ষার্থীদের চাহিদা মেটাতে এ পুস্তক সহায়ক হোক– আল্লাহর নিকট এ প্রার্থনাই রইলো।।

মাদ্‌রাসা দারুর রাশাদ | বিনীত

১১ ই ডিসেম্বর ২০০৩ খৃঃ | **অনুবাদক**

www.e-ilm.weebly.com

পূর্বাভাষ

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বিশ্বজাহানের পালন কর্তা। দরূদ ও সালাম নবীকূলের নেতার প্রতি, তাঁর পূতঃপবিত্র পরিজন এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রতিও।

"তারীখে মিল্লাত সিরিজ" এর দ্বিতীয় খণ্ড " খেলাফতে রাশেদা" পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত। খেলাফতে রাশেদা যুগ ইসলামের ইতহাসের ললাটের দীপ্তি। জাতির যে নবীনেরা, জীবনের রাজপথে পা রাখছে, তারা যদি এ যুগের ঘটনাবলীকে পথপ্রদীপ হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে তারা নিঃসন্দেহে পার্থিব কল্যাণ ও পারিত্রিক সাফল্যের গন্তব্যস্থলে পৌছুতে পারে। এ কারণেই এ খণ্ডটি বিন্যস্ত করতে কিছুটা বিস্তৃতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। সকল ঘটনা নতুন পুরাতন নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থসমূহ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেগুলো হুবহু ঐতিহাসিকসুলভ দায়িত্ববোধের সাথে বাণীবদ্ধ করা হয়েছে। ঘটনাবলী বর্ণনার সাথে সাথে ঘটনাবলীর হেতু-কারণ এবং তার প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল সম্পর্কে কোথাও কোথাও আলোকপাত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গবেষণার মনোভাব ও দৃষ্টির প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়। সহজ সরল ভাষা এবং আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনাভঙ্গী অবলম্বন করা হয়েছে।

এ নিজ প্রচেষ্টার বর্ণনা যা সর্বতো মানবীয় প্রচেষ্টা এবং আমার ন্যায় নগণ্য মানুষের প্রয়াস। তদুপরি এ গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এভাবে লেখা হয়েছে যে, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও লিপিকরণ প্রক্রিয়া একই সাথে সম্পন্ন হয়েছে। অতএব, এ প্রচেষ্টা যদি চিন্তাশীল ও দূরদৃষ্টিসম্পন্নদের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হয়, তাহলে ক্ষমার আবেদন রইলো।

হে প্রভু! আমরা বিস্মৃত হলে বা ভুল করলে তুমি আমাদের পাকড়াও করো না। হে প্রভু! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করো, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

—গ্রন্থকার

www.e-ilm.weebly.com

www.e-ilm.weebly.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অবতরণিকা	১১
খেলাফত	১২
খেলাফত প্রতিষ্ঠা	১৩
খেলাফতের শর্তসমূহ	১৬
নির্বাচন পদ্ধতি	১৮
শীয়া দৃষ্টিকোণ	১৮
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা	২০
খলীফা ও শূরা	
খেলাফতে রাশেদা	২৩
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক - (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব	২৪
কতিপয় কর্মগত ইঙ্গিত নিম্নরূপ ঃ	২৫
কতিপয় উক্তিগত ইঙ্গিত নিম্নরূপ ঃ	২৬
চার খলীফার পর্যায়ক্রমিক অবস্থান	২৭
আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর যুগ	
খলীফা নির্বাচন	২৯
বনূ সায়েদার বৈঠকখানা	২৯
সাধারণ বায়আত	৩১
হযরত আলী (রাঃ) এর বিরতি	৩২
খেলাফতপূর্ব অবস্থা	৩৩
ইসলাম প্রচার	৩৩
হাবশায় হিজরত	৩৪
মদীনায় হিজরত	৩৫
জিহাদে অংশগ্রহণ	৩৬
আবূ বকর (রাঃ) এর হজ্জ	৩৬
জামাআতের ইমামতি	৩৬
দৃঢ়তা ও স্থিরতা	৩৭
খেলাফতকালের ঘটনাবলী	
উসামা বাহিনী	৩৭
ধর্মান্তর ফিতনা	৩৯
ধর্মান্তরের কারণ	৩৯
সিদ্দীকী দৃঢ়তা	৩৯
তুলায়হার তওবা	৪১
মালেক ইবনে নুওয়য়রার হত্যা	৪২
আসওয়াদ আনাসীর হত্যা	৪৩
বাহরাইনের ফেতনা	৪৫
হযরত আলা (রাঃ)-এর কারামতি	৪৭
ইসলামের মহান অনুগ্রহকারী	৪৮
বিজয়ের সূচনা	৪৯
পারস্য	৪৯
রোম	৫১
পারস্য, রোম ও মুসলমান	৫২
ইরাক অভিযানের ঘটনাবলী	৫৪
কাজিমা যুদ্ধ	৫৫
ছানী যুদ্ধ	৫৫
দুলজা যুদ্ধ	৫৫
উল্লায়স যুদ্ধ	৫৬
হীরা বিজয়	৫৬
হীরা বিজয়ের পর	৫৭
দুই পত্র	৫৭
দ্বিতীয় পত্রের বিষয়বস্তু ছিল ঃ	৫৮
আনবার ও আইনুত তামার বিজয়	৫৮
দৌমাতুল জানদাল বিজয়	৫৯
হীরায় প্রত্যাবর্তন	৫৯
শাম অভিযানের ঘটনাবলী	৬০
সোনালী উপদেশমালা	৬০
হিরাক্লিয়াসের পরামর্শ	৬০
সম্মিলিত মোকাবেলা	৬১
সাইফুল্লাহর আগমন	৬২
য়ারমূক যুদ্ধ	৬২
ইসলামী বাহিনীর বিন্যাস	৬৩
কারা বেশী?	৬৪
মৃত্যু শপথ	৬৪
ইখলাসের চিত্র	৬৫

www.e-ilm.weebly.com

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)
এর অসুখ ও ইন্তেকাল ৬৬
এক নজরে হযরত আবূ বকর
(রাঃ)-এর খেলাফত ৬৭
হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর পরিবার ৬৭
আবূ বকর (রাঃ)-এর গভর্নরগণ ৬৮

উমর ফারূক (রাঃ) এর যুগ

হযরত উমর (রাঃ) এর নির্বাচন ৬৯
খেলাফতপূর্ব অবস্থা ৭০
ইসলাম গ্রহণ ৭০
হিজরতের ঘোষণা ৭১
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৭২
নবী প্রেম ৭৪
সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এর সঙ্গ ৭৪

খেলাফতকালের ঘটনাবলী

ইরাক বিজয় ৭৪
রুস্তমের অধিনায়কত্ব ৭৬
নামারেক যুদ্ধ ৭৬
কসকর যুদ্ধ ৭৭
ইসলামের সাম্য ৭৭
মারওয়াহা যুদ্ধ ৭৭
অপরিণামদর্শী সাহস ৭৮
বুওয়ব যুদ্ধ ৭৯
তাগলাব যুবক ৭৯
ইরানের সিংহাসনে য়াজদগারদ ৮০
কাদেসিয়্যা যুদ্ধ ৮১
ইরান দরবারে ইসলামী দূত ৮২
যুদ্ধ শুরু ৮৫
আরমাছ দিবস (স্তূপ দিবস) ৮৬
আগওয়াছ দিবস ৮৬
আবু মিহজান ছাকাফী ৮৭
উমাস দিবস ৮৮
যুদ্ধের সমাপ্তি ৮৮
দূতের পিছনে খলীফা ৮৯
সাধারণ নিরাপত্তা ৮৯
সম্মুখ গমন ৯০
বাহ্‌রাশীর বিজয় ৯০
মাদায়েন বিজয় ৯১
শ্বেত প্রাসাদ ৯২
দুনিয়া দ্বীনদারদের আয়ত্তে ৯২
জালুলা যুদ্ধ ৯৩
তিকরীত যুদ্ধ ৯৪
কূফা ও বসরা স্থাপন ৯৫
বাহ্‌রাইন থেকে পারস্যে আক্রমণ ৯৭
আহওয়াজ বিজয় ৯৮
যিম্মীদের সাথে সদাচার ৯৮
রামাহ্‌রমুজ ও তস্তর বিজয় ৯৯
গায়েবী মদদ ১০০
মদীনায় আহওয়াজ শাসক ১০০
সম্মুখ গমণের সিদ্ধান্ত ১০২
নিহাওয়ান্দ বিজয় ১০২
নু'মান ইবনে মুকাররিনের যাত্রা ১০৩
নু'মানের শাহাদাত ও বিজয় ১০৪
ইরান অধিকার ১০৪
হামাদান বিজয় ১০৫
তবরিস্তান বিজয় ১০৬
ইসপাহান বিজয় ১০৭
আজারবাইজান বিজয় ১০৭
বাব বিজয় ১০৮
খোরাসান বিজয় ১০৯
ফাসা ও দারুলজাবরু বিজয় ১১০
কিরমান বিজয় ১১০
সিজিস্তান বিজয় ১১১
মাকরান বিজয় ১১১

শাম ও ফিলিস্তীনের বিজয়সমূহ

দামেশ্‌ক বিজয় ১১১
খালেদের পুরুষোচিত সাহসিকতা ১১২
ফাহাল যুদ্ধ ১১৩
মারজেরোম যুদ্ধ ১১৪

www.e-ilm.weebly.com

হিমস বিজয় ১১৪
কিন্নাসরীন বিজয় ১১৫
বিদায় হে শাম ১১৬
হালাব বিজয় ১১৬
ইনতাকিয়া বিজয় ১১৭
আজনাদাইন যুদ্ধ ১১৮

বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় ১২২

ইসলামের খলীফার শাম সফর ১২২
সন্ধির চুক্তিপত্র ১২৩
বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ ১২৩
উমরী মসজিদ নির্মাণ ১২৪
হিমসে রোম আক্রমণ ১২৫
জাজিরা বিজয় ১২৬
মহামারী প্লেগ ১২৭
সর্বশেষ শাম সফর ১২৯
মহা দুর্ভিক্ষ ১২৯
মিসর বিজয় ১৩০
প্রাথমিক বিজয়সমূহ ১৩১
কসরেশামা বিজয় ১৩১
অন্যান্য বিজয় ১৩৩
আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় ১৩৪
বিজয় দূত মদীনায় ১৩৪
ফুসতাত প্রতিষ্ঠা ১৩৫
নীল বধূ ১৩৬
বারকা বিজয় ১৩৭
হযরত উমর (রাঃ) এর শাহাদাত ১৩৭
হযরত উমর (রাঃ) এর সন্তানাদি ১৩৯
হযরত উমর (রাঃ) এর আঞ্চলিক প্রশাসকগণ ১৪০

উছমান (রাঃ) এর যুগ

উমর ফারূক (রাঃ) এর অসিয়ত ১৪১
খলীফা নির্বাচন ১৪২
খেলাফতপূর্ব অবস্থা ১৪৪
ইসলাম গ্রহণ ১৪৪
হাবশায় হিজরত ১৪৫
জিহাদে অংশগ্রহণ ১৪৫
দান ও বদান্যতা ১৪৬
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ১৪৭

খেলাফতকালের ঘটনাবলী

খলীফারূপে প্রথম খুতবা ১৪৭
প্রথম মোকদ্দমা ১৪৮

বিজয়সমূহ

আজারবাইজান ও আরমেনিয়া ১৪৯
উম্মে আবদুল্লাহর বীরত্ব ১৫০
আনাতুলিয়া ও সাইপ্রাস ১৫১
মিসর ও পশ্চিম দেশ ১৫২
পারস্য, খোরাসান ও তবরিস্তান ১৫৪
য়াজদগারদ হত্যা ১৫৫

অভ্যন্তরীণ কলহ ঃ কারণ ও ফলাফল একটি সমীক্ষা ১৫৬

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ১৫৯
বসরা ১৬০
কূফা ১৬০
শাম ১৬২
মিসর ১৬৪
আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের পরামর্শ বৈঠক ১৬৫
তদন্ত দল ১৬৭
দুষ্কৃতিকারীদের পরামর্শ ১৬৮
হযরত উছমান (রাঃ) এর বক্তৃতা ১৬৯
দুস্কৃতিকারীদের যাত্রা ১৭১
দুষ্কৃতিকারীরা মদীনায় ১৭২
অবরোধ ১৭৩
অপূর্ব দৃঢ়তা ও অবিচলতা ১৭৪
শাহাদাত ১৭৫
দুঃখজনক পরিণতি ১৭৭
উছমান (রাঃ) এর পরিবার ১৭৮
হযরত উছমান(রাঃ)এর আমেলগণ ১৭৯

আলী (রাঃ) এর যুগ

খলীফা নির্বাচন ১৮১
খেলাফত পূর্ব অবস্থা ১৮২
ইসলাম গ্রহণ ১৮২
হিজরত ১৮৩
বৈবাহিক সম্পর্ক ১৮৪

www.e-ilm.weebly.com

যুদ্ধে অংশগ্রহণ ১৮৫
বারাআতের ঘোষণা ১৮৬
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ১৮৬
খেলাফতের ভাষণ ১৮৭
প্রতিশোধ দাবী ১৮৭
আঞ্চলিক শাসকদের অপসারণ ১৮৮
মুআবিয়া (রাঃ) এর পক্ষ থেকে
আলী (রাঃ) এর নামে পত্র ১৮৯
হযরত আয়েশা (রাঃ) এর প্রস্তুতি ১৯০
বসরার পথে হযরত আয়েশা (রাঃ) ১৯২
মোকাবেলা ও সন্ধি ১৯৩
আয়েশা (রাঃ) এর বসরা আয়ত্ত ১৯৩
হযরত আলী (রাঃ) এর ইরাক সফর ১৯৪
কূফাবাসীর সাহায্য কামনা ১৯৫
সন্ধি প্রচেষ্টা ১৯৬
সাবাঈ গোষ্ঠীর চক্রান্ত ১৯৮
সন্ধি বিফল ১৯৮
উট যুদ্ধ ২০০
সিফফীন যুদ্ধ ২০২
উভয়পক্ষের যুদ্ধ প্রস্তুতি ২০২
সন্ধি প্রচেষ্টা ২০৪
যুদ্ধ শুরু ২০৪
সাময়িক সন্ধি ২০৫
সর্বশেষ সন্ধি প্রচেষ্টা ২০৬
ফয়সালাকারী লড়াই ২০৮
সালিসী চুক্তি ২১০
খারেজীদের আত্মপ্রকাশ ২১১
সালিসির ফল ২১৪
খারেজীদের বিশৃঙ্খলা ২১৮
নাওরাওয়ান যুদ্ধ ২১৯
খিররীত ফিতনা ২২০
কূফীয়দের শাম আক্রমণ অনীহা ২২১
মিসরের ঘটনাবলী ২২১
বসরার গোলযোগ ২২৫
মুআবিয়া (রা) এর বিক্ষিপ্ত আক্রমণ ২২৬
হিজায ও য়ামানে মুআবিয়ার
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ২২৭
হযরত আলী (রা) এর শাহাদাত ২২৮
আলী (রা) এর পরিবার ২৩০

হাসান (রা)এর যুগ

নির্বাচন ও মোকাবেলার ইচ্ছা ২৩২
সন্ধি ২৩৩

খেলাফতে রাশেদা ব্যবস্থা

খেলাফতের মর্যাদা ২৩৫
শাসন পদ্ধতি ২৩৬
খেলাফতে রাশেদার বৈশিষ্ট্য ২৩৬

বিচার কাঠামো ২৩৯

প্রতিরক্ষা কাঠামো

সেনা দফতর চালু ২৪২
যুদ্ধ পদ্ধতি ২৪২
যুদ্ধাস্ত্র ২৪৩
রণ নৈপুণ্য ২৪৩

অর্থনৈতিক কাঠামো ২৪৫

রাজস্ব ২৪৬
জিযিয়া ২৪৭
গনীমত ২৪৭
রাজস্ব আদায়ে সতর্কতা ২৪৮
জ্ঞানবিদ্যা
কুরআন কারীম ২৪৮
হাদীছ শরীফ ২৫০
ফিকাহ ২৫১
অন্যান্য বিদ্যা ২৫২
নির্মাণ ২৫৩
বিবিধ ব্যবস্থাপনা
মুদ্রা ২৫৪
ডাক ২৫৪
তারিখ ২৫৫
গ্রন্থপঞ্জী ২৫৬

www.e-ilm.weebly.com

অবতরণিকা

খেলাফত

ইসলামে "খেলাফত" বলতে বুঝায় সেই ঐশী শাসনব্যবস্থা যা আল্লাহর সৃষ্টিকুলের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের দায়িত্ব বহন করে, যা ঐশী বিধানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা দুনিয়ার আনাচ কানাচ থেকে অন্যায় ও অবিচারের ময়লা আবর্জনা সাফ করে দেয় এবং ন্যায় ও সুবিচারের শোভনীয় সুরভিত ফুলে সাজিয়ে তাকে জান্নাতের ঈর্ষনীয় বস্তুতে পরিণত করে।

এ ঐশী প্রশাসনের প্রধানকে বলা হয় "খলীফা"। কেননা তিনি হন পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি এবং খলীফা শব্দের অর্থও তা-ই। কুরআনুল করীমে পার্থিব খেলাফতকে অতীব মহা নেয়ামত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ নেয়ামত আল্লাহর সৎকর্মশীল ও অনুগত বান্দাদের দান করা হতে থাকে, যাঁরা এ দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা রাখতেন।

هو الذى جعلكم خلائف الأرض

"আর তিনিই (আল্লাহ) যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর খলীফা করেছেন।" (আনআম ১৬৫)

واذكروا اذ جعلكم خلفآء من بعد قوم نوح

"স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদেরকে নূহ জাতির পর খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) করলেন।" (আরাফ ৬৯)

يا داؤد انا جعلنك خليفة فى الأرض

"হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীর খলীফা করেছি"। (সোয়াদ ২৬)

ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرثها عبادى الصالحين

"এবং আমি যবূরে নসীহতের পর লিখে দিয়েছি যে, পৃথিবীর উত্তরাধিকার লাভ করবে আমার সৎকর্মশীল বান্দাগণ"। (আম্বিয়া ১০৫)

মদীনায় হিজরতের পরেই যখন মুসলমানরা সবদিক থেকে শত্রুবেষ্টিত ছিলেন, একদিকে মক্কাবাসীরা মদীনায় এসে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য নিজেদের অস্ত্র শাণিত করছিল, অন্যদিকে স্বয়ং মদীনার য়াহূদ ও মুনাফিকরা মুসলমানদের ফাঁসাতে নতুন নতুন জাল পাতছিল, তখন আল্লাহ তাআলা এই দুশ্চিন্তার ভিড়ের মধ্যেই তাদের সান্ত্বনা দান করলেন ঃ

وعد الله الذين أمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم و ليبد لنهم من بعد خوفهم امنا

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীর খেলাফত দান

www.e-ilm.weebly.com

করবেন যেমন তিনি পূর্বতন (সৎকর্মশীল) সম্প্রদায়সমূহকে দান করেছিলেন, তিনি তাদের জন্য সে দ্বীনকে শক্তিশালী করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য নির্বাচন করেছেন এবং তাদের ভীতির দিনগুলোকে নিরাপত্তাকালে রূপান্তরিত করে দিবেন"। (নূর ৫৫)

আল্লাহর এ ওয়াদা অতি শীঘ্র বাস্তবায়িত হয়েছিল। হিজরতের দশ বছর পরেই এ মজলুম অসহায় নিঃস্ব মুসলমানরাই পুরো আরব উপদ্বীপে ঐশী প্রশাসনের পতাকা স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা একদিকে পারস্যরাজের ক্ষমতার প্রতি ভীতি প্রদর্শন করছিলেন, অন্যদিকে রোম সম্রাটের শক্তির সাথে মোকাবেলায় লিপ্ত ছিলেন।

অতএব, 'ইসলামী খেলাফত' যুগের প্রথম খলীফা ছিলেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং দ্বিতীয় খলীফা, যিনি রসূলের প্রথম খলীফা হবার গৌরব লাভ করেন, আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)। কিন্তু যেহেতু ইসলামের ইতিহাসে 'খলীফা' শব্দটি রসূলুল্লাহর খলীফা অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে কারণে প্রথম খলীফা হিসেবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-ই গণ্য হয়ে থাকেন।

খেলাফত প্রতিষ্ঠা

ইসলামী উম্মাহর বৃহত্তর অংশ এ মর্মে একমত যে, খলীফা নিযুক্ত করা উম্মতের জন্য ওয়াজিব (আবশ্যকীয়)। কিন্তু এ আবশ্যিকতা কি ধরনের সে বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। একটি মহলের মতে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেই আবশ্যিক। দলীলসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) রাসূলে আকরাম (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

من مات و ليس فى عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية

যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যে, তার স্কন্ধে (সময়ের খলীফার) বায়আত ছিল না, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল।

(২) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে খলীফা নিযুক্ত করা জরুরী মনে করেছেন এবং এ বিষয়টিকে তাঁরা এতই গুরুত্ব দান করলেন যে, মহানবীর (সঃ) দাফনের চেয়ে এটিকে অগ্রাধিকার দিলেন।

(৩) ইসলামী শরীয়ত মুসলমানদের উপর যে সকল বিষয় ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক) করেছে, যেমন শরীয়ত নির্ধারিত দণ্ডসমূহ প্রয়োগ করা ইত্যাদি, তা খলীফা ব্যতীত বাস্তবায়িত করা যায়না। আর এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, কোন ওয়াজিব যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হয়, সেসকল বিষয়ও ওয়াজিব হয়ে থাকে।

অপর মহলটি মনে করে যে, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকেই ওয়াজিব। কেননা প্রতিটি জনগোষ্ঠীরই এমন শক্তির প্রয়োজন হয়, যা তাদের আইনকে কার্যতঃ বাস্তবায়িত করবে, জাতির সদস্যদের

বিবাদ নিরসন করবে এবং দেশে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বহন করবে। এ কারণেই মনুষ্যসমাজের স্বীকৃত প্রয়োজনাদির মধ্যে একজন শক্তিশালী প্রশাসকের প্রয়োজনও শামিল।

এতদুভয় মতবাদই যথাস্থানে সঠিক এবং দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব। মূলতঃ যুক্তি ও শরীয়ত উভয়ে খলীফা নিযুক্তির প্রয়োজনীয়তায় একমত। যুক্তি জাতির শৃংখলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন ক্ষমতাধর প্রশাসকের প্রয়োজনীয়তা দাবী করে এবং শরীয়ত জাতির নেতৃত্বের জন্য এমন এক উন্নত আদর্শ কামনা করে, যার শক্তির উৎস হবে জাতিরই শক্তি, তার ব্যক্তিগত মর্যাদা ও প্রতিপত্তি নয়।

আল্লামা ইবনে খালদুন 'মুকাদ্দামা'য় এক তৃতীয় গোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন। তারা খলীফা নিযুক্ত করা শরীয়ত বা যুক্তি কোন বিচারেই জরুরী মনে করে না। মু'তায়িলাদের মধ্যে 'আসাম্ম' শ্রেণী এবং খারেজীদের একটি অংশ এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। তাদের চিন্তাধারার সারকথা হলো- উম্মতের মধ্যে আল্লাহর আইন বাস্তবায়িত হওয়া জরুরী ঠিকই, কিন্তু সে আইন যখন সাংবিধানিক রূপ লাভ করে এবং দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করে, তখন কোন ইমাম বা খলীফার প্রয়োজন থাকে না।

উম্মতের ঐকমত্য এ গোষ্ঠীর মতের পরিপন্থী। খুলাফায়ে রাশেদীনের পরবর্তী খলীফাদের মধ্যে শাসন ও রাজত্বের প্রভাবে যে চারিত্রিক দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে স্পর্শকাতর হয়ে তারা এই মতের প্রবক্তা হয়।

মুদ্দাকথা, উলামায়ে কেরাম একমত যে, মুসলমানদের নিজস্ব খলীফা বা ইমাম নিযুক্ত করা আবশ্যক- যাতে করে উম্মতের শৃংখলা, ঐক্য ও সংহতি বজায় থাকে এবং তারা মতবিচ্ছিন্নতা ও কর্মবিক্ষিপ্ততার শিকার হয়ে দুনিয়ার বুক থেকে ভুল অক্ষরের মত মুছে না যায়।(আসসিয়াসাতুশ শরইয়্যা, আবদুলওয়াহহাব খাল্লাফ)

খেলাফতের শর্তসমূহ

পৃথিবীর সকল দেশ ও জাতির জ্ঞানীদের স্বীকৃত নীতি হলো, দেশের বাদশাহ ও জাতির নেতা এমন ব্যক্তি হওয়া উচিত যিনি হবেন সজ্ঞান, পূর্ণবয়স্ক, স্বাধীন, পুরুষ, সাহসী, জ্ঞানী এবং প্রভাব ও ক্ষমতাশালী। ইসলাম এ সকল যুক্তিগ্রাহ্য প্রয়োজনীয় শর্তাদির সাথে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ সংযোজন করেছে ঃ

মুসলমানদের খলীফার জন্য প্রয়োজন হলো-

(১) মুসলমান হওয়া।

(২) আলেম হওয়া, যাতে তিনি কুরআন কারীম (যা ইসলামী রাষ্ট্রের বিধান) এর ধারাসমূহ বুঝতে সক্ষম হন এবং রাসূলুল্লাহর (সঃ) এর সুন্নাহর আলোকে সেগুলোর ব্যাখ্যা আয়ত্ত করতে পারেন।

(৩) ন্যায় পরায়ণ হওয়া, যাতে তিনি অধীনস্থ শাসকদের জন্য এক উত্তম আদর্শ হতে পারেন। কেননা তাদেরও এই গুণসম্পন্ন হওয়া জরুরী।

www.e-ilm.weebly.com

(৪) কুরাইশী (কুরাইশ বংশের সদস্য) হওয়া।

প্রথমোক্ত তিনটি শর্তে উলামায়ে কেরাম সকলে একমত। তবে চতুর্থ শর্ত নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। রাসূল আকরাম (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ
الأئمة من قريش। (ইমামগণ হবেন কুরাইশদের মধ্য হতে)। তিনি আরো বলেছেন قدموا قريشا و لا تقدموها (কুরাইশদের এগিয়ে দাও, তাদের সামনে যেয়োনা)।

এ ধরনের আরো কতিপয় হাদীছ কুরাইশ হবার শর্তের আলোচনাভিত্তি। কুরাইশ হবার শর্ত অস্বীকারকারীরা বলেন ঃ

(১) আল্লাহ্ তাআলা নিজ পয়গম্বরকে মানবতার সাম্যের পতাকাবাহী করে পাঠিয়েছেন। তিনি (সঃ) মানুষের তৈরী সকল জাতিগত ও বংশগত স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করেছেন। এতদসত্ত্বেও এ কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, তিনি খেলাফতকে 'কুরাইশদের সাথে নির্ধারিত' এই অনৈসলামী স্বাতন্ত্র্যের নিদর্শন বজায় রাখলেন?

(২) রাসূল আকরাম (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

اسمعوا و أطيعوا و إن و لى عليكم عبد حبشى ذو زبيبة

একজন কুৎসিত হাবশী গোলামকেও যদি তোমাদের শাসক নিযুক্ত করা হয়, তাহলেও তোমরা তাঁর কথা শুনবে ও তাঁকে অনুসরণ করবে।

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) বলেছেন,

لو كان سالم مولى حذيفة حيا لوليته

যদি হুযায়ফা (রাঃ) এর মুক্তদাস সালেম (রাঃ) জীবিত থাকত, তাহলে আমি তাকেই উত্তরসূরী করতাম।

এ সকল বাণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, না মহানবী (সঃ) খলীফা হওয়ার জন্য কুরাইশ হবার শর্ত গণ্য করেছেন, না হযরত উমর ফারুক (রাঃ)।

(৩) সৃষ্টিজগতের অমোঘ নিয়ম হলো- পৃথিবী সর্বদা পরিবর্তনের সূতিকাগার ছিল এবং থাকবে।

وتلك الأيام نداولها بين الناس

'এ সকল দিন আমি মানুষের মাঝে পরিবর্তন করে থাকি।' (আলে ইমরান ১৪০)

কুরাইশ বংশও এ নিয়মের আওতা বহির্ভূত ছিল না। তা সত্ত্বেও কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, তাদের সাথে খেলাফতকে নির্দিষ্ট করে সর্বকালের জন্য এ দায়িত্বের বোঝা তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে- চাই তারা এর দায়িত্বসমূহ পালনের যোগ্যতা রাখুক বা না রাখুক?

(৪) প্রথম হাদীছ কোন নির্দেশ বা শরীয়ত বিধান নয়; বরং একটি ভবিষ্যদ্বানী যা রসূলুল্লাহ (সঃ) খেলাফত সম্পর্কে করেছেন। অবশ্য দ্বিতীয় হাদীছের সাথে খেলাফত বিষয়ের সম্পর্ক সুস্পষ্ট।

আশায়েরা মতবাদের ইমাম কাযী আবূ বকর বাকিল্লানী এবং আল্লামা ইবনে খালদূনের এ-ই মত।

www.e-ilm.weebly.com

কুরাইশ হবার শর্ত সমর্থনকারীরা বলেন ঃ

(১) নিঃসন্দেহে ইসলাম মানবসাম্যের পতাকাবাহী। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সকল মানুষ সব দিক দিয়ে সমান, তাদের মধ্যে মর্যাদা ও শ্রেণীর কোনই পার্থক্য নেই। সকল মানুষ মানবিক অধিকারের দিক দিয়ে সমান। যেমন আদেশ, নিষেধ, দণ্ড ইত্যাদি ক্ষেত্রে। কিন্তু ইসলাম তাদের মধ্যে গুণাবলীর পার্থক্যের কারণে মর্যাদার তারতম্য স্বীকার করে। উদাহরণস্বরূপ ননআলিমদের উপর আলিমদের এবং নারী জাতির উপর পুরুষ জাতির প্রাধান্য কুরআনের বর্ণনা দ্বারাই সাব্যস্ত।

(২) রাসূলুল্লাহর (সঃ) এর সাথে কুরাইশদের বংশীয় সম্পর্ক তাদের জন্য গর্বের কারণ। তাঁদের মধ্যে দ্বীনি মর্যাদাবোধের সাথে সাথে বংশীয় মর্যাদাবোধও রয়েছে। আর নিশ্চয়ই মুহাম্মদী দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁদের নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব। অতএব, যদি তাঁদের উপর খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তাহলে তাঁরা রসূলের প্রতিনিধিত্বের কর্তব্যসমূহ অধিক উত্তম উপায়ে সম্পন্ন করতে পারবেন।

(৩) কুরআনুল কারীম কুরাইশদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। ইসলামের অনেক হুকুম কুরাইশদের রীতি অনুযায়ী। অতএব, তাঁরা ইসলামী শরীয়তের অধিক রহস্যজ্ঞ হতে পারেন এবং সে অনুযায়ী কার্য করে অন্যদের জন্য উৎকৃষ্ট নিদর্শন হতে পারেন।

(৪) বনু সায়েদার বৈঠকখানায় যখন খেলাফতের বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হলো এবং আনসারগণ নিজেদের নেতৃত্বের অধিকার দাবী করলো, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) দলিল হিসেবে এ হাদীছ পেশ করেছিলেন-

الائمة من قريش। ("ইমামগণ কুরাইশদের মধ্য হতে হবেন")।

রাসূলুল্লাহর (সঃ) এর আদেশের সামনে সবাই মাথা নত করেছিল। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরামও এ হাদীছকে নির্দেশ হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন, ভবিষ্যদ্বানী রূপে সাব্যস্ত করেন নাই।

(৫) কুরাইশ হবার শর্ত অন্যান্য শর্তের সাথে যুক্তভাবে গণ্য, স্বতন্ত্রভাবে যথেষ্ট নয়। অতএব- تلك الأيام نداولها بين الناس ("এ সকল দিন আমি মানুষের মাঝে পরিবর্তন করে থাকি")।

-এ ঐশী বিধানের আওতায় কোন ব্যত্যয় সৃষ্টি হয় না।

(৬) হাবশী দাসের আনুগত্য সম্পর্কিত যে হাদীছ তা খলীফা নির্বাচন সম্পর্কিত নয়। বরং বলছে, যদি কোন আযোগ্য জবরদখলকারী খেলাফত অধিকার করে বসে তাহলে তখন কর্মপন্থা কি হওয়া উচিত। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) এর মুক্ত দাস সালেম (রাঃ) সম্পর্কিত হযরত উমর (রাঃ) এর উক্তি যেহেতু নিছক সাহাবীর উক্তির মর্যাদা রাখে, অতএব, তা দলীল হতে পারে না। অধিকাংশ পণ্ডিত উলামায়ে কেরাম যেমন কাযী ইয়ায, আল্লামা নববী, হাফেয

www.e-ilm.weebly.com

ইবনে হাজার, জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) প্রমুখ কুরাইশ হবার শর্ত সমর্থন করেছেন। হযরত শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ) এরও এ-ই অভিমত। (দায়েরাতুল মাআরিফ, ফরিদ ওয়াজদী ৩য় খ. বিষয় খেলাফত; হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা; মুকাদ্দামায়ে ইবনে খালদুন পৃঃ ১৬৬)

প্রকৃতপক্ষে কুরাইশ হবার শর্ত উপযুক্ততার শর্ত নয়, অগ্রগণ্যতার শর্ত। অর্থাৎ যদি এমন পরিস্থিতি হয় যে, উম্মত মজলিসে শূরার মাধ্যমেই খলীফা নির্বাচন করে এবং সকল শর্তে কুরাইশ ও অকুরাইশ উভয় প্রার্থী সমান পর্যায়ের হয়, তাহলে এ সময় কুরাইশ ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ নামাজের ইমামতির কথা উল্লেখ করা যায়। ফকীহগণ লিখেছেন, যদি দু ব্যক্তি অন্য গুণাবলীতে সমান কিন্তু বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে একজন অধিক সম্ভ্রান্ত হয়, তাহলে তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। অতএব ক্ষুদ্র নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যদি বংশ মর্যাদাকে গণ্য করা হয়ে থাকে, তাহলে বৃহত্তর নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তা গণ্য করতে অসুবিধা কি? কিন্তু যেহেতু অগ্রাধিকার দানের শর্ত, উপযুক্ততার শর্ত নয়, সেজন্য এ শর্তটি এড়িয়ে গেলে খলীফা নির্বাচনে কোন ত্রুটি হবে না। নামাজের ইমামতির বেলায় যেমন এটিকে উপেক্ষা করলে নামাজের বিশুদ্ধতায় কোন ব্যত্যয় হয় না। এ ক্ষেত্রে কুরাইশের নেতৃত্ব সম্পর্কিত হাদীছের কোনরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে না, তেমনি সে সব বর্ণনারও কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না, যা হযরত জায়দ ইবনে হারেছা (রাঃ) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে এবং হুযায়ফা (রাঃ)-এর মুক্তদাস সালেম (রাঃ) সম্পর্কে হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। (হযরত মাওলানা আশেকে ইলাহী মিরাঠী এর বর্ণনা থেকে)

নির্বাচন পদ্ধতি

যাঁর মধ্যে খেলাফতের এই সকল শর্তের সমাবেশ হবে, তিনি তখনই খলীফা হতে পারবেন যখন সাধারণ মুসলমানরা তাঁকে নির্বাচন করবে অথবা মুসলমানদের ঐসকল প্রতিনিধি তাঁকে নির্বাচন করবেন যাঁদেরকে 'আহলে হল্ল ও আক্দ' বলা হয়। আহলে হল্ল ও আকদ বলতে বুঝায়- দেশের কর্মকর্তাবৃন্দ, সেনানায়কগণ এবং জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, যাঁরা ইলম ও আমল, বোধ ও চিন্তাশক্তি এবং জাতির ভালবাসার গুণে গুণান্বিত এবং মুসলমানরা তাদের জাতীয় সমস্যাবলীর ভার তাঁদের উপর ন্যস্ত করে।

একশ্রেণীর মতে খলীফা যদি তাঁর পরবর্তী কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা কতিপয় ব্যক্তির মধ্য থেকে অনির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম ঘোষণা করে যান তাহলে তিনিও খলীফা হয়ে যাবেন। হযরত উমর (রাঃ) এবং হযরত উছমান (রাঃ)-এর নির্বাচনের সময় যেমনটি হয়েছিল।

কিন্তু মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম উত্তরসূরী নির্বাচনের এ পদ্ধতি স্বীকার করেন না। এ প্রসঙ্গে তাঁদের দলীলসমূহ নিম্নরূপ ঃ

www.e-ilm.weebly.com

(১) কুরআনুল কারীমে মুসলমানদের সামষ্টিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে কর্মপদ্ধতি এই বলা হয়েছে,

وأمرهم شورى بينهم "তাদের বিষয়াদি পারস্পরিক পরামর্শে সিদ্ধান্ত হয়"।(শূরা ৩৮)

যদি এ ব্যাপারে এই সুন্দরতম মূলনীতি পরিহার করা হয়, তাহলে তা আর কি কাজে আসবে?

(২) একজন খলীফার জীবদ্দশায় অন্যের উত্তরসুরিত্বের বায়আত করা মূলতঃ একই সময়ে দু'জন নেতার বায়আত, যা শরীয়ত মোতাবেক ঠিক নয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) কে য়াযীদের উত্তরসুরিত্বের বায়আত করতে বলা হলে তিনি পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করেছিলেন এবং বলেছিলেন,

لا أبايع لأميرين(فتح البارى) "আমি একই সময়ে দু'জন আমীরের বায়আত করব না"

(৩) হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত উছমান (রাঃ) এর নির্বাচনকে নাম ঘোষণা বলে সাব্যস্ত করা সঠিক নয়। নিশ্চয় হযরত আবূ বকর (রাঃ) উম্মতকে ক্রমোন্নতির প্রাথমিক যুগে মতপার্থক্যের বিবাদ থেকে রক্ষার জন্য খেলাফতের বিষয়টিকে নিজ জীবনের শেষ মুহূর্তে মীমাংসা করে নেওয়া সমীচীন মনে করেছিলেন। কিন্তু তিনি এটি নিজের মতানুযায়ী করেন নি। বরং তিনি নেতৃত্বাস্থানীয় ও প্রবীণ সাহাবায়ে কেরামের সাথে এ ব্যাপারে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করেন। যাঁদের কিছু কিছু সংশয় ছিল, তাঁদের সংশয় দূর করা হলো। অতঃপর জনমত যাঁচাইয়ের জন্য হযরত উমরের নাম সাধারণ মুসলমানদের সামনে পেশ করা হলো। সবাই যখন এটি মঞ্জুর করে নিল, তখন তিনি তাঁকে আগামী খলীফা রূপে মনোনীত করে তাঁকে উত্তম অসিয়তসমূহ করলেন। স্পষ্টতঃই নির্বাচনের এ পদ্ধতিকে নাম ঘোষণা বলা যায় না।

তেমনি হযরত উমর (রাঃ) কোন উত্তরসুরীর নাম ঘোষণা করেন নি। বরং তিনি ছয়জন নেতৃস্থানীয় সাহাবাকে (যাঁরা খেলাফতের শর্তসমূহের সর্বোত্তম আধার ছিলেন) তাঁদের নিজেদের মধ্যেকার যে কোন একজনকে নির্বাচন করে নিতে ঘোষণা করেছিলেন। এঁরা কারা ছিলেন? এরা মুসলমানদের কেন্দ্রীয় দলের পর্যায়ে ছিলেন। এঁরা ছিলেন তাঁরাই, যাঁদেরকে রাসূল আকরাম (সঃ) কুরআনী শিক্ষাকে আমলী পোশাক পরিধান করাবার দায়িত্বভার দিয়েছিলেন।এঁরা ছিলেন–

السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار

"মুহাজির ও আনসারদের প্রথম স্তর" (তওবা ১০০)-

এসকল ব্যক্তিবর্গ যাঁদের সম্পর্কে কুরআনুল করীমের ঘোষণা হলো,

رضى الله عنهم و رضوا عنه

"তাঁদের সিদ্ধান্ত আল্লাহর পছন্দনীয় এবং আল্লাহর সিদ্ধান্ত তাঁদের মান্য"। (মায়েদা১১৯)

কুরআন যাঁদের সিদ্ধান্ত পছন্দনীয় হবার ঘোষণা করছে, তাঁদের সিদ্ধান্ত মুসলমানদের স্বীকার করে নিতে কোন ইতঃস্তত বা দ্বিধা থাকতে পারে কি? তাঁদের সিদ্ধান্ত কি মুসলমানদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ছিলনা? তা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক

www.e-ilm.weebly.com

বাস্তবতা হলো, যখন এই সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের এই গুরুদায়িত্ব এককভাবে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) এর উপর অর্পণ করলেন, তখন তিনি একাধারে তিনরাত চোখের পাতা না মুদিয়ে মুহাজির ও আনসারদের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ চালিয়ে গেলেন। অতঃপর উম্মতের সাধারণ রায় মোতাবেক তিনি হযরত উছমান (রাঃ)-এর নির্বাচনের কথা ঘোষণা করলেন।

শীয়া দৃষ্টিকোণ

খেলাফত ও ইমামত বিষয়ে শীয়াদের দৃষ্টিকোণ বিভিন্ন। ইমামিয়া শ্রেণীর ধারণা- খেলাফত ঐ সকল জনকল্যাণকর বিষয়ের অন্তর্গত নয় যা উম্মতের রায়ের উপর ছেড়ে দেয়া যায়। বরং এ হচ্ছে দ্বীনের অন্যতম রুকন এবং ধর্মের অন্যতম ভিত্তি। নবী (সঃ)-এর দায়িত্ব ছিলো এ ধরনের বিষয় আল্লাহর অহীর আলোকে মীমাংসা করে যাওয়া। তিনি তা-ই করেছিলেন এবং হযরত আলী (রাঃ) কে পরবর্তী খলীফা ও ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর পরে হযরত হাসান (রাঃ)-কে এবং তিনি তাঁর পরে হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে। এভাবে পর্যায়ক্রমে বারোজন ইমাম হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর সন্তানদের মধ্য থেকে স্পষ্ট বর্ণনা মোতাবেক খলীফা ও ইমাম হয়েছিলেন। ইমামিয়া শ্রেণী হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)-কে অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখলকারী সাব্যস্ত করে। কেননা তাঁরা আল্লাহ্ ও রসূলের আদেশমত আমল করেননি এবং হযরত আলী (রাঃ) থেকে খেলাফত ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।

জায়দিয়া শ্রেণী বলে থাকে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের পরে হযরত আলী (রাঃ)-কে খলীফা মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু এ মনোনয়ন নামোল্লেখ করে নয়, বরং গুণাবলীর সাহায্যে করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম এ সকল গুণাবলী সঠিক স্থানে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং হযরত আলী (রাঃ) এর পরিবর্তে অন্যদেরকে তাঁর স্থান দিয়ে ছিলেন। এরা হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)-কে মন্দ বলেনা। তবে হযরত আলী (রাঃ) কে তাঁদের চেয়ে উত্তম বলে মনে করে এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির বর্তমানে নিম্ন ব্যক্তির খলীফা হওয়া জায়েজ মনে করে। তাঁদের মতে ইমাম হবার জন্য ঐ সকল শর্তই যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। তবে তারা কুরাইশ হবার স্থানে ফাতেমী (হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর বংশধর) হবার শর্ত যোগ করে এবং খলীফা সাব্যস্ত হবার জন্য খলীফা ও ইমামের দাবীদার রূপে দাঁড়ানোও জরুরী মনে করে।

এ ছাড়াও শীয়াদের আরো অনেক শ্রেণী রয়েছে, তাদেরও খেলাফত ও ইমামত সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে*। শীয়ারা তাঁদের সকল ইমামকে নবীদের মতই নিষ্পাপ মনে করে এবং তাদের বিশ্বাস হলো, ইমামদের দ্বারা সগীরা বা কবীরা কোন গুনাহ সংঘটিত হতে পারে না।

---

* বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন মুকাদ্দামায়ে ইবনে খালদুন, মাযাহিবুশ শীয়া ফী হুকমিল ইমামা ' পরিচ্ছেদ ও দায়েরাতুল মাআরিফ বোস্তানী ৭খ বিষয় খলিফা।

www.e-ilm.weebly.com

কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

শর্তাদি ও নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে তা এমন পরিস্থিতিতে বাস্তবায়নযোগ্য যখন মুসলমানদের মধ্যে তাদের শরীয়ত ব্যবস্থা স্বীয় গণতান্ত্রিক প্রাণ নিয়ে বহাল থাকে, উম্মত নিজ নেতৃত্ব নির্বাচনে স্বাধীন হয় এবং তাঁদের সামনে এ প্রশ্ন আসে যে তারা কাকে নিজেদের খলীফা নির্বাচন করবে। কিন্তু মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে, এই 'শরীয়ত ব্যবস্থা' খুলাফায়ে রাশেদীনের পর বহাল থাকেনি। শরীয়ত ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবার পর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার কি পদ্ধতি রয়েছে- এ এক স্বতন্ত্র বিষয়। ইসলামী শরীয়ত তাও সবিস্তার বলে দিয়েছে। এ কারণেই হযরত আলী (রাঃ)-এর পর উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সাহাবায়ে কেরামের নিজস্ব কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা পোহাতে হয়নি।

শরীয়তব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড হবার পর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার দুটিই শর্ত রয়েছোপূর্ণ অধিকার ও মুসলমান হওয়া। অর্থাৎ যদি কোন মুসলমান নিজ শক্তি ও ক্ষমতাবলে খেলাফতের পদ অধিকার করে নেয় এবং তার প্রশাসন স্থির হয়ে যায়, তাহলে সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব হয়ে যায় তাকে খলীফারূপে মেনে নেয়া এবং আনুগত্যের শর্তসমূহ পালন করা। এখন কেউ যতই অধিক উপযুক্ত ও শ্রেষ্ঠ হোক না কেন তার জন্য জায়েজ হবে না যে, তিনি খেলাফতকে অস্বীকার করবেন এবং মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের দরজা খুলে দেবেন।

এ নিয়মের সুফল স্পষ্ট। যদি এখনও সকল শর্ত গণ্য করা জরুরী সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে যেব্যক্তিরই সাথে চারজন লোক রয়েছে, সে নিজেকে অন্যের চেয়ে উত্তম বলে খেলাফতের দাবীদার হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর শরীয়ত ব্যবস্থা তো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে- এখন শ্রেষ্ঠ, নিম্ন, উপযুক্ত-অনুপযুক্তের মীমাংসা কে করবে? নিশ্চিতভাবেই এ মীমাংসার জন্য তলোয়ারের ভাষাই যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হবে, বিবাদ বিসম্বাদের আগুন প্রজ্জ্বলিত হবে, রক্তের নদী বয়ে যাবে, দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা নষ্ট হয়ে যাবে এবং মুসলমানদের সমাজ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على السمع و الطاعة فى منشطنا و مكرهنا وعسرنا و يسرنا و اثرة علينه و إن لاننازع للأمر أهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان (بخارى - مسلم)

উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট এ মর্মে বায়আত করেছি যে, আমাদের উৎসাহ, অনুৎসাহ, সংকট, স্বচ্ছলতা ও পরাজয়ের সময় সর্বাবস্থায় আমরা ইমামের আনুগত্য করব, প্রাশাসনিক বিষয়ে আমরা প্রশাসকদের সাথে বিবাদ করব না। মহানবী (সাঃ) বলেন, তবে যখন তোমরা সুস্পষ্ট কুফরী দেখতে পাও এবং এ বিষয়ে তোমাদের নিকট আল্লাহর (কিতাবের) দলিল মজুদ থাকে (তখন আর আনুগত্য করতে হবে না)। (বুখারী)

www.e-ilm.weebly.com

হাবশী দাসের আনুগত্য সম্পর্কিত যে হাদীছ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, তা-ও এই পরিস্থিতি সংক্রান্ত। (ফতহুল বারী ১৩খ, ১০৪)

এই জবরদখলকারী খলীফা ও আমীর যদি দ্বীনদারীর স্বাভাবিক মাপকাঠিতেও পুরোপুরি না পড়েন এবং অন্যায়-অপকর্মও করেন, তথাপি তার মোকাবেলা করা জায়েজ নয়। অবশ্য তার অন্যায় কর্মসমূহকে অন্যায় বলেই মনে করতে হবে এবং তিনি আল্লাহর নাফরমানীর কোন আদেশ করলে তা পালনে অস্বীকার করতে হবে।

خيار أئمتكم الذين تحبونهم و يحبونكم وتصلون عليهم و يصلون عليكم و شرار ائمتكم الذين تبغضونهم و يبغضون كم و تلعنونهم و يلعنونكم قال قلنا يا رسول الله افلا ننابذهم عند ذالك قال لا ما اقاموا فيكم الصلوة الامن ولى عليه و آل فرآه يأتى شيأ من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية الله و لا ينزعن يدا من طاعة (مسلم)

"তোমাদের উত্তম ইমাম তাঁরা, যাঁদের তোমরা ভালবাসা এবং তাঁরাও তোমাদের ভালবাসেন, তোমরা তাঁদের জন্য রহমতের দুআ কর তাঁরাও তোমাদের জন্য রহমতের দুআ করেন; আর তোমাদের নিকৃষ্ট ইমাম তারা যাদের তোমরা হিংসা কর তারাও তোমাদের হিংসা করে, তোমরা তাদের অভিশম্পাত কর তারাও তোমাদের অভিশম্পাত করে।" বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, আমরা আরজ করলাম- হে আল্লাহর রসূল, আমরা কি এ ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না? তিনি (সঃ) বললেন- না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামাজ কায়েম করে। তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজ শাসকের কোন অন্যায় কাজ দেখবে সে যেন তা অন্যায়ই মনে করে, কিন্তু তার আনুগত্যের বাইরে যাবে না। (মুসলিম)

খলীফা ও শূরা

এখন এ বিষয়টি এসে যায় যে, খলীফা বা ইমাম যখন মুসলমানদের রায়ে নির্বাচিত হয়ে গেলেন, তখন আহলে হল্ল ও আক্‌দ-এর নিকট খেলাফতের বিষয়াদি সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণ করা তাঁর জন্য জরুরী কি না। যদি জরুরী হয়ে থাকে, তাহলে কি সকল বিষয়েই জরুরী না শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে? তারপর রায় গ্রহণ করে তা-ই বাস্তবায়িত করা জরুরী না খলীফা স্বাধীন, চাইলে বাস্তবায়িত করবেন বা না করবেন? এ আলোচনার মুল ভিত্তি কুরআনুল কারীমের এ আয়াত-

وشاورهم فى الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله (آل عمران-١٥٩)

"হে নবী, এ ধরনের ব্যাপারে (যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ে) তাদের পরামর্শ গ্রহণ করুন। অতঃপর যখন এরূপ হবে যে, আপনি কোন বিষয়ে দৃঢ় ইচ্ছা করেছেন, তাহলে আল্লাহর উপর ভরসা করুন (এবং যা মনস্থির করেছেন তদনুযায়ী কাজ করুন)। (আলে ইমরান ১৫৯)

www.e-ilm.weebly.com

আয়াত থেকে এ বিষয় তো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, খলীফার জন্য আহলে হল্ল ও আক্‌দ-এর রায় গ্রহণ করা জরুরী। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এবং হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা নিজ পয়গম্বরকে পরামর্শ গ্রহণ করার আদেশ এ জন্য দিয়েছেন যেন অন্যরা এ ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ করে এবং তাঁর উম্মতের মধ্যে এই সুন্নত প্রচলিত হয়ে যায়। এ-ও সুস্পষ্ট হয় যে, এই পরামর্শ গ্রহণ শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জরুরী। সাধারণ বিষয়াদিতে জরুরী নয়। কেননা এ আয়াত উহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল।

এখন তৃতীয় প্রশ্নটি থেকে যায়॥পরামর্শ গ্রহণের পর আহলে শূরার রায় (সংখ্যাগরিষ্টের হোক বা সর্বসম্মত হোক) মোতাবেক কার্য করা জরুরী কি না? এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের দু' ধরনের মত রয়েছে ঃ

(১) খলীফার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের পর্যায়েই থাকবে, তা গ্রহণ করা বা না করা খলীফার ইচ্ছাধীন হবে।

(২) খলীফা আহলে হল্ল ও আকদ-এর রায় নেয়ার পর তার বাধ্যগত হবেন- এড়িয়ে যাওয়া তাঁর জন্য বৈধ নয়।

বস্তুতঃ এ মতপার্থক্যের ভিত্তি হচ্ছে 'আয্‌ম' শব্দের অর্থ নির্ধারণ। প্রথমোক্ত মত পোষণকারীগণ 'আয্‌ম' শব্দের অর্থ করেন 'ইচ্ছার দৃঢ়তা' এবং 'মনের স্থিতি'। এক্ষেত্রে আয়াতের ভাবার্থ হবে- প্রথমে পরামর্শ গ্রহণ করুন, তারপর পরামর্শের পর, মনস্থির হয় এমন একটি বিষয়ে ইচ্ছাকে সুদৃঢ় করে নিন। অতঃপর আল্লাহর উপর ভরসা করে তা-ই করে ফেলুন। কোন কোন মুফাসসিরের ব্যাখ্যায় এর সমর্থন পাওয়া যায়-

فاذا عزمت اى عقيب المشاورة على شئ و اطمأنت به فتوكل على الله فى امضاء امرك على ما هو ارشد و أصلح فإن ما هو أصلح لك لا يعلمه الا الله لا انت و لا من تشاور.

(১) পরামর্শের পর যখন আপনি কোন কাজের দৃঢ় ইচ্ছা করবেন এবং সেকাজে আপনার মনস্থির হয়ে যাবে, তখন সেটিকে উত্তম ও কল্যাণকর পন্থায় সম্পন্ন করতে আল্লাহর উপর ভরসা করুন। কেননা আপনার জন্য যা উত্তম তা জানেন একমাত্র আল্লাহই, আপনি জানেন না আপনার পরামর্শদাতাও নয়।

(রূহুল বয়ান ৪খ, ১১৬)

اى فاذا عقدت قلبك على امر بعد الاستشارة فاجعل تفويضك فيه إلى الله تعالى فانه العالم بالأصلح لك و الارشاد عليك و فى هذه الآية دليل على المشاورة و تخيير الراى و تنقيحه و الفكر فيه.

(২) অর্থাৎ পরামর্শ গ্রহণের পর যখন আপনি কোন কাজের প্রতি মনস্থির করবেন, তখন তা আল্লাহর উপর ন্যস্ত করুন। কেননা যা আপনার জন্য উত্তম বা অধিক উপযুক্ত তা জানেন আল্লাহই, আপনার পরামর্শদাতা নয়। এ আয়াতে

www.e-ilm.weebly.com

পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং রায়ের দৃঢ়তা ও পরিশুদ্ধকরণ এবং সে বিষয়ে চিন্তাভাবনার প্রয়োজনীয়তার দলীল রয়েছে। (আল বাহরুল মুহীত ৩খ, ৯৯)

এ মত সমর্থনকারীদের নিকট পরামর্শ গ্রহণে খলীফার উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত যে, বিষয়বস্তুর বিভিন্ন দিক তাঁর নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং অতঃপর তিনি একীন ও স্থিরতার সাথে কোন কার্যপন্থা অবলম্বন করতে পারবেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপদ্ধতিতে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। তার কতিপয় নিম্নরূপ ঃ

(১) হযরত আবু বকর (রাঃ) ধর্মান্তর ফিৎনা প্রকাশের সময় আহলে শূরার সাথে পরামর্শ করেছিলেন। অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের রায় ছিল, যাকাত অস্বীকারকারীদের এ মুহূর্তে পিছু না নেওয়া হোক এবং নমনীয়ভাবে কাজ করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হোক। হযরত উমর (রাঃ) এর এই রায় ছিল। কিন্তু হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এই রায় গ্রহণ করতে কঠোরভাবে অস্বীকার করলেন এবং এ ফিৎনার আগুনকে তলোয়ারের পানি দিয়ে নিভিয়ে দিলেন।

(২) তেমনি সাবাঈ দলের বিশৃংখলা সৃষ্টি প্রতিহত করার জন্য ৩৪ হিজরীতে হযরত উছমান গনি (রাঃ) যে গুরুত্বপূর্ণ মজলিসে শূরা অনুষ্ঠান করেছিলেন, তাতে প্রায় সর্বসম্মত রায় ছিল, ফেৎনা সৃষ্টিকারীদের সাথে কঠোর আচরণ করা হোক। কিন্তু হযরত উছমান (রাঃ) এ রায় মোতাবেক আমল করতে অস্বীকার করলেন এবং নমনীয়তা ও শিথিলতার নীতিকে অগ্রাধিকার দিলেন।

দ্বিতীয় মত পোষণকারীদের নিকট 'আয্‌ম' শূরা থেকে ভিন্ন কিছু নয়। বরং ঐ শূরার 'সম্পাদনেচ্ছা'ই 'আয্‌ম' নামে আখ্যায়িত। প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনে কাছীর (রহঃ) এ আয়াতের প্রসঙ্গে লেখেন-

العزم فى الأصل قصد الامضاء عن على (رضـ) سئل صلى الله عليه و سلم
عن العزم قال مشورة أهل الراى ثم اتباعهم (ابن كثير ج ٢ ص ١٣١)

বস্তুতঃ 'আযম' হচ্ছে সম্পাদনেচ্ছা'। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে 'আয্‌ম' সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে তিনি (সঃ) বলেছিলেন, আহলুর রায়-এর পরামর্শ গ্রহণ করা অতঃপর তা কার্যকর করা। (ইবনে কাছীর ২খ, ১৩১)

মুহতারাম মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব সিউহারভী তাঁর এক অপ্রকাশিত গ্রন্থে এ মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলীলসমূহ সংকলন করেছেন। হযরতের সৌজন্যে এখানে তা উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) মাজমাউয যাওয়ায়েদ-এ হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল, যদি কোন বিষয় কিতাব ও সুন্নাহর মধ্যে না পাই তাহলে কি করব? তিনি (সঃ) জবাব দিয়েছিলেন, খোদাভীরু বুদ্ধিজীবিদের সাথে পরামর্শ করবে, কোন ব্যক্তি বিশেষের রায় কার্যকর করবে না।

(২) হাকিম (রহঃ) মুসতাদরাক–এ হযরত আলী (রাঃ) থেকেই বর্ণনা করেন, তিনি (সঃ) বলেছেন- যদি আমি পরামর্শ ব্যতীত কাউকে খলীফা নিযুক্ত

www.e-ilm.weebly.com

করতাম তাহলে উম্মে আবদ–এর পুত্র (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) কে করতাম (কিন্তু এ বিষয় সর্বজনবিদিত যে, তিনি এরূপ করেননি)।

(৩) তাবাকাতে ইবনে সা'দ–এ বর্ণিত আছে, কতিপয় সাহাবী হযরত উমর (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, কোন বিষয় কিতাব ও সুন্নাহের মধ্যে না পেলে আমরা সে বিষয়ে কি করব? হযরত উমর (রাঃ) বলেছিলেন, আহ্লুর রায়-এর গরিষ্ঠ সংখ্যা যেদিকে যাবে, তা কার্যকর করবে।

(৪) হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) বুখারী শরীফের ভাষ্যে "রসূল যখন আয্ম করেন" এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন-

فاذا عزم رسول الله صلى الله عليه و سلم.

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর উদ্দেশ্য হলো- নবী করীম (সঃ) পরামর্শ গ্রহণের পর যখন সে ব্যাপারে 'আয্ম' করে ফেলেন, তখন কারো জন্য বৈধ নয়- তাঁকে (সঃ) সে পরামর্শের পরিপন্থী ভিন্ন কোন রায় দেয়া।

দ্বিতীয় মতটিই ইসলামের 'গণতান্ত্রিক নীতি'–এর অধিক নিকটবর্তী। তবে উল্লেখ্য, বর্তমানের নামসর্বস্ব গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলোতে মতামত যাঁচাইয়ের যে পদ্ধতি চালু রয়েছে, যেখানে ক্যানভ্যাসিং–এর মাধ্যমে ভোটারদের উপর সকল প্রকারের নৈতিক ও শক্তিমূলক প্রভাব খাটানো হয় এবং যেখানে দলীয় নেতাদের আওয়াজের সাথে তা যতই অনর্থক হোক না কেন আওয়াজ মেলানো জরুরী সাব্যস্ত করা হয়, তা কোনক্রমেই ইসলামী শূরার মাপকাঠিতে পুরোপুরি পড়ে না। ইসলাম আহলে শূরার জন্য কতিপয় নিয়মনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেগুলো মেনে চলা প্রাথমিক শর্ত। রাসূল আকরাম (সঃ) ইরশাদ করেন-

المستشار مؤتمن

(১) যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয়, সে আমানতদার (যদি সে সঠিক পরামর্শ না দিয়ে থাকে তাহলে সে আমানতের খেয়ানত করলো।)

من أشار على أخيه بأمر يعلم ان الرشد فى غيره فقد خانه (ابو داؤد)

(২) যে ব্যক্তি তার ভাইকে জেনে শুনে ভুল পরামর্শ দিল, সে তার ভাইয়ের সাথে খেয়ানত করলো। (আবূ দাউদ)

অতএব, ইসলামী শূরার এই মৌলিক নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, আহলে শূরার যতই গরিষ্ঠতা তার সমর্থনে থাকুক না কেন, ইসলামী শরীয়তের আইনের দৃষ্টিতে তা অকার্যকর এবং ইসলামী মনীষীদের কোন শ্রেণীর নিকটেই পালনযোগ্য নয়।

খেলাফতে রাশেদা

ইসলামী প্রশাসন যদি সঠিক অর্থে আল্লাহ মনোনীত প্রশাসন হয়, ইসলামের বিধানসমূহের প্রচলন, শরীয়তী দণ্ডসমূহ কার্যকর, দ্বীনের মূলনীতিসমূহের প্রচার, শরীয়তের বিদ্যাসমূহের প্রসার, বিবাদ মীমাংসা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ রসূল (সঃ) এর আদর্শ মোতাবেক হয়, এর বিধি ব্যবস্থা শূরার

www.e-ilm.weebly.com

ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর প্রধান নবুওয়াতসত্তা (সঃ) এর ব্যাপকতা ধারণ করেন, তিনি হন দরসের আসনে স্বাধীন মুজতাহিদ, ইরশাদের মজলিসে অলীয়ে কামেল, বিচারের এজলাসে ন্যায়বিচারক এবং যুদ্ধের ময়দানে সাহসী সেনানায়ক, মোটকথা, ধর্ম ও রাজনীতির সকল তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক গুণাবলীতে তিনি হন রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সঠিক প্রতিনিধি- তাহলে এরূপ খেলাফতকে খেলাফতে রাশেদা বা 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওওয়াত' বলা হয়।

চার খলীফা– হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ), হযরত উমর ফারূক (রাঃ), হযরত উছমান গনি (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-এর পয়গম্বরসুলভ জীবন পদ্ধতি এবং তাঁদের খেলাফতকালের গৌরবময় কীর্তিকলাপের উপর একবার দৃষ্টিপাত করলে এই বাস্তবতা আয়নার মত পরিস্কার হয়ে যায় যে, তাঁদের খেলাফতকালই খেলাফতে রাশেদার কাল ছিল। রসূল আকরাম (সঃ) এর একটি হাদীছ রয়েছে -

الخلافة بعدى ثلاثون عاما ثم ملك بعد ذالك

খেলাফত আমার পর ত্রিশ বছর, তারপর রাজত্ব।

এ হাদীছে খেলাফত বলতে পূর্ণাংগ খেলাফত বা খেলাফতে রাশেদা উদ্দেশ্য। খেলাফতে রাশেদা মূলতঃ নবুওওয়াত যুগের পরিশিষ্ট ও সমাপ্তি। রসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেন,

كان بنو اسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبى خلفه نبى و انه لا نبى بعدى و سيكون خلفاء.

"বনী ইসরাঈলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দান করতেন নবীগণ। একজন নবী ইনতেকাল করলে অপর নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী হবেন না। তবে খলীফাগণ হবেন"। (বুখারী, মুসলিম)

এ কারণেই খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে রসূলের সুন্নতের ন্যায় উম্মতের জন্য কার্যাদর্শ রূপে গণ্য করা হয়েছে এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম الخلافة بعدى ثلاثون عاما 'আমার পরে খেলাফত হবে ত্রিশ বছর' এ হাদীছের সাহায্যে দলিল পেশ করে এই মত প্রকাশ করেন যে, খেলাফতে রাশেদার ধারা চার খলীফা (বা পাঁচ) এর এর পর শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লামা ইবনে কাছীর (রহঃ) 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন- এ হাদীছের ভাবার্থ হলো- ধারাবাহিক ও লাগাতার খেলাফতে রাশেদার কাল ত্রিশ বছর থাকবে। অতঃপর রাজত্ব কাল হতে থাকবে বলে এ ধারাবাহিকতা ও একাদিক্রম ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু তারপরেও খুলাফায়ে রাশেদীন সময়ে সময়ে হবেন। এ অর্থ নয় যে, অতঃপর আর কখনও তা হবে না।

আল্লামা ইবনে কাছীর (রহঃ) তাঁর এ মতের সমর্থনে হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) এর হাদীছটি উল্লেখ করেছেন যা সিহাহ সিত্তায় বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে ঃ

www.e-ilm.weebly.com

لا تزال هذة الأمة مستقيما أمرها ظاهرة على عدوها حتى يمضى اثنا عشرة خليفة كلهم من قريش.

"এ উম্মতেব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বহাল থাকবে এবং শত্রুর উপর বিজয়ী থাকবে- যতদিন না বারোজন খলীফা অতিবাহিত হন, যাঁরা সবাই হবেন কুরাইশ গোত্রের"।

এ হাদীছ উল্লেখ করার পর তিনি আরো সমর্থনের জন্য তাওরাতের এ উদ্ধৃতি টানেন৷"আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে হযরত ইসমাঈলের সুসংবাদ দেন এবং বলেন যে, তিনি ইসমাঈলের বংশধরদের উন্নতি দান করবেন এবং তাদের মধ্য থেকে বারো জন নেতা সৃষ্টি করবেন"।

অতঃপর স্বীয় সুবিখ্যাত উস্তাদ আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার বরাত দিয়ে বলেন, এ সকল নেতা ঐ খলীফাগণই, হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ)-এর হাদীছে যাঁদের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এঁরা উম্মতের মধ্যে প্রয়োজন মোতাবেক প্রকাশিত হতে থাকবেন।

উল্লেখ্য, এ বারোজন খলীফা বলতে শীয়াদের বারো ইমাম উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেননা তাঁদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত হাসান (রাঃ) ব্যতীত আর কেউ শাসন ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেননি। (বিদায়া নিহায়া ৭খ. ৪৮)

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

কুরআনুল কারীম ও হাদীছ শরীফে 'রসূলের খলীফা' এর ব্যক্তিক নির্দিষ্টতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু পাওয়া যায় না।

وأمرهم شورى بينهم "মুসলমানদের কার্যাদি পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে মীমাংসিত হবে'- এ মূলনীতি মোতাবেক ইসলামী শরীয়ত তাদের সবচেয়ে বড় সামষ্টিক কর্ম 'খলীফা নির্বাচন'–এর দায়িত্বও তাদেরই উপর ন্যস্ত করতে চেয়েছে, যাতে ভাল মন্দ ফলাফলের দায়দায়িত্ব তাদেরই উপর বর্তায়। অতএব এ সম্পর্কে কিছু শর্ত ও নিয়মনীতিসহ এর দরজা খুলে রেখে দেয়া হয়েছে।

তথাপি নবী করীম (সঃ)-এর কথা ও কাজে বিভিন্ন স্থানে এমন ইঙ্গিতসমূহ পাওয়া যায়, যা থেকে তাঁর (সঃ) কথা ও কাজে বিভিন্ন স্থানে এমন ইঙ্গিতসমূহ পাওয়া যায়, যা থেকে তাঁর (সঃ) পরে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর খলীফা হওয়ার উপযুক্ততার প্রতি পথনির্দেশনা হয় এবং বুঝা যায় যে, তিনি (সঃ) নিজের প্রতিনিধিত্বের আসনে তাঁর সেই গুহাবন্ধুকে সমাসীন দেখতে চাইতেন।

.কতিপয় কর্মগত ইঙ্গিত নিম্নরূপ ঃ

(১) তাবুক যুদ্ধ ছিল মহানবী (সঃ) জীবনে সময়ের দিক দিয়ে সর্বশেষ, প্রস্তুতি ও সরঞ্জামের দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় এবং বিপক্ষের শক্তির দিক দিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই যুদ্ধে ইসলামী বাহিনীর সবচেয়ে উঁচুপদ 'পতাকাবাহী' হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কেই দান করা হয়েছিল।

(২) হিজরী ৯ম সনে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কেই নিজের প্রতিনিধি ও হজ্জের আমীর নিযুক্ত করে মক্কায় পাঠালেন এবং নির্দেশ

www.e-ilm.weebly.com

দিলেন যে, তিনি মিনায় ঘোষণা করে দিবেন- এ বছরের পর আল্লাহর ঘরে তাঁর অবাধ্যদের জন্য আর হজ্জ করার সুযোগ থাকবে না। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) কে তাঁরই নেতৃত্বে সুরা বারাআতের আয়াতসমূহ শুনিয়ে দেবার জন্য নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন। এ আয়াতগুলো তখন নাজিল হয়েছিল। ইতিহাসে এ হজ্জ 'হজ্জে আবূ বকর' নামে প্রসিদ্ধ।

(৩) মৃত্যুরোগের সময় সাহাবায়ে কেরামের জামাআতের ইমামতির জন্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর অনুপস্থিতির কারণে যখন কতিপয় সাহাবী হযরত উমর (রাঃ)-কে এগিয়ে দিলেন এবং তাঁর আওয়াজও যথেষ্ট উচ্চ ছিল, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কানে সে আওয়াজ এলে তিনি বললেন, না, না, না, ইবনে আবূ কুহাফা (আবূ বকর সিদ্দীক) (রাঃ) নামাজ পড়াবে। যে লোকদলে আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) থাকবে সেখানে অন্য কারো ইমামতি করা শোভনীয় নয়। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

(৪) মসজিদে নববীর (সঃ) চারিদিকে যে সকল সাহাবীর ঘর ছিল, তাঁরা মসজিদে আসবার সুবিধার্থে মসজিদের দিকে দরজা রেখেছিলেন। সেসকল দরজা দিয়েই তাঁরা মসজিদে উপস্থিত হতেন। মৃত্যুর নিকটকালে তিনি (সঃ) আদেশ করলেন যে, সকল দরজা বন্ধ করে দেয়া হোক, শুধুমাত্র আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর দরজা খোলা থাকুক *। (বুখারী ও মুসলিম)

কতিপয় উক্তিগত ইঙ্গিত নিম্নরূপ ঃ

(১) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মে'রাজ রজনীতে আমি যে আসমানেই পৌঁছেছি, সেখানে নিজ নাম মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ এবং তারপরে আবূ বকর সিদ্দীক লেখা দেখতে পেয়েছি।(তাবরানী আওসাত)

(২) হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আবু বকর ও উমর নবী রসূলগণ ব্যতীত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের সকল মধ্যবয়সী জান্নাতবাসীর নেতা **। (তিরমিযী)

(৩) আবূ সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক নবীর জন্য আসমানী মাখলুকের মধ্য থেকে দু জন সহযোগী এবং পার্থিব মাখলুকের মধ্য থেকে দুজন সহযোগী হয়ে থাকেন। আসমানী মাখলুকের মধ্য থেকে আমার দু সহযোগী হচ্ছেন জিবরাঈল (আঃ) ও মীকাঈল (আঃ) এবং পার্থিব দু সহযোগী হলেন, আবূ বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ)। (তিরমিযী)

(৪) হযরত আবূ হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমার জানা নেই যে, তোমাদের মধ্যে আমি আর কত দিন থাকব। অতএব আমার পরে তোমরা এ দুজনের আদেশের অনুসরণ করবে। এই বলে তিনি (সঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করলেন। (তিরমিযী)

---

* সম্ভবতঃ এর কারণ ছিল রসূলের খলীফার পদবীগত (খেলাফতের) দায়িত্বসমূহ পালনের জন্য আসা-যাওয়ায় যেন কষ্ট না হয়।

** স্পষ্টতঃই যিনি জান্নাতে সকল মুসলমানের নেতা হবেন তিনি দুনিয়াতেও তাদের ইমাম হবার জন্য বেশী উপযুক্ত।

www.e-ilm.weebly.com

(৫) এক ভিখারিনী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হলো। তিনি (সঃ) তাকে বললেন, যদি পুনরায় আসতে হয় এবং আমাকে না পাও তাহলে আবূ বকর (রাঃ) এর নিকটে আসবে *। (ইযালাতুল খেফা)

স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম যাঁরা সর্বদা নবুওয়াত দরবারে উপস্থিত থাকতেন, তাঁদেরও মত ছিল এই যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হযরত আবূ বকর সিদ্দীকই (রাঃ)।হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, আমরা (সাহাবায়ে কেরাম) রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সময়ে আবূ বকর (রাঃ) এর সমকক্ষ কাউকে মনে করতাম না। অতঃপর উমর (রাঃ) এবং তারপরে উছমান (রাঃ) এর স্থান সাব্যস্ত করতাম। (বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী)। তাবরানী আওসাত-এ এ বর্ণনার সাথে এতটুকু সংযোজন করা হয়েছে যে, আমাদের এই ক্রমবিন্যাস রসূলুল্লাহ (সঃ) শুনতেন কিন্তু অমত প্রকাশ করতেন না। (তাজ জামে)

বুখারী শরীফে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়ার বর্ণনায় হযরত আলী (রাঃ) এর একই বিষয়ের একটি উক্তি উল্লেখিত আছে।

চার খলীফার পর্যায়ক্রমিক অবস্থান

শুধু তাই নয়। বরং মহানবী (সঃ) এর হাদীছ ও সাহাবায়ে কেরামের উক্তিসমূহের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের (রাঃ) নির্বাচনে যে পর্যায়ক্রম প্রকাশ পেয়েছে, তা মহানবী (সঃ) এর অভিপ্রায়ের মোতাবেক ছিল এবং নিশ্চয় সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা রসূল আকরাম (সঃ) এর সবসময়ের সঙ্গী ও সাথী ছিলেন, খলীফা নির্বাচনের সময় মনিবের অভিপ্রায়টিকে সর্বোত্তম মনে করে এই পর্যায়ক্রমের প্রতি দৃষ্টি রেখে থাকবেন।

(১) হযরত জাবের (রাঃ) এর বর্ণনা, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, গতরাতে একজন সৎলোককে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, আবু বকরকে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে মিশানো হয়েছে, উমর (রাঃ) কে আবুবকরের সাথে এবং উছমান (রাঃ) কে উমর (রাঃ) এর সাথে। হযরত জাবর (রাঃ) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর মজলিস থেকে উঠে যাবার সময় পরস্পর বলাবলি করতে লাগলাম যে, সৎলোকটি তো স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং একজনকে অন্যের সাথে মেলানোর অর্থ এঁরা পরস্পর ইসলামের খলীফা হবেন। (আবূ দাউদ)

(২) রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যদি তোমরা আবূ বকরকে আমীর নিযুক্ত কর তাহলে তাকে বিশ্বস্ত, দুনিয়া তুচ্ছজ্ঞানকারী এবং আখেরাতে আগ্রহী রূপে পাবে; যদি উমর (রাঃ) কে আমীর নিযুক্ত কর, তাহলে তাঁকে যোগ্য বিশ্বস্ত পাবে, সে আল্লাহর ব্যাপারে কারো নিন্দার ভয় করবে না; আর যদি আলীকে আমীর নিযুক্ত কর, আমার মনে হয় তোমরা (সর্বসম্মতভাবে) এরূপ করবে না, তাহলে তাঁকে হিদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত রূপে পাবে।

(৩) হযরত সামুরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি মহানবী (সঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করল- হে আল্লাহর রসূল, আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আসমান থেকে একটি বালতি ঝুলানো হয়েছে। আবূ বকর এলেন এবংসে

* দৃশ্যতঃ বায়তুল মালের কর্তৃত্ব খলীফারই।

www.e-ilm.weebly.com

বালতির দু আংটা ধরে দুর্বলভাবে পানি পান করলেন। অতঃপর উমর এলেন এবং বালতির দু আংটা ধরে এতটা পান করলেন যে, তাঁর পেটের দু পার্শ্ব ফুলে উঠল। অতঃপর আলী এলেন এবং (পানি পান করার জন্য) এর আংটা ধরলেন। তখন বালতিটি নড়লো এবং কিছুটা পানি তাঁর উপর পড়ল *। (আবূ দাউদ)

(৪) আবূ বকরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি বর্ণনা করল, হে আল্লাহর রসূল, আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন আসমান থেকে একটি নিক্তি নাযেল হলো। সে নিক্তিতে আপনাকে ও আবু বকরকে মাপা হলো, আপনি আবু বকরের চেয়ে ভারী হলেন। অতঃপর আবু বকর ও উমরকে মাপা হলো। আবূ বকর ভারী হলেন। অতঃপর উমর ও উছমানকে মাপা হলো। উমর ভারী হলেন। এরপর নিক্তিটি উঠিয়ে নেয়া হলো **। (আবূ দাউদ)

(৫) হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আবূ বকরের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তিনি নিজ কন্যা আমাকে দিয়েছেন, মদীনা আসার জন্য বাহনের ব্যবস্থা করেছেন, গুহায় আমার সাথে রয়েছেন এবং বেলালকে নিজের অর্থে খরিদ করে মুক্ত করে দিয়েছেন। উমরের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তিনি হক কথা বলে থাকেন যদিও কারো নিকট তা তিক্ত মনে হয়। তাঁর এ হক কথা বলার কারণে দুনিয়াতে তাঁর কোন বন্ধু থাকলো না। উছমানের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আল্লাহর ফেরেশতারাও তাঁর (শরমের) প্রতি লজ্জাবোধ করেন। আলীর প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ হককে তার সাথে কর- তিনি যেদিকেই যান। (তিরমিযী)

(৬) বনু মুসতালিককে তিনি (সঃ) বলেছিলেন যে, তারা যেন তাঁর (সঃ) পরে মালের যাকাত আবূ বকরের নিকট অর্পণ করে, তাঁর পরে উমরের এবং তাঁর পরে উছমানের নিকট। ***

(৭) একবার মহানবী (সঃ) খুতবা দান করলেন এবং তারপর পর্যায়ক্রমে হযরত সিদ্দীকে আকবর, হযরত উমর ফারূক ও হযরত উছমানকে খুতবা দানের আদেশ করলেন ***।

(৮) মসজিদে নববীর ভিত্তি স্থাপন করার সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি পাথর রাখলেন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে একটি করে পাথর হযরত আবূ বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত উছমান (রাঃ) এর দ্বারা স্থাপন করালেন ****।

---

* পানির বালতি (রাঃ) মহানবীর (সঃ) খেলাফতের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। হযরত আবূ বকরের স্বল্প পানি পান করার অর্থ তাঁর খেলাফত কালের স্বল্পতা। বালতির পানি পড়ে যাওয়ার দ্বারা হযরত আলীর সময়ে খেলাফতের বিষয়ে বিভক্তির দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

** নিক্তি উঠিয়ে নেয়ার অর্থ খুব সম্ভব এই যে, উছমান (রাঃ)-এর পর লোকেরা খলীফা নির্বাচনের বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠির খেয়াল রাখবে না। বরং দল ও ক্ষমত হবে মাপকাঠি।

*** সম্পদের যাকাত আদায় ও খুতবা দান খেলাফতের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত-যা খুবই স্পষ্ট

**** শেষোক্ত তিনটি হাদীছ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) প্রণীত ইযালাতুল খেফা ২য় খণ্ড পৃঃ ৫১ ও ৫২ থেকে নেয়া হয়েছে। শাহ সাহেব এ প্রসঙ্গে আরো অনেক হাদীছ ও আছার উদ্ধৃত করেছেন। বর্ণনা দীর্ঘ হবার আশংকায় সেগুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

www.e-ilm.weebly.com

আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর যুগ

খলীফা নির্বাচন

বনূ সায়েদার বৈঠকখানা

মহানবী (সঃ) এর ইন্তেকালের পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মুসলমানদের সামনে এই ছিল যে, তাঁরা কোন মহান ব্যক্তিকে মহানবী (সঃ) এর খলীফা নির্বাচন করবেন। তাছাড়া জরুরী ছিল, এই কাজটি যথাসম্ভব শীঘ্র সম্পন্ন করে ফেলা। নইলে এই আশংকা ছিল যে, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রে মুসলমানদের ঐক্য, যা এ পবিত্র দ্বীনের ভিত্তি, তা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং ইসলামের গৌরবময় ভবন, যা নির্মাণে নবী করীম (সঃ) এর জীবনের তেইশটি বছর খরচ হয়েছে তা জমিনের সাথে মিশে যাবে।

এ সময়ের মুসলমানদের প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়- মুহাজির ও আনসার। যে সব মুসলমান নিজেদের দেশ, আত্মীয় স্বজন এবং ধনসম্পদ পরিত্যাগ করে মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে মদীনায় চলে এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন মুহাজির। অপরপক্ষে যাঁরা নিজেদের জান ও মালের বিনিময়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) কে সাহায্য করেছিলেন এবং নিজেদের দেশ মদীনায় আহ্বান করে দ্বীনের আলোকবর্তিকা সমুজ্জ্বল করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন আনসার। বনূ সায়েদার বৈঠকখানা ছিল আনসার নেতা সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ)-এর বৈঠকখানা। আনসারদের নেতৃবৃন্দ বনূ সায়েদার বৈঠকখানায় একত্রিত হলো এবং খলীফা নির্বাচনের বিষয়ে আলাপ আলোচনা হতে লাগলো। প্রথমে সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ) দাঁড়ালেন। তিনি আনসারদের দ্বীনসেবার উল্লেখ করলেন এবং তারপর বললেন, রসূল প্রতিনিধিত্বের সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত আমরাই। কতিপয় আনসার বললেন, আপনি সম্পূর্ণ সঠিক বলেছেন।

সমাবেশ থেকে এক আওয়াজ এলো- যদি মুহাজিরগণ না মানেন এবং রসূলে আকরাম (সঃ) এর আত্মীয়তার কারণে নিজেদের দাবী উথাপন করেন তাহলে কি হবে? আরেক জন জবাব দিল, "তাহলে আমাদের বংশের একজন আমীর হবেন এবং তাঁদের বংশের একজন হবেন।" হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) এ সমাবেশের কথা জানতে পারলেন। তখন তাঁরা মুহাজিরদের সহযোগে সেখানে উপস্থিত হলেন। হযরত উমর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাঁকে থামিয়ে দিলেন এবং নিজেই অত্যন্ত দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্যের সাথে এক বক্তৃতা দিলেন।

www.e-ilm.weebly.com

এ বক্তৃতায় তিনি প্রথমে মুহাজিরদের দ্বীনি ত্যাগের কথা উল্লেখ করলেন। অতঃপর আনসারদের ত্যাগী মনোবৃত্তির অন্তর খুলে প্রশংসা করলেন অতঃপর বললেন, যদি মাহাত্ম্য ও গুণাবলী দেখা হয়, তাহলে দুদলের কেউ অন্যের চেয়ে কম নয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "ইমাম কুরাইশদের মধ্য থেকে হবেন"।

অতএব, হে আনসার সম্প্রদায়! খলীফাগণ আমাদের মধ্য থেকে হবেন এবং উজিরগণ (সাহায্যকারীগণ) আপনাদের মধ্য থেকে হবেন। আপনারা বিশ্বাস করুন যে, খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে আপনাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হবে।

আনসারদের খাযরাজ গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়ালো এবং বলতে লাগলো, আচ্ছা, মুহাজিরদের যদি আমাদের খলীফা হওয়াতে অসম্মতি থাকে তাহলে একজন আমীর আমাদের মধ্য থেকে হোন আরেক জন তাদের মধ্য থেকে।

স্পষ্টতঃই এ মত ছিল নিতান্ত ভুল। সেজন্য হযরত উমর (রাঃ) অত্যন্ত কঠোরভাবে এর প্রতিবাদ করলেন। অতঃপর হযরত আবূ উবায়দা ইবনেুল জাররাহ (রাঃ) বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! আপনারাই প্রথমে ইসলামকে শক্তি দান করেছেন। এখন আপনারাই তাঁর দুর্বলতার ব্যবস্থা করবেন না। এ কথা শুনে খাযরাজ গোত্রেরই অপর ব্যক্তি হযরত বশীর ইবনে সা'দ (রাঃ) দাঁড়ালেন এবং নিজ সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন ঃ

হে আনসার সম্প্রদায়! আমরা যদি ইসলামের সেবায় অংশ গ্রহণ করে থাকি, তাহলে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং তাঁর রসূল পাকের আনুগত্যের খাতিরে করেছি। এতে কারো প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের কোন অবকাশ আছে কি এবং তার বিনিময়ে পার্থিব সম্পদ কামনা করা কতটুকু সমীচীন? শুনুন, রসূলুল্লাহ (সঃ) কুরাইশ বংশের ছিলেন। কুরাইশ বংশ তাঁর প্রতিনিধিত্বের অধিক উপযুক্ত। আল্লাহর শপথ, এই পদের ব্যাপারে আমি তাঁদের সাথে বিবাদ করা মোটেই সমীচীন মনে করি না। আল্লাহকে ভয় করুন এবং তাঁদের বিরোধিতা করবেন না।

আনসারদের মধ্য থেকেই যখন একটি দল কুরাইশদের সমর্থক হয়ে গেল, তখন তাঁরা নীরব হয়ে গেলেন। এখন এ বিষয় তো সিদ্ধান্ত হয়ে গেল যে, কুরাইশদের মধ্য থেকেই খলীফা হবেন। তবে এ পর্যায়টি অবশিষ্ট ছিল যে, কে হবেন তিনি? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) বললেন- ভাইয়েরা, উমর ইবনুল খাত্তাব এবং আবূ উবায়দা ইবনেুল জাররাহ-এর মধ্য থেকে যে কোন একজনে খলীফা হওয়া উচিত। আপনারা যাঁকে উপযুক্ত মনে করেন তাঁকে নির্বাচন করুন।" এ কথা শুনে তাঁরা দুজনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং একবাক্যে বললেন- হে সিদ্দীক! বেশ তো, আপনি থাকতে আমরা এমন সাহস দেখাতে পারি? আপনি

www.e-ilm.weebly.com

মুহাজিরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ছওর গুহার নির্জনে রসূলে খোদার সাথী, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর জীবদ্দশায় নামাজের ইমামতিতে আপনি তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেছেন, অথচ ইসলামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নামাজ। এ সকল মাহাত্ম্য থাকতে রসূলের খলীফা হবার জন্য আপনার চেয়ে অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি আর কে হতে পারে? আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমরাই প্রথমে বায়আত করি। "কিন্তু সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) হাত বাড়ালেন না। হযরত উমর (রাঃ) দেখলেন যে, যদি হযরত আবূ বকর (রাঃ) অসম্মত হন তাহলে বিষয়টি নিয়ে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি হবে। তাই তিনি নিজেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে মহান সিদ্দীকের হাতে বায়আত করে নিলেন। এরপর সকল মুসলমান বায়আত করার জন্য ভেঙ্গে পড়ল। এভাবে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উত্তমভাবে ও স্বাচ্ছন্দে মীমাংসিত হয়ে গেল এবং মুসলমানরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাফন দাফনে লিপ্ত হলেন।

সাধারণ বায়আত

পরবর্তী দিন মসজিদে নববীতে সাধারণ বায়আত গ্রহণ করা হলো। এতে সকল মুসলমান অংশ নিলেন। বায়আত গ্রহণ সম্পন্ন হলে হযরত আবূ বকর (রাঃ) ইসলামের খলীফা হিসেবে মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং খেলাফতের খুতবা দান করলেন। হামদ ও ছানার পর তিনি বললেন–

“হে লোকসকল, আমি আপনাদের শাসক নিযুক্ত হয়েছি। কিন্তু আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। আমি যদি কোন শুভ কাজ করি তাহলে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন, আর কোন ভুল করলে আপনারা আমাকে শুধরে দেবেন। দেখুন, সততাই আমানতদারী, আর মিথ্যাচার খেয়ানত। আপনাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দুর্বল, সে আমার নিকটে শক্তিশালী যতক্ষণ আমি তাকে তার প্রাপ্য আদায় করে না দিই। আল্লাহ চাহেন তো আপনাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবল, সে আমার নিকট দুর্বল, যতক্ষণ আমি তার নিকট থেকে অন্যদের প্রাপ্য আদায় করে না দিই। ইনশাআল্লাহ। দেখুন, যে জনগোষ্ঠী আল্লাহর রাহে জেহাদ করা ছেড়ে দিয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে অপদস্থ করেছেন এবং যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে পাপাচার বিস্তার লাভ করে, আল্লাহ তাদের মধ্যে বালা মুসিবত বিস্তৃত করে দেন। দেখুন, আমি যতদিন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করব, আপনারা আমার আনুগত্য করবেন এবং আমি যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যাচরণ করব, তখন আপনারাও আমার আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন।”

এ খুতবা ছিল একটি বিধিবদ্ধ আইন। তিনি তাঁর খেলাফতকালে এটিকে সামনে রেখেছিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) এর বিরতি

হযরত আলী (রাঃ) এবং তাঁর পরিবারের কতিপয় সদস্য হযরত আবু বকর (রাঃ) এর হাতে বায়আত করতে কিছুটা বিলম্ব করলেন। প্রথমতঃ তাঁরা এজন্য বায়আত করতে পারলেন না যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর আহলে বায়ত (পরিবার) হবার কারণে তাঁরা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাফন দাফনে ব্যাপৃত ছিলেন। অতঃপর আরেকটি বাঁধা সৃষ্টি হলো।

হযরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ) এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) রসূলে আকরাম (সঃ) এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি (মদীনা ও খায়বরের) থেকে নিজেদের হিস্‌সা দাবী করলেন। কিন্তু হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) বললেন- আম্বিয়ায়ে কেরামের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার চলে না। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উক্তি শুনেছি ঃ

لا نورث ما تركناه صدقة

"আমরা, নবীদের মালে মীরাছ হয় না। আমরা যা রেখে যাই তা সদকা হয়ে যায়"।

নবীনন্দিনী (রঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে এ হাদীছ শুনেননি। মুনাফিকদের কুটিলতায় মনোমালিন্য হয়ে গেল। হযরত আলী (রাঃ) এর যেহেতু খাতুনে জান্নাত (রাঃ) এর মনরক্ষার প্রতি খুবই লক্ষ্য ছিল, সে কারণে তিনি ছয়মাস যাবত যতদিন তিনি (ফাতেমা রাঃ) জীবিত ছিলেন বায়আত করতে বিলম্ব করলেন।

তাছাড়া বনু হাশিমের ধারণা ছিল, রসূলে আকরাম (সঃ) এর পরিবার হবার কারণে খেলাফতে তাঁদের অধিকার অগ্রগণ্য থাকবে। স্বয়ং হযরত আলী (রাঃ)ও তাদের সমমনা ছিলেন। কিন্তু যেহেতু এসব মহান ব্যক্তির মধ্যে প্রবৃত্তির তাড়না ছিল না, এজন্য প্রথমে অসুস্থতার সময়ে হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর নিকটে এসে স্বয়ং হযরত সিদ্দীক (রাঃ) ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং তারপর তাঁর ইনতেকালের পরে হযরত আলী (রাঃ) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) কে ডেকে বললেন ঃ

"হে সিদ্দীক, আমরা আপনার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকার করি। আল্লাহ আপনাকে যে খেলাফতের পদ দান করেছেন, তাতে আমাদের কোন হিংসা নেই। তবে এটি নিশ্চিত যে, আমরা নবীগৃহের মানুষ হওয়ার কারণে খেলাফতকে নিজেদের অধিকার মনে করতাম। আপনি আমাদের অধিকার খর্ব করলেন। একথা শুনে হযরত সিদ্দিক আকবার (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর বললেন, " আল্লাহর শপথ, আমার নিকট নিজের আত্মীয়-স্বজনের তুলনায় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আত্মীয়-স্বজন বেশী প্রিয়।" এই বন্ধুত্বসুলভ অভিযোগ নালিশের পর হযরত আলী (রাঃ)ও মসজিদে নববীতে আগমন করে মহান সিদ্দীক (রাঃ) এর হাতে বায়আত করে নিলেন। (তারীখুল উমাম, খাজারী)

www.e-ilm.weebly.com

খেলাফতপূর্ব অবস্থা

নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবূ বকর, উপাধী সিদ্দীক ও আতীক। পিতার নাম উছমান, উপনাম আবু কুহাফা। মাতার নাম সালমা। কুনিয়াত উম্মুল খায়র। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের বনূ তামীম শাখার অন্তর্গত এবং ষষ্ঠ পুরুষ মুররা–এ গিয়ে তাঁর বংশপরম্পরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বংশের সাথে মিশে যায়। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর শুভ জন্মের দুবছর পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্ব থেকেই তিনি সচ্চরিত্র, দায়িত্ববোধ, বিশ্বস্ততা এবং বংশীয় মর্যাদায় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন এবং নিজ সম্পদ থেকে অভাবী ও দরিদ্রদের উপকার করতেন। জাহেলিয়াত যুগে রক্তপণের মাল তাঁরই নিকট জমা রাখা হত। তিনি বংশগতিবিদ্যায় বিশেষ জ্ঞানী ছিলেন।

রসূলে আকরাম (সঃ) এর সাথে শৈশব থেকেই তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। মহানবী (সঃ) এর বুক নবুওওয়াতের আলোকে ভরপুর হলে স্বাধীন ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এ আলো কবুল করলেন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমি যারই নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, তার নিকট থেকে কিছু না কিছু সংকোচ অনুভব করেছি। কিন্তু আবূ বকর বিন্দুমাত্র সংকোচ করেনি।

অতঃপর ঈমান আনয়নের পর তার ঈমানের শক্তির অবস্থা এই ছিল যে, কোন অবস্থাতেই তাতে দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিল না। মে'রাজের সকালে যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহর দরবারে হাজির হবার ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন কাফেররা হাসি তামাশা করতে লাগল। রাস্তায় কোথাও হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কেও পাওয়া গেল। কাফেররা বলতে লাগল- তোমাদের ঐ বন্ধু, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী অবতীর্ণ হবার দাবী করত, এখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করেও এসেছে। তুমি কি তার এ অদ্ভুত কথাও মেনে নেবে? হযরত আবূ বকর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন- কেন নয়? আমি তো এর চেয়েও আশ্চর্যজনক কথা মেনে থাকি। তাঁর এরূপ ঈমানের কারণে নবুওওয়াত দরবার থেকে তাঁকে সিদ্দীক উপাধী দান করা হয়।

ইসলাম প্রচার

ইসলাম প্রচারে তিনি পয়গম্বরের বন্ধুত্বের হক পুরোপুরি আদায় করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ীতে যেতেন এবং ইসলাম প্রচারের বিষয়ে একান্তে পরামর্শ হত। তারপর মহানবী (সঃ) যেসকল গোত্র, জনপদ বা এলাকায় আল্লাহর পয়গাম শোনাতে যেতেন, হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাঁর সঙ্গে থাকতেন।

www.e-ilm.weebly.com

হযরত আবূ বকর (রাঃ) নিজস্বভাবেও এ দায়িত্ব পালনে কোন চেষ্টা বাকী রাখতেন না। অনেক প্রখ্যাত সাহাবী, যাঁদের মধ্যে হযরত উছমান ইবনে আফফান (রাঃ), হযরত যুবাইর ইবনে আওওয়াম (রাঃ), হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ), হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) ও অন্তর্ভুক্ত- তাঁরই সম্পর্ক ও প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কার কাফেরদের ক্রীতদাসগুলো যখন মুসলমান হওয়া শুরু করল এবং কাফেররা তাদেরকে এ অপরাধে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতে লাগল, তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ)ই ছিলেন সে ব্যক্তি যিনি তাদেরকে নিজ অর্থে কিনে কাফেরদের অত্যাচারের থাবা থেকে মুক্তি দান করেন।

হাবশায় হিজরত

মক্কার কাফেররা যখন মুসলমানদের উপর অত্যাচার শুরু করে দিল এবং মুসলমানরা বাধ্য হয়ে হাবশায় হিজরত করার ইচ্ছা করলেন, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) ও রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট হাবশায় হিজরতের অনুমতি চাইলেন এবং হাবশার দিকে রওয়ানা হলেন। তিনি যখন 'বারকুল গামাদ' নামক স্থানে পৌঁছুলেন, তখন 'কারা' গোত্রের নেতা ইবনুদ দাগেনার সাথে সাক্ষাত হলো। ইবনুদ দাগেনা জিজ্ঞেস করল- আবূ বকর, তোমার মত মানুষকে দেশান্তর করা যায় না। তুমি অভাবীদের সাথে সাক্ষাৎ করে থাক, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের উপকারে এসে থাক, মুসাফিরদের মেহমানদারী করে থাক। আমি তোমাকে আমার দায়িত্বে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।' হযরত আবূ বকর (রাঃ) ফিরে এলেন। ইবনুদ দাগেনা ঘোষণা করে দিল, আবূ বকর আমার আশ্রয়ে আছে, কেউ যেন তাকে কষ্ট না দেয়। কাফেররা বলল, আমরা আবূ বকরকে কিছু বলব না। তবে আপনি তাকে বলে দিন সে যেন নীরবে ইবাদত করে।'

কিছুদিন হযরত আবূ বকর (রাঃ) এই শর্তের উপর আমল করলেন। কিন্তু তারপর তাঁর স্বাধীন স্বভাব সত্য ঘোষণার এরূপ বাধ্যবাধকতা মেনে নিতে পারল না। অতএব, তিনি খোলাখুলি ভাবে প্রচার দায়িত্ব পালন শুরু করে দিলেন। ইবনেদ দাগেনা যখন অভিযোগ করল, তখন তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন, আপনার আশ্রয়ের আমার কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহর আশ্রয় আমার জন্য যথেষ্ট।

মদীনায় হিজরত

মক্কার কাফেররা যখন ইসলামের আলো গ্রহণ করতে শুধু অস্বীকারই করলো না, বরং এ আলোটিকে নিভিয়ে দিতে পাক্কা ইচ্ছা করল, তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহর ইংগিত মোতাবেক মদীনা মুনাওওয়ারার ইচ্ছা করলেন।

দুপুরের প্রচণ্ড রোদে তিনি (সঃ) স্বীয় বন্ধু ও হিতাকাংখীর দরজায় করাঘাত এবং নিজ ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল, আমারও কি সাথে যাবার অনুমতি আছে? মহানবী (সঃ) বললেন, হ্যাঁ, প্রস্তুত হও। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমিতো এদিনেরই আশায় পূর্ব থেকে দুটি উটনী প্রস্তুত করে রেখেছি।

এই ঐতিহাসিক সফরের সকল আয়োজন হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর বাড়ী থেকে হলো। হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত আসমা (রাঃ) সফরের জিনিসপত্র ঠিকঠাক করলেন। হযরত আসমা (রাঃ) নিজ কোমর-বন্ধনী খুলে দু টুকরা করলেন এবং এক টুকরা দিয়ে পাথেয় থলি বাঁধলেন। এজন্য তাঁকে 'যুন নিতাকায়ন' বা দু'কোমর বন্ধনীওয়ালী খেতাব দান করা হয়। আবূ বকর (রাঃ)-এর ছেলে আবদুল্লাহকে মক্কার পরিস্থিতি জানানোর কাজে নিযুক্ত করা হয় এবং তার গোলাম আমের ইবনে ফুহায়রাকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয় যে, সে বকরীগুলো নিয়ে ছওর পাহাড়ে চলে আসবে এবং টাটকা দুধ পান করাবে।

এ সকল আয়োজনের পর মহানবী (সঃ) নিজের দুজন সবচেয়ে পুরনো ও সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুর একজন (হযরত আলী)কে নিজ বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এবং অপরজন (হযরত আবূ বকর) কে সাথে নিয়ে মক্কা থেকে বের হলেন এবং ছওর গুহায় গিয়ে প্রথম যাত্রাবিরতি করলেন। কাফেররা যখন জানতে পারলো যে, তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে, তখন তারা ক্রুদ্ধ হলো এবং তাঁর (সঃ) খোঁজে চারিদিকে লোক পাঠালো। কতিপয় ব্যক্তি খুঁজতে খুঁজতে ঠিক গুহার মুখের নিকটে পৌঁছালো। হযরত আবূ বকর (রাঃ) ঘাবড়াতে লাগলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল, কাফেররা যদি নীচের দিকে তাকায় তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে। মহানবী (সঃ) অত্যন্ত স্থিরতার সাথে বললেন, "হে আবূ বকর, চিন্তা করো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে রয়েছেন।'

কুরআন মজীদে এ ঘটনার উল্লেখ এ শব্দে করা হয়েছে ঃ

الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذهما فى الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.

'তোমরা যদি তাঁকে সাহায্য না কর, তাহলে (না-ই করলে) আল্লাহ্ তাঁকে সে সময়ে সাহায্য করেছেন, যখন কাফেররা তাঁকে সাথীসহ বের করে দিয়েছিল, যখন তাঁরা দুজনে গুহায় (লুকিয়ে) ছিলেন, যখন তিনি তাঁর সাথীকে বলছিলেন, চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে রয়েছেন।' (তাওবা ৪০)

www.e-ilm.weebly.com

এভাবে রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় গুহাবন্ধুর সাথে দিনে লুকিয়ে থেকে এবং রাতে সফর করতে করতে মদীনা মুনাওওয়ারা পৌছুলেন এবং ইসলামের ইতিহাসে সত্যের বিজয় ও হকের শ্রেষ্ঠত্বের দ্বার খুলে গেল।

জিহাদে অংশগ্রহণ

হিজরতের পর কাফেরদের সাথে লড়াইয়ের ধারা শুরু হলে হযরত আবূ বকর (রাঃ) সকল যুদ্ধে শরীক হন এবং বীরত্ব ও ত্যাগের পূর্ণ স্বাক্ষর রাখেন। কতিপয় আকস্মিক কারণে উহুদ ও হুনায়ন যুদ্ধে মুসলমানদের কিছু ক্ষতি হয়েছিল। ইসলামী বাহিনীর এ বীর জেনারেল নিজ স্থানে পাহাড়ের ন্যায় অটল ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বন্ধুত্বের পূর্ণ হক আদায় করেন।

তাবুক যুদ্ধ ছিল রসূলুল্লাহ (সঃ) এর জীবনের শেষ যুদ্ধ। এ যুদ্ধের জন্য যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজ উৎসর্গিত শিষ্যদের আহ্বান করলেন এবং তাদের নিকট জীবন ও সম্পদের ত্যাগ কামনা করলেন, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) নিজ অবস্থা অনুযায়ী এতে অংশ নিলেন। ঘরে যা কিছু ছিল, তা তিনি এনে নিজ মনিবের পায়ে সমর্পণ করলেন। হুযুর (সঃ) যখন তাঁকে প্রশ্ন করলেন, হে আবূ বকর! তুমি সন্তানাদির জন্য কি রেখেছো? তখন তিনি নিতান্ত নিঃসংকোচে জবাব দিলেন- তাদের জন্য আল্লাহ ও রসূলই যথেষ্ট। রসূলুল্লাহ (সঃ) এ শেষ যুদ্ধে পতাকাবাহনের দায়িত্ব তাঁকেই অর্পণ করেন।

আবূ বকর (রাঃ) এর হজ্জ

মক্কা নগরী কুফর ও শিরকের নাপাকী থেকে পবিত্র হয়ে গেলে পরবর্তী বছর রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ)কেই নিজের প্রতিনিধি ও হজ্জ নেতা করে পাঠিয়ে দিলেন। এ সময়ে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর নেতৃত্বে হযরত আলী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সে ঐতিহাসিক ঘোষণা পাঠ করে শোনালেন যাতে ইসলাম ও কুফরের সীমারেখা পৃথক করে দেয়া হয়েছিল।

জামাআতের ইমামতি

রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন পরকালযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন মসজিদে নববীর ইমামতির উঁচু পদমর্যাদা তাঁকেই দান করলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) এটি মোটেই পছন্দ করছিলেন না। তাই বার বার পীড়াপীড়ি করছিলেন যে, এ দায়িত্ব অন্য কাউকে অর্পণ করা হোক। কিন্তু দু জাহানের নেতা মহানবী (সঃ) এর চেয়েও কোন মূল্যবান পদমর্যাদার (খেলাফত) পটভূমি প্রস্তুত করবেন। সেজন্য তিনি এ সিদ্ধান্তে কোন পরিবর্তন করলেন না। দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার দিন ফজরের সময় মহানবী (সঃ) হুজরা শরীফের পর্দা উঠিয়ে দেখলেন যে,

www.e-ilm.weebly.com

মুসলমানরা হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর ইমামতিতে পূর্ণ ঐক্য ও স্থিরতার সাথে নিজেদের দ্বীনি দায়িত্ব পালন করছেন। তাই তিনি স্বাভাবিকভাবেই মুচকি হাসলেন এবং পুনরায় পর্দা টেনে দিলেন।

দৃঢ়তা ও স্থিরতা

রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ইন্তেকালের খবর তাঁর প্রাণোৎসর্গীদের নিকট বজ্রাঘাত হয় পতিত হলো। তাঁরা কোন অবস্থাতেই নিজেদের মনিব ও প্রভুর বিচ্ছেদ কল্পনা করতেও প্রস্তুত ছিলেন না। হযরত উমর (রাঃ) তো তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন- যে ব্যক্তি বলবে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ইন্তেকাল হয়েছে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব।

হযরত আবূ বকর (রাঃ) এদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) এর অসুস্থতা একটু কম দেখে 'সুখ' নামক স্থানে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে যখন এ পরিস্থিতি দেখলেন, তখন তিনি হযরত হযরত উমর (রাঃ)-কে বললেন, তুমি বসো। কিন্তু তিনি যখন মানলেন না, তখন নিজেই পৃথকভাবে বক্তৃতা করতে শুরু করলেন। সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশ তাঁরই আওয়াজের প্রতি মনোযোগী হলো। তিনি বললেন ঃ

"যারা মুহাম্মদ (সঃ) এর ইবাদত করতো, তাদের জানা উচিত যে, তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেছে। কিন্তু যারা আল্লাহর ইবাদত করতো, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মারা যাবেন না।" তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم.

'মুহাম্মদ (সঃ) একজন রসূলই, যাঁর পূর্বে অনেক রসূল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছেন। তাহলে কি তিনি মারা গেলে বা শহীদ হয়ে গেলে তোমরা পিছনে ফিরে যাবে?' (আলে ইমরান ১৪৪)

তাঁর এ বক্তৃতায় জাদুর কাজ করল। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমাদের মনে হলো যেন এ আয়াত এক্ষনি নাযিল হলো।

খেলাফতকালের ঘটনাবলী

উসামা বাহিনী

রসূলুল্লাহ (সঃ) ইন্তেকালের কিছুকাল পূর্বে রোমানদের নিকট থেকে 'মূতা' যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য একটি বাহিনী প্রস্তুত করার আদেশ করেছিলেন এবং এ বাহিনীর প্রধানরূপে হযরত যায়দ ইবনে হারিছা (রাঃ) (যিনি মূতা যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন) এর পুত্র উসামা (রাঃ)-কে নিযুক্ত করেছিলেন। এ বাহিনীতে অধিকাংশ প্রথম সারির সাহাবায়ে কেরাম যথা হযরত আবূ বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ) প্রমুখ শামিল ছিলেন। কিন্তু এ বাহিনী রওয়ানা হবার পূর্বেই মহানবী (সঃ) পীড়িত হয়ে গেলেন এবং তারপর তিনি ইন্তেকালও করলেন।

www.e-ilm.weebly.com

রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ইন্তেকালের সাথে সাথে আরবে ধর্মান্তরের মহামারী ছড়িয়ে পড়লো। নও মুসলিম গোত্রসমূহ যাদের অন্তরে ঈমানের নূর পূর্ণভাবে প্রতিবিম্বিত হয়নি, এক এক করে মুরতাদ হতে লাগলো। এ সময়টি ছিল ইসলামের জন্য বড়ই নাজুক। অনেক সাহাবীর পরামর্শ ছিল, কিছু দিনের জন্য উসামা বাহিনীর যাত্রা মূলতবী রাখা হোক এবং প্রথমে মুরতাদদের শায়েস্তা করা হোক। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রাঃ) এ পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন–

"আমি ঐ পতাকা খুলতে পারব না যা রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং নিজ পবিত্র হাতে বেঁধেছেন"। তারপর কতিপয় সাহাবী আরজ করলেন, নবীন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি উসামা (রাঃ) এর স্থানে অন্য কাউকে প্রধান নিযুক্ত করুন। তিনি রাগতস্বরে বললেন, আল্লাহর রসূল যাকে প্রধান নিযুক্ত করেছেন, তাঁকে বরখাস্ত করার আমার কি অধিকার আছে?

প্রকৃতপক্ষে হযরত আবূ বকর (রাঃ) যদি এ দু পরামর্শের কোন একটি মেনে নিতেন, তাহলে অন্যদের জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) এর আদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার একটি দৃষ্টান্ত হয়ে যেত।

মোটকথা হযরত আবূ বকর (রাঃ) উসামা বাহিনীর রওয়ানা হবার আদেশ দিলেন এবং তাঁকে বিদায় দেবার জন্য কিছুদুর নিজে গেলেন এভাবে যে, হযরত উসামা (রাঃ) ঘোড়ায় চড়ে আর হযরত আবূ বকর (রাঃ) পায়ে হেঁটে তার সাথে চলছিলেন। হযরত উসামা (রাঃ) বললেন, হে রসূলের খলীফা, আপনি আরোহণ করুন, নইলে অনুমতি দিন আমি নেমে পায়ে হাঁটি। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন- আল্লাহর শপথ, দুটির কোনটিই হতে পারে না। অসুবিধা কি আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় কিছুদূর নিজের পায়ে ধুলো লাগাই? যেহেতু গাজীর প্রতি কদমের বিনিময়ে সাত শত নেকী লেখা হয়ে থাকে।

উসামা বাহিনীতে হযরত উমর (রাঃ)ও শামিল ছিলেন এবং খলীফাতুল মুসলিমীনের পরামর্শদাতা হিসেবে তাঁর মদীনাতে থেকে যাওয়া জরুরী ছিল। তাই হযরত আবূ বকর (রাঃ) নিজ প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে হযরত উসামার নিকট আবেদন করলেন যে, তিনি তাঁকে রেখে যান। উসামা (রাঃ) অনুমতি দিলেন। এও ছিল মূলতঃ নবুওওয়াত সত্তার সম্মানের খাতিরে। হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর দৃষ্টিভংগী ছিল এই যে, উসামা (রাঃ) সেই পবিত্র সত্তার পক্ষ থেকে আদিষ্ট, যাঁর আনুগত্য আমার আনুগত্যের চেয়ে অগ্রগামী। অতএব, তাঁর এখতিয়ারে আমার হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।

www.e-ilm.weebly.com

সোনালী উপদেশ

হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে উসামা (রাঃ) যখন পৃথক হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাঁকে অতি মূল্যবান উপদেশ দান করেন। তার কতিপয় নিম্নরূপ ঃ

"দেখ, খেয়ানত করবে না, ধোকা দেবে না, সম্পদ লুকোবে না, কারো অঙ্গ কাটবে না, বৃদ্ধ, শিশু ও স্ত্রীলোকদের হত্যা করবে না, খেজুর গাছ জ্বালাবে না, ফলবান গাছ কাটবে না, আহারের প্রয়োজন ব্যতীত ছাগল, গরু বা উট কাটবে না। তোমরা একদল লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, যারা দুনিয়া পরিত্যাগ করে নিজ নিজ ইবাদতখানায় বসে আছে। তাদের উত্যক্ত করবে না।"

এ এমন মূল্যবান উপদেশাবলী, যা যুদ্ধনীতি রূপে গৃহীত হলে আজও দুনিয়া থেকে বর্বরতা ও হিংস্রতার অনেকটাই বিদায় হয়ে যেত।

উসামা বাহিনী ১লা রবিউস সানী ১১হিঃ মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে যায়। তারা সিরিয়ার নিকটবর্তী 'কুযাআ' নামক জনপদসমূহ পদদলিত করে চল্লিশ দিন পরে বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে ফিরে এলেন।

সিরিয়ার এ আক্রমণ ইসলামের জন্য অপরিমেয় উপকারী প্রমাণিত হলো। মুনাফিক ও মুরতাদরা বলতে লাগলো, মুসলমানদের শক্তিতে কোন হ্রাস ঘটেনি। নইলে তারা এত দূরে এত শক্তিশালী শত্রুর মোকাবেলায় নিজবাহিনী পাঠাতো না। ফলে অনেক মুরতাদ গোত্র ভীত হয়ে পুনরায় ইসলামে দাখিল হলো।

ধর্মান্তর ফিতনা

ধর্মান্তরের কারণ

রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ওফাতের সাথে সাথে আরবের বিভিন্ন এলাকায় ধর্মান্তরের ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হতে লাগলো। এ ফিতনার কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) ইসলামের পূর্বে আরববাসী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। ইসলাম এ সকল ভাগ একত্রিত করে এক জাতি করে দেয়। কিন্তু যেহেতু তারা দীর্ঘকাল যাবত এর অভ্যস্ত ছিল না, সেজন্য তারা এই জাতিগত ব্যবস্থাকে নিজেদের স্বাধীনচেতা মনোভাবের জন্য একটি শৃংখল মনে করলো এবং তা ভেঙ্গে পালাবার চিন্তা করতে লাগলো।

(২) কুরআনুল কারীমে ইসলামী হুকুমতের অর্থনৈতিক বিভাগের জন্য 'যাকাত'কে মৌলিক ভিত্তি ধার্য করা হয়েছে। যাকাত ইসলামের আইন অনুসারে ধনীদের নিকট থেকে আদায় করে দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা। কিন্তু এ-ও একটি বোঝা হিসেবে মনে করা হলো এবং এ বোঝা ঝেড়ে ফেলে দেবার জন্য চেষ্টা হতে লাগলো।

www.e-ilm.weebly.com

(৩) শরাব আরবদের ঘটিতেই ছিল। এ ছিল তাদের খুব পছন্দনীয় খেলা। যিনা ছিল তাদের প্রিয় বিনোদন। ইসলামের আইন এসব অসৎ কর্মের উপর কড়া বাধা আরোপ করলো যা তাদের নিকট খুবই কষ্টকর মনে হয়েছিল।

এ সকল ব্যাধি তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিল, যারা ইসলামের কেন্দ্র মদীনা থেকে দুরে নজদ, য়ামান ইত্যাদি এলাকায় বসবাস করত। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাহচর্য তাদের নসীব হয়নি। তারা ইসলামের প্রতিপত্তি দেখে মাথা নত করেছিল ঠিকই, কিন্তু অন্তরে বিনয় সৃষ্টি হয়নি। কুরআনে তাদেরই কথা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا و لما يدخل الإيمان فى قلوبكم.

গ্রাম্য আরবরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আপনি বলে দিন, তোমরা ঈমান আন নাই, বরং বল আমরা মুসলমান হয়েছি, ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়নি। (হুযুরাত ১৪)

সর্বোপরি আল্লাহর সত্য নবীর সাফল্য দেখে আরবে অনেক মিথ্যা নবুওওয়াতের দাবীদার আত্মপ্রকাশ করল। এই হতভাগারা মনে করল নবুওওযাতের দাবী পার্থিব উন্নতির একটি উত্তম উপায় হতে পারে। যেসব লোকের অন্তরে পূর্ব থেকেই ব্যাধি ছিল, তারা এইসব শয়তানের জালে সহজে আটকে পড়ে তাদের দলে শামিল হয়ে গেল।

সিদ্দীকী দৃঢ়তা

এই ফিতনার আগুন নেভানোর জন্য সিদ্দীকী দৃঢ়তাই প্রয়োজন ছিল। এ ব্যাপারে তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করলে কতিপয় সাহাবী আরজ করলেন, এখন খুব নাজুক সময়। যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে নমনীয় আচরণ করা হোক। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ, একটি ছাগলের বাচ্চাও যদি তারা আদায় করতে অস্বীকার করে যা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর দেয়া হত, তাহলেও আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। হযরত উসামা (রাঃ) ফিরে এলেই তিনি তাঁকে মদীনায় নিজ স্থলবর্তী নিযুক্ত করে আবাস ও যাবয়ান গোত্রসমূহের মোকাবেলায় বেরিয়ে পড়লেন। এ গোত্রগুলো পরাজিত হলো এবং তাদের চারণভূমি মুসলমান মুজাহিদদের ঘোড়ার জন্য ওয়াকফ করে দেয়া হলো।

ইতিমধ্যে উসামা বাহিনীর ক্লান্তি দূর হয়েছে। তিনি সে বাহিনী নিয়ে যুলকিসসা নামক স্থানে গিয়ে পৌছালেন। এ স্থানটি মদীনা থেকে নজদের দিকে এক বারীদ বা ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে তিনি গোটা ইসলামী বাহিনীকে এগার ভাগে বিভক্ত করলেন। প্রত্যেক ভাগের জন্য একজন নেতা নিযুক্ত করলেন এবং তাকে একটি পতাকা দিলেন। এ এগারজন নেতাকে নিজ নিজ বাহিনী সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় রওয়ানা করা হলো। এগার জন নেতার নাম এই

www.e-ilm.weebly.com

(১) খালেদ ইবনে আলীদ (২) ইকরামা ইবনে আবী জাহল (৩) শুরাহবীল ইবনে হাসানা (৪) মুহাজির ইবনে আবী উমায়্যা (৫) হুযায়ফা ইবনে মিহসান (৬) আরফাজা ইবনে হারছমা (৭) সুওয়দ ইবনে মুকাররিন (৮) আলা ইবনুল হাযরামী (৯) তুরায়ফা ইবনে হাজিয (১০) আমর ইবনে আস (১১) খালেদ ইবনে সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

মুজাহিদদের এ বাহিনীসমূহের রওয়ানার পূর্বে হযরত আবূ বকর (রাঃ) মুরতাদদের নামে এক সাধারণ বার্তা প্রেরণ করেন। এ বার্তায় তিনি তাদেরকে ফেতনা ফাসাদ থেকে বিরত হতে ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বে ফিরে আসতে আহ্বান জানান এবং তাদের সাথে ওয়াদা করেন যে, তারা যদি এ আহ্বান কবুল করে নেয় তাহলে তাদের কোনরূপ উত্যক্ত করা হবে না। অতঃপর মুজাহিদ বাহিনীর সেনানায়কদের নামে নিম্নোক্ত নির্দেশনামা জারী করেন ঃ

"আমি ইসলামের মুজাহিদদের উপদেশ দিচ্ছি, তারা যেন সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহর আদেশ পালনে পুরো চেষ্টা চালায়, যেসকল লোক ইসলামের পরিসর থেকে বের হয়ে শয়তানের জালে আটকা পড়েছে, তাদের সাথে জিহাদ করে, কিন্তু তলোয়ার উঠানোর পূর্বে তাদেরকে ইসলামের বাণী পৌঁছাবে এবং তাদের উপর যুক্তিপূর্ণ করে, যদি তারা ইসলাম কবুল করে নেয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ হাত সংযত করবে। কিন্তু যদি তারা অস্বীকার করে তাহলে তারা যতক্ষণ না ফিরে আসে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। মুরতাদরা যখন পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করবে, তখন ইসলামী সেনাবাহিনীর প্রধান তাদেরকে অবহিত করে দেবেন তাদের জিম্মায় ইসলামের কি কি অত্যাবশ্যক করণীয় রয়েছে এবং মুসলমানদের উপর তাদের কি কি প্রাপ্য রয়েছে। তাদের করণীয়সমূহ তাদের দ্বারা করানো হবে এবং তাদের প্রাপ্য আদায় করা হবে। বাহিনীপ্রধান নিজ সাথীদেরকে দ্রুততা ও ফেতনা ফাসাদ থেকে বিরত রাখবেন। দুশমনদের বসতি এলাকায় আকস্মিকভাবে প্রবেশ করবে না। খুব দেখে শুনে প্রবেশ করবে পাছে মুসলমানদের কোন ক্ষতি না হয়। সেনা প্রধান রওয়ানা ও অবস্থানের সময় নিজ অধীনস্থদের সাথে মধ্যপন্থা ও নমনীয় আচরণ করবেন। তাদের দেখাশুনা করবেন, তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবেন এবং নরম ভাষায় কথা বলবেন।"

অতঃপর ইসলামী বাহিনীর দলসমূহ অভিজ্ঞ প্রধানদের নির্দেশনা মোতাবেক শত্রুর মোকাবেলায় রওয়ানা হয়।

তুলায়হার তওবা

বনূ আসাদে এক ব্যক্তি ছিল তুলায়হা। বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে এসে তার মাথায় নবুওওয়াতের পাগলামী চেপে বসল। সে নিজ কওমের মধ্যে নবুওওয়াতের দাবী করে বসল। বনু আসাদ সবাই তার অনুগত হয়ে গেল। বনু

www.e-ilm.weebly.com

আসাদ ও বনূ তাইয়ের মাঝে বন্ধুত্ব চুক্তি ছিল। অতএব, তারাও নিজ বন্ধুদের সাথী হল এবং গাতফান গোত্রের অনেক লোক তাতে শরীক হলো। তুলায়হা এই বিরাট বাহিনী নিয়ে নজদের বাজাখা প্রস্রবণের নিকটে এসে ছাউনি ফেলল।

হযরত খালেদ ইবনে অলীদ তুলায়হার মোকাবেলার জন্য রওয়ানা হলেন। হযরত আদী ইবনে হাতেম তায়ী যিনি বনূ তাইয়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য ছিলেন, এ সময় মদীনায় অবস্থান করছিলেন। তিনি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর নিকট আরজ করলেন, আমাকে অনুমতি দিন, আমি নিজ গোত্রকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এ ফেতনা থেকে মুক্ত করি। হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাকে অনুমতি দিলেন এবং হযরত আদী (রাঃ) এর প্রচেষ্ঠায় তাঁর গোত্রের সকল লোক তুলায়হা থেকে পৃথক হয়ে গেল। একই প্রচেষ্টা তিনি জাদীলা গোত্রেও চালালেন এবং সেখানেও তিনি সফল হলেন।

হযরত খালেদ (রাঃ) নিজ বাহিনী নিয়ে বাজাখা প্রস্রবনের তীরে পৌছালেন। তুলায়হা বাহিনীর সাথে প্রচণ্ড মোকাবেলা হল। তুলায়হা বাহিনীর পরাজয়ের আলামত দেখা দিলে তুলায়হার সহযোগী গাতফান গোত্রের নেতা উয়ায়না ইবনে হুসায়ন ফাযারী তার নিকট এল। তুলায়হা এ সময় চাদরমুড়ি দিয়ে এমন ভাবে বসে ছিল যেন তার নিকট অহী নাযিল হচ্ছে। উয়ায়না জিজ্ঞেস করল, বলুন, জিবরীল কোন বার্তা নিয়ে এলেন। তুলায়হা বলল, হ্যাঁ। এরপর সে একটি ছন্দবদ্ধ কথা শুনালো, যার অর্থ- অবশেষে জয় আমাদের হবে। উয়ায়না বলল, হে ফাযারা, এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। তারপর নিজের লোকদের নিয়ে তার বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে গেল।

তুলায়হা যখন দেখল যে, পরাজয় অবধারিত, তখন সে নিজের স্ত্রীসহ সিরিয়ার দিকে পালিয়ে গেল এবং পরবর্তীতে কুফর থেকে তওবা করে পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করে। তুলায়হা পরবর্তীতে ইরাক বিজয়ের কালে খুব বীরত্ব প্রদর্শন করে এবং নিজ গুনাহের কাফফারা আদায়ের চেষ্টা করে।

মালেক ইবনে নুওয়রার হত্যা

রসূলুল্লাহ (সঃ) বনূ তামীমে পাঁচ জন আমীর মনোনীত করেছিলেন। মহানবী (সঃ) এর ইন্তেকাল হলে তাদের কেউ কেউ মুরতাদ হয়ে গেল, আর কেউ কেউ ইসলামে অবিচল থাকলো। মুরতাদদের মধ্যে মালেক ইবনে নুওয়রাও ছিল। সে যাকাত প্রদানে বাঁধা দিল এবং গোত্রের মুসলমানদের সাথে লড়াই শুরু করে দিল। বনূ তামীমে যখন গৃহযুদ্ধ চলছিল, তখন বনূ তাগলিব গোত্রের সাজাহ নামীয় এক মহিলা এদিক দিয়ে যাচ্ছিল। এ মহিলা পূর্বে খৃষ্টান ছিল। মহানবীর (সঃ) ইন্তেকালের পর তারও নবুওওয়াতের পাগলামী পেয়ে বসল এবং আরবের

www.e-ilm.weebly.com

বেশ কিছু লম্পট তার সাথী হলো। সে তার সাথীদের নিয়ে মদীনায় আক্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল। পথে বনু তামীমের বসতি এলাকার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে মালেক ইবনে নুওয়রার নিকট মৈত্রী বার্তা পাঠাল। মালেক তার বার্তা কবুল করে নিল এবং তাকে পরামর্শ দিল যে, মদীনা হামলা করার পূর্বে বনূ তামীমের মুসলমানদের উপর হামলা করা হোক। সাজাহ সে মুসলমানদের উপর হামলা করলো। তাদের সাথে মোকাবেলার শক্তি মুসলমানদের ছিল না। তাই তারা পালিয়ে গেল। সাজাহ তার বাহিনী নিয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। নাবাজ নামক স্থানে পৌঁছলে বনূ তামীমেরই একটি দলের সাথে তার মোকাবেলা হলো। তারা তার কিছু ব্যক্তিকে বন্দী করে নিল। অবশেষে এই শর্তে সন্ধি হল যে, সাজাহ তাদের ব্যক্তিদের ছেড়ে দেবে এবং তারা তার লোকদের এবং সে মদীনার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে ফিরে যাবে। সাজাহ ব্যর্থ হয়ে য়ামামার দিকে ফিরে গেল।

এ সময়ে বনু তামীমের মুরতাদদের আল্লাহ হেদায়াত দান করলেন। তারা পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করলো। কিন্তু মালেক ইবনে নুওয়রা এখনও কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। সে তার সাথীদের নিয়ে বাতাহ নামক স্থানে গিয়ে ছাউনী ফেলল। খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) তুলায়হার মোকাবেলা থেকে অবসর হয়ে মালেক ইবনে নুওয়রার মোকাবেলার উদ্দেশ্যে এগুলেন। মালেক তার সাথীদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) লোক পাঠিয়ে মালেক ও তার সাথীদের গ্রেফতার করলেন। তিনি মালেকের প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন এবং তার স্ত্রীকে বিবাহ করলেন।

মুসলমানদের কেউ কেউ হযরত উমর (রাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করেন যে, মালেক ইবনে নুওয়রা গ্রেফতার হবার পূর্বে নিজ এলাকায় আজান দেয়ায়েছিল। অতএব খালেদ তাকে হত্যা করিয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন। খালেদ ইবনে অলীদ জবাব দিলেন যে, মালেক মৃত্যুর ভয়ে আজান দেয়ায়েছে। হযরত আবূ বকর (রাঃ) ফয়সালা করলেন যে, যেহেতু অবস্থা বিশ্লেষণে খালেদের ভুল হয়েছে, তাই তাঁর নিকট থেকে কিসাস (প্রতিহত্যা) গ্রহণ করা যাবে না এবং মালেক ইবনে নুওয়রার রক্তপণ নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দিলেন। তিনি এ-ও বললেন, আল্লাহর তলোয়ার, যাকে তিনি কাফেরদের উপর চমকিত করেছেন, আমি তাকে লুকাবার কে?

মুসায়লামা কাজ্জাবের হত্যা

বনূ হানীফা গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট ইসলাম গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়েছিল। এই প্রতিনিধি দলে জনৈক মুসায়লামা ইবনে তামামাও ছিল। মুসায়লামা বলল-

www.e-ilm.weebly.com

আমি মুসলমান হব, তবে মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর পরে আমাকে তাঁর খলীফা করবেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর হাতে এ সময় একটি খেজুরের ডাল ছিল। তিনি বললেন, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণের বিনিময়ে খেজুরের এই ডালটি আমার নিকট কামনা কর, তাহলেও আমি দেব না। আমি দেখছি যে, তুমি সেই মিথ্যাবাদী, যার সম্পর্কে আমাকে পূর্বেই স্বপ্নে জানানো হয়েছে।১

মুসায়লামা এভাবে নিরাশ হয়ে নিজ দেশ য়ামামায় ফিরে গেল এবং মহানবী (সঃ) এর অসুস্থতার খবর শুনে নবুওওয়াতের দাবী করে বসল। সে বলল, আমাকে নবুওওয়াতিতে মুহাম্মাদ (সঃ) এর শরীক করে দেয়া হয়েছে। তারপর সে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকটে একটি পত্র পাঠাল। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল ঃ

আল্লাহর রসূল মুসায়লামার পক্ষ থেকে আল্লাহর রসূল মুহাম্মদে (সঃ) নামে-

سلام على من اتبع الهدى اما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين،

"আপনাকে সালাম। আমাকে নবুওয়াতিতে আপনার শরীক করে দেয়া হয়েছে। অতএব, দুনিয়ার অর্ধেক আপনার, আর অর্ধেক আমার। কিন্তু আপনার ন্যায় বিচারে আমার আশা নেই।"

রসূলুল্লাহ (সঃ) তার জবাব দিলেন॥ হেদায়াত অনুসারীকে সালাম। পৃথিবী মূলতঃ আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, তাঁকে তার উত্তরাধিকারী করেন, পরিণামে সাফল্য মুত্তাকীদের হয়ে থাকে।

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বকর (রাঃ) হযরত ইকরিমা (রাঃ) ইবনে আবী জাহলকে তার মোকাবেলায় পাঠান এবং তাঁর পিছনে শুরাহবীল ইবনে হাসানাকে তার সাহায্যের জন্য পাটালেন। ইকরিমাকে তিনি বলে দিয়েছিলেন শুরাহবিলের অপেক্ষা করতে। কিন্তু ইকরিমা বিজয়ের মুকুট একাকী নিজ মাথায় ধারণের আগ্রহে শুরাহবীলের অপেক্ষা না করে মুসায়লামার উপর হামলা করে বসলেন এবং পরাজিত হলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) ঘটনা অবহিত হয়ে খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং আদেশ দিলেন যে, তিনি যেন য়ামানের দিকে গিয়ে মুহরাবাসীদের মোকাবেলা করেন। খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) এ সময় বনূ তামীমের মোকাবেলা থেকে অবসর হয়েছেন।

তাঁকে তিনি মুসায়লামার মস্তক চূর্ণ করতে পাঠালেন এবং শুরাহবীলকে আদেশ দিয়ে পাঠালেন যে, তিনি যেন তাঁর অপেক্ষা করেন।

---

(১) রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বপ্নে দেখেন যে, তার দুহাতে স্বর্ণের দুটি কাঁকন রয়েছে। তিনি খুব চিন্তা করলেন। স্বপ্নেই তাঁকে বলা হল, ফুঁক দিন। তিনি ফুঁক দিলেন। আর কাঁকন দুটি উড়ে গেল। তিনি বলেন, আমি এ স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা নিয়েছি যে, আমার পরে দুজন মিথ্যানবী পয়দা হবে। এর একজন ছিল আসওয়াদ আনাসী এবং অপরজন মুসায়লামা। (মুসলিম)

www.e-ilm.weebly.com

হযরত খালেদ ইবনে অলীদের পৌঁছুনোর খবর পেয়ে মুসায়লামা তার চল্লিশ সহস্র জওয়ানের বিশাল বাহিনী নিয়ে মোকাবেলার জন্য বের হল। দু বাহিনীর ঘোরতর লড়াই হল। প্রথম দিকে মুসলমানদের পরাজয়ের আলামত দেখা দিতে লাগল এবং মুসায়লামার লোকেরা হযরত খালেদের তাঁবুর নিকটে পৌঁছে গেল। কিন্তু হযরত খালেদ (রাঃ) সামলে নিয়ে হামলা চালালেন এবং অনেক দূর পর্যন্ত মুসায়লামার লোকদের ধাওয়া করে নিয়ে গেলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) স্বয়ং মুসায়লামাকে মোকাবেলা করার জন্য আহ্বান জানালেন। সে এল কিন্তু মোকাবেলায় টিকে থাকতে না পেরে পালালো। তার সৈন্যদের মধ্যেও পলায়ন শুরু হলো এবং শোচনীয় ভাবে পরাজিত হলো। মুসায়লামা তার কিছু লোক নিয়ে একটি বাগানে গিয়ে লুকালো এবং বাগানের দরজা বন্ধ করে দিল। এই বাগানটি সে 'হাদীকাতুর রহমান' নামে আখ্যায়িত করেছিল। একজন বীর আনসারী হযরত বারা ইবনে মালিক (রাঃ) বললেন, আমাকে বাগানের মধ্যে ছুঁড়ে দাও। তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হলো। তিনি একাকী মুসায়লামার প্রহরীদের হত্যা করে বাগানের দরজা খুলে দিলেন। এখন মুসলমানরা বাগানে ঢুকে পড়লেন এবং মুসায়লামার সাথীদের মৃত্যুশরাব পান করাতে লাগলেন। স্বয়ং মুসায়লামাও আল্লাহর তরবারী থেকে রেহাই পেল না। মুসায়লামার হত্যাকারীদের মধ্যে হযরত হামজা (রাঃ)-এর শহীদকারী ওয়াহশী (রাঃ)ও ছিলেন। তিনি যেন এভাবে নিজের গুনাহের কাফফারা আদায় করলেন।

মুসায়লামা নিহত হবার পর তার কওম 'বনূ হানিফা' মুসলমানদের সাথে নমনীয় শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তিসম্পন্ন হতেই হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর আদেশ পৌঁছল যে, বনূ হানিফার সকল সৈন্যকে হত্যা করা হোক। কিন্তু হযরত খালেদ (রাঃ) যেহেতু তাদের সাথে চুক্তি করে ফেলেছিলেন, তাই তাতে অবিচল থাকলেন। পরে বনূ হানিফা গোত্র মুসলমান হয়ে যায়।

আসওয়াদ আনাসীর হত্যা

রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সময়ে য়ামান বিজিত হলে তিনি (সঃ) বাজান ফারসীকে য়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন। বাজান ছিলেন পারস্যরাজ কিসরার পক্ষ থেকে নিযুক্ত য়ামানের গভর্ণর। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে স্বপদে বহাল রাখেন। তাঁর রাজধানী ছিল সানআ। বাজানের ইন্তেকাল হলে তিনি য়ামানের প্রশাসন একাধিক আমেলের মধ্যে বন্টন করে দেন। এসব আমেলদের মধ্যে একজন ছিল বাজানের পুত্র শহর। তাকে সানআর আমেল নিযুক্ত করা হয়।

রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে য়ামানের জনৈক আসওয়াদ (মূল নাম আবহালা, আনাস গোত্রের সাথে সম্পর্কিত) নবুওয়াতের দাবী করলো। মাযহাজ গোত্রের লোকেরা তার অনুসারী হলো। তারা আসওয়াদের সাথে মিলিত হয়ে নাজরানের উপর হামলা করলো এবং সেখান থেকে নাজরানের আমেল

www.e-ilm.weebly.com

আমর ইবনে হাজমকে বহিষ্কার করলো। এখন আসওয়াদ তার কওমের সাতশত লোক নিয়ে সানআয় হামলা চালালো এবং সেখানকার গভর্ণর শহর ইবনে বাজানকে হত্যা করে সানআ আয়ত্ত নিয়ে নিল। এ বিজয়ের ফলে সমগ্র য়ামানে তার উৎসব পালন করা হলো এবং য়ামানের অনেক দুর্বলঈমান লোক তার পতাকাতলে একত্রিত হলো।

রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন এ পরিস্থিতির কথা জানলেন, তখন আবনা (য়ামানের ইরানী বাহিনী যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল) এর নেতাদের এবং হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) ও মুআজ ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে লিখে পাঠালেন যে, আসওয়াদকে যে কোন প্রকারে হত্যা করা হোক।

আসওয়াদ শহর ইবনে বাজানকে শহীদ করে তার স্ত্রীকে বিবাহ করে নিয়েছিল। শহর-এর স্ত্রী আসওয়াদকে খুব ঘৃণা করত এবং তার থাবা থেকে মুক্তি কামনা করছিল। আবনা বাহিনীর নেতা ফীরোজ ও দাজদিয়া তার সাহায্যে রাতে আসওয়াদকে হত্যা করে ফেলল এবং ভোর হলে আসওয়াদের ঘরের ছাদে উঠে আযান দিয়ে দিল। আযানের শব্দ শুনেই শোরগোল শুরু হল এবং আসওয়াদের লোকজন শহর ছেড়ে পালাতে লাগলো। তারা সানআ ও আদন-এর মধ্যবর্তী এলাকায় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আসওয়াদের হত্যার মাধ্যমে য়ামানে স্থিরতা ও শৃংখলা বজায় হল। ইসলামী আমেলগণ নিজ নিজ কেন্দ্রে ফিরে গেলেন।

এই বিজয়ের খবর যেদিন মদীনায় পৌঁছে, তার পূর্বের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) ইন্তেকাল করেন। এ হিসেবে এ ছিল প্রথম সুসংবাদ যা হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মদীনায় এসেছিল। আসওয়াদের ফেতনা সর্বমোট চার মাস স্থায়ী ছিল।

রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ইন্তেকালের খবর য়ামানে পৌঁছুলে কায়স ইবনে আবদে য়াগূছ মুরতাদ হয়ে যায় এবং আসওয়াদের ছত্রভঙ্গ সাথীদেরকে তার পতাকাতলে সমবেত হতে আহ্বান জানায়। এরা তার সাথে মিলিত হলো। কায়স তাদের সাহায্যে সানআ আয়ত্ত করে নিল এবং আবনার সন্তান সন্ততিকে ধরে নিয়ে তাদেরকে দ্বীপসমূহে বন্দী করে রাখল। আবনার নেতা ফীরোজ এ খবর জানতে পেরে বনূ উকায়ল ও রাআক এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। এ গোত্রসমূহ তাকে সাহায্য করলো এবং আবনার সন্তানসন্ততিকে কায়সের লোকদের কবল থেকে মুক্ত করল। তারপর তারা ফীরোজের সাথে মিলিত হয়ে কায়সের মোকাবেলার জন্য রওয়ানা হলো। ইতিমধ্যে মুহাজির ইবনে আবী উমায়্যা যাঁকে হযরত আবূ বকর (রাঃ) আসওয়াদের লোকদের মোকাবেলায় পাঠিয়েছিলেন এবং ইকরিমা (রাঃ) ইবনে আবী জাহল, যিনি আম্মান ও মুহরার অভিযান থেকে অবসর হয়েছিলেন, তাঁরা নিজ নিজ বাহিনী সহ আবনার সাহায্যের জন্য এসে পৌঁছালেন।

www.e-ilm.weebly.com

ইসলামী বাহিনী সানআ আয়ত্ত করলো এবং কায়স ও আমর ইবনে মা'দীকারাব যুবায়রী (যে মুরতাদ হয়ে আসওয়াদের সাথী হয়েছিল) কে গ্রেফতার করে মদীনায় পাঠিয়ে দিল। মদীনায় পৌছে তারা নিজেদের কৃত কর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করল এবং পুনরায় মুসলমান হয়ে গেল। হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন এবং তাদেরকে মুক্তি দিলেন।

বাহরাইনের ফেতনা

বাহরাইনে রাবীআ গোত্রের অনেক শাখা গোত্র যেমন আবদুল কায়স, বনূ বকর ইত্যাদি বাস করত। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট বাহরাইনবাসীদেরও একটি প্রতিনিধিদল উপস্থিত হয়েছিল এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মহানবী (সঃ) মুনযির ইবনে সাওয়াকে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ইন্তেকাল করেন ঠিক সেই সময়ে মুনযির ইবনে সাওয়াও ইন্তেকাল করেন। আর বাহরাইন বাসী মুরতাদ হয়ে গেল। বনূ বকর তো মুরতাদ হয়েই থাকল। কিন্তু আবদুল কায়স তাদের নেতা জারূদ ইবনে মু'লার বদৌলতে এই ফিতনা থেকে নিষ্কৃতি পেল।

ঘটনা হল, হযরত জারূদ নিজ কওমকে একত্রিত করে বললেন, হে আবদুল কায়স, তোমরা মুসলমান হবার পর কাফের হয়ে গেলে কেন?

আবদুল কায়স- মুহাম্মদ (সঃ) যদি নবী হতেন, তাহলে মারা গেলেন কেন? এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি নবী ছিলেন না।

জারূদ- আচ্ছা, বল তো হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর পূর্বে কি কোন নবী ছিলেন?

আবদুল কায়স- কেন হবে না? অনেক।

জারূদ- তাহলে তাঁরা কোথায় গেলেন?

আবদুল কায়স- কোথায় যাবেন? মারা গেছেন।

জারূদ- তাহলে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)ও তেমনি ইন্তেকাল করেছেন, আল্লাহর অন্য নবীগণের যেমন হয়েছে। ভাইয়েরা আমার, আমি সর্বান্তঃকরণে স্বীকারোক্তি করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রসূল।

আবদুল কায়স- তাহলে আমরাও সবাই স্বীকার করে নিচ্ছি।

আবদুল কায়স গোত্রের এভাবে পুনরায় মুসলমান হবার সংবাদ বনূ বকরের সর্দার হাতাম ইবনে যাবীআর নিকট পৌছুলে সে নিজ সাথীদের নিয়ে তাদের মোকাবেলার জন্য বের হয়ে পড়ল এবং তাদেরকে অবরোধ করে বসল। হাতাম ইবনে যাবীআর সাথে আরো অনেক কাফের ও মুরতাদ সঙ্গী হয়েছিল।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) হাতামের মোকাবেলার জন্য হযরত আলা ইবনুল হাযরামী (রাঃ)-কে পাঠিয়ে দিলেন। রাস্তায় ছুমামা ইবনে আছাল ও কায়স ইবনে আসেম বনূ হানিফা ও বনূ তামীমের লোকজন নিয়ে তার সাথে শামিল হলেন।

www.e-ilm.weebly.com

হযরত আলা (রাঃ)-এর কারামতি

হযরত আলা ইবনে হাযরামী এক শুষ্ক মরুভূমি অতিক্রম করার সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। মরুভূমির মাঝখানে গিয়ে তিনি সৈন্যদেরকে বিশ্রামের জন্য যাত্রা বিরতি করতে বললেন। সৈন্যরা উটগুলো খুলে দিলেন এবং নিজেরাও ঘুমিয়ে পড়লেন। জেগে দেখেন যে, সব উট পালিয়ে গেছে। সবাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন, এখন এ রোদের তাপ আমাদের ধ্বংস না করে ছাড়বে না।

হযরত আলা (রাঃ) তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, ভাইয়েরা আমার, তোমরা সবাই মুসলমান, আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য বের হয়েছ। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তোমাদেরকে অপদস্থ করবেন না। ফজরের নামাজের পর হযরত আলা (রাঃ) আল্লাহর দরবারে এ মুসিবত থেকে পরিত্রাণের জন্য দুআ করলেন। আল্লাহ তাঁর দুআ কবুল করলেন। যে মরুভূমিতে বহু দূর পর্যন্ত পানির কোন ধারণা করারও সুযোগ ছিল না, হঠাৎ একদিকে চিকচিকে মনে হলো, দেখা গেল সত্যিই পানি। মুসলমানরা খুব পরিতৃপ্ত হয়ে পানি পান করলেন, গোসল করলেন। এ দিকে দুপুর না হতেই তাঁদের উটগুলো এদিক সেদিক থেকে এসে একত্রিত হলো। মুসলমানরা সেগুলোকেও পানি পান করিয়ে নিলেন। (বিদায়া নিহায়া ৬খ, ৩২৮)

মোটকথা হযরত আলা (রাঃ) সৈন্য নিয়ে হযরত জারূদের সাহায্যের জন্য পৌঁছলেন। হাতামও তার সাথীদের নিয়ে মোকাবেলার জন্য এল। উভয় সৈন্যদলে লড়াই বেঁধে গেল। মুরতাদরা ও মুসলমানরা নিজ নিজ ক্যাম্পের সামনে পরিখা খুঁড়ে রেখেছিল। দুপক্ষ থেকে প্রতিদিন সকালে কিছু সৈন্য মোকাবেলার জন্য বের হতো এবং সন্ধ্যায় নিজ নিজ ছাউনিতে ফিরে আসত। এক রাতে মুসলমানরা শত্রু সৈন্যদের মধ্যে হৈচৈ শব্দ শুনতে পেলেন। অনুসন্ধান নিয়ে জানা গেল যে, তারা শরাবের নেশায় মত্ত হয়ে ধুমধাম করছে। মুসলমানরা তৎক্ষণাৎ হামলা করলেন। যারা নিহত হবার ছিল তাদের হত্যা করা হলো আর অবশিষ্টদের গ্রেফতার করে আনা হলো। স্বয়ং সেনাপ্রধান হাতামও নিহত হলো।

হাতামের কিছু সাথী দারাইন দ্বীপে (পারস্য উপসাগরে বাহরাইনের নিকটবর্তী একটি দ্বীপ) গিয়ে পালালো। মুসলমানরা সাগর ঝাঁপিয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছালেন এবং তাদেরকে হত্যা করলেন।

এছাড়া আম্মানের কতিপয় গোত্র এবং কিন্দা গোত্রের লোকেরাও মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর প্রেরিত সিপাহসালারদের তাদের সাথেও লড়াই হয় এবং সর্বত্র মুসলমানরাই বিজয়ী হন। (বিদায়া নিহায়া ৬খ, ৩২৮)

www.e-ilm.weebly.com

ইসলামের মহান অনুগ্রহকারী

এ হচ্ছে ধর্মান্তর ফিতনা ও তা প্রতিরোধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এ সকল ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ইন্তেকালের সাথে সাথে আরবে মুরতাদ হওয়ার যে ধুলিঝড় প্রবাহিত হয়েছিল তা এতই ভয়ানক ছিল যে, ইসলাম রবির কিরণ অন্তর্হিত হতে কোন কিছু অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সুদৃঢ় মনোবল ও স্বচ্ছ চিন্তার দ্বারা ইসলামের আকাশ পুনরায় ধুলিমুক্ত হয়ে গেল। বাস্তবিকই রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পরে ইসলামের হেফাজত ও প্রসারে হযরত আবু বকর (রাঃ) এরই দান মুসলমানদের উপর সবচেয়ে বেশী।

এসব ঘটনা থেকে আমরা এ শিক্ষাও পাই যে, বিরুদ্ধবাদীর প্রাবল্য ও দুশমনদের আধিক্যে ঘাবড়ে যাওয়া মুসলমানদের জন্য উচিত নয়। মুসলমান সংখ্যাস্বল্পতার কারণে পরাজিত হতে পারে না। ঈমানের দুর্বলতার কারণে পরাজিত হতে পারে।

সিদ্দীকী খেলাফতের এ সূচনাকালে মুসলমানরা চতুর্দিক থেকে শত্রুবেষ্টিত ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর ভাষায় তাদের অবস্থা ছিল ঐ ছাগলপালের মত যা শীতকালের রাতে বৃষ্টির মধ্যে বিজন মরুভূমিতে রাখাল ছাড়া থাকে। কিন্তু সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর ঈমানী শক্তি দুশমনদের শক্তির পরওয়া করেনি এবং তাদের সাথে সীসাঢালা প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ফল দাঁড়াল এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর ওয়াদা পূরণ করলেন–

إن تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم.

"তোমরা যদি আল্লাহর (দ্বীন) কে সাহায্য কর, তাহলে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের (টলটলায়মান) পদসমূহ স্থির করে দিবেন।" (মুহাম্মাদ-৭)

কাফের ও মুরতাদদের মস্তক ইসলামের সামনে নত হল এবং ইসলামের পতাকা পূর্ণ সৌন্দর্যে উড়তে লাগলো।

বিজয়ের সূচনা

ইসলামী বিজয়সমূহের আলোচনার পূর্বে মনে হয় আরবের দুই প্রতিবেশী সাম্রাজ্য পারস্য ও রোমের কিছু বিবরণ লেখা সমীচীন হবে। কেননা এই দুই বিশাল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর ইসলামী হুকুমতের সুউচ্চ প্রাসাদের ভিত্তি উঠেছিল।

পারস্য

পারস্য বা ইরানের সাম্রাজ্য অতি প্রাচীন। সবচেয়ে প্রাচীন সভ্য সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে ইরানকে গণ্য করা হয়ে থাকে। কোন ভিনদেশী পারস্যে রাজত্ব করতে সুযোগ পায়নি।সেকান্দর রুমী দারাকে পরাজিত করে কিছুদিনের জন্য ইরান দখল করে নিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু এ দখলদারিত্ব ছিল অতি অল্পকালের।

www.e-ilm.weebly.com

আফগানিস্তান এবং আরবের ইরাকও পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এখানকার শাসকের মর্যাদা ছিল শাহেনশাহ স্বরূপ এবং প্রাদেশিক প্রশাসকবৃন্দ যারা অভ্যন্তরীন বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করত তাদেরকে 'বাদশাহ' বলা হত। শাহেনশাহকে কিসরা বলা হত।

পারস্যে শেষ যুগে সাসানী বংশ শাসন করত। এই বংশের গোড়াপত্তন করে উরদশীর বাবকাঁ ২৩০ খৃষ্টাব্দে। সাসানী বংশের রাজধানী ছিল মাদায়েন শহরে। এই বিখ্যাত শহরটি দাজলা নদীর পূর্ব ও পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। এখানেই সেই 'কিসরা প্রাসাদ' অবস্থিত ছিল যা নির্মাণ সৌন্দর্যের দিক দিয়ে পৃথিবীর আশ্চর্য বস্তুসমূহের মধ্যে গণ্য হত।

রসূলুল্লাহ (সঃ) এর শুভজন্মের সময়ে সাসানী বংশের বিখ্যাত ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ কিসরা নওশিরওয়াঁ পারস্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিসরা নওশিরওয়াঁর পর তার পুত্র হুরমুজ সিংহাসনে বসে। হুরমুজের পর কিসরা পারভেজ। কিসরা পারভেজকে তার পুত্র শিরওয়হ হত্যা করে নিজেই বাদশাহ হয়। শিরওয়হ এক বছর নয় মাস রাজত্ব করে এবং এ স্বল্পকালের মধ্যে নিজের বংশকে নানারকম নির্যাতন করে অবশেষে মারা যায়। তারপর তার ছেলে উরদশিরকে সিংহাসনে বসানো হলো এবং কমবয়সী হবার কারণে একজন আমীরকে তার সহকারী বাদশাহ করা হলো। কিন্তু এ ব্যবস্থা অপর এক আমীর শাহরিজার-এর মনঃপুত হলো না। শাহরিজার মাদায়েনে হামলা চালিয়ে বাদশাহকে হত্যা করলো এবং নিজে বাদশাহ হলো। শাহরিজার যেহেতু শাহী বংশের ছিল না, তাই তার এ ক্ষমতাদখল অন্য আমীরদের নিকট ভাল লাগলো না। চল্লিশ দিন শাসনের পর সেও নিহত হলো। এখন কিসরা পারভেজের কন্যা পূরান দুখত-এর মাথায় মুকুট দেয়া হলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর জীবনকালের শেষভাগে এ-ই ছিল পারস্যের শাসনকর্ত্রী। এক বছর চারমাস শাসন করার পর সে-ও মারা যায়। পুরানদুখত-এর পর কিসরা পারভেজ এর চাচাতো ভাই জওয়ানশিরকে সিংহাসনে বসানো হয়। কিন্তু তারও একমাসের বেশী রাজত্ব করা ভাগ্যে জুটলো না।

অতঃপর কিসরা পারভেজের অপর কন্যা আজরমী দুখতকে সিংহাসনে বসানো হলো। কিন্তু তাকে সিতাম নামে একজন ইরানী সিপাহসালার নিজ পিতাকে হত্যার বদলায় হত্যা করলো এবং তার স্থানে উরদশির বাবকাঁর বংশের জনৈক কিসরা ইবনে মিহিরকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হলো। কিন্তু সেও বেশী দিন রাজত্ব করতে পারল না এবং অবশেষে য়াজদগারদ ইবনে শাহরিয়ারকে পারস্য সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা নির্বাচন করা হয়। সে-ই ছিল এই শৃংখলের সর্বশেষ কড়ি। ফারূকে আজমের যুগে পারস্যের বিশাল সাম্রাজ্য তার হাত থেকে বের হয়ে ইসলামী সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে যায়।

www.e-ilm.weebly.com

রোম

গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যের পরে ইউরোপে দ্বিতীয় যে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা ছিল রোম সাম্রাজ্য। এ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল ইটালীর বর্তমান রাজধানী রোম নগর। রোম সাম্রাজ্যের উন্নতির এমন এক যুগ ছিল যখন ভারত, চীন, ইরান ও তুর্কিস্তান ব্যতীত সমগ্র দুনিয়া তার অধীনে ছিল এ সাম্রাজ্য গ্রেট রোমান এম্পায়ার (Great Roman Empire) নামে অভিহিত হত এবং সর্বত্র এর সভ্যতা, সংস্কৃতি ও আইনকে মূল বলে মেনে নেয়া হত।

কিন্তু কিছুকাল পরে ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের ফলে রোম সাম্রাজ্য দু টুকরো হয়ে যায়। পূর্ব রোম ও পশ্চিম রোম। পশ্চিম রোমের রাজধানী রোম নগরই থেকে যায় এবং পূর্ব রোমের রাজধানী হয় কুসতুনতুনিয়া নগর (কনস্টান্টিনোপল)

পশ্চিম রোমের উপর ইউরোপ ও রুশের বর্বর সম্প্রদায়গুলো বার বার আক্রমণ চালায় এবং অবশেষে এটি কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু পূর্ব রোম সাম্রাজ্য এ সকল হামলা থেকে মুক্ত থাকে এবং দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে।

পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের অধিকৃত রাজ্যগুলোর মধ্যে ইউরোপের দেশসমূহ ব্যতীত এশিয়া মাইনর, শাম ও মিসরও শামিল ছিল। শাম ও মিসরে কতিপয় দেশীয় রাজ্যও ছিল। কিন্তু এসকল রাজ্য রোম সাম্রাজ্যের করদাতা ছিল এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়াদিতে কুসতুনতুনিয়ার কায়সরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করত।

পূর্ব রোম সাম্রাজ্যকে ইউরোপে খুব সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হত। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর কুসতুনতুনিয়া শাসকগণই ইউরোপ ও এশিয়ায় এর প্রসারের সেবা পালন করেছিলেন। তাছাড়া খৃষ্টধর্মের কেন্দ্র বায়তুল মুকাদ্দাসও তাদেরই অধীনে ছিল। এ সকল কারণে ইউরোপ ও এশিয়ার খৃষ্টীয় দুনিয়া কনষ্টান্টিনোপলের কায়সারকে খৃষ্টধর্মের রক্ষক মানতো এবং তার একটিমাত্র ইশারায় হাজার হাজার তলোয়ার খাপমুক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়তো।

ইসলামের প্রথম দিকে রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন হিরাক্লিয়াস। তিনি প্রথমদিকে আফ্রিকার গভর্ণর ছিলেন। ৬১০ খৃষ্টাব্দে তিনি কায়সার খোকাকে হত্যা করে নিজে সাম্রাজ্য সিংহাসন দখল করে নেন। হিরাক্লিয়াসের শাসন ৬১০ খৃঃ থেকে ৬৪১ খৃঃ পর্যন্ত ছিল। তাঁরই শাসনকালে শামের সবুজ শ্যামল দেশ রোম সাম্রাজ্যের কবল থেকে বের হয়ে ইসলামী পতাকার নীচে চলে আসে।

সাম্রাজ্য বিস্তারের বাসনা ও স্বাধীন জাতিগুলোকে গোলামে পরিণত করার উত্তেজনা কিসরা ও কায়সারকে শান্তিতে বসে থাকতে দিত না। দীর্ঘকাল ধরে ইরান ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। ইরাক ও শাম এলাকা ছিল তাদের যুদ্ধক্ষেত্র। এ সকল যুদ্ধে কখনো ইরানীরা জয়লাভ করত। তখন

www.e-ilm.weebly.com

তারা রোম সাগরের তীর পর্যন্ত পৌছে যেত। আবার কখনো রোমানদের জয় হত। তখন তারা দাজলা ও ফোরাতের তীর পর্যন্ত পৌছে যেত।

ইসলামী যুগের কিছুকাল পূর্বে কিসরা নওশিরওয়াঁ ও কায়সার খোকার সৈন্যদের মধ্যে এক দীর্ঘ লড়াই চলছিল। এ লড়াইয়ে ইরানীদের একের পর এক জয় হতে লাগল। তারা রোমানদেরকে উপদ্বীপ থেকে বের করে দিল এবং ফিনিসিয়া ও ফিলিস্তিন পদানত করে বসফোরাস তীর পর্যন্ত পৌছে গেল। এরপর ইরানীরা হিরাক্লিয়াসেরই যুগে আবার রোমানদের উপর হামলা করে এবং বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করে ক্রুশকাঠ ছিনিয়ে আনে। এ ছাড়া অনেক খৃষ্টীয় পবিত্র নিদর্শনাবলী নষ্ট করে ফেলে। অতঃপর ৬১৬ খৃঃ মিসরে আক্রমণ চালায় এবং আলেকজান্দ্রিয়া জয় করে নেয়।

আরবের মুশরিকরা ছিল ইরানীদের মত কিতাবহীন। তারা তাদের জয়ে আনন্দিত হত আর মুসলমানরা আহলে কিতাবের পরাজয়ে চিন্তিত হত। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী নাযিল হল যে, মুসলমানদের চিন্তিত হবার কারণ নেই

غلبت الروم فى ادنى الأرض و هم بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين لله الأمر من قبل و من بعد،

"আলিফ লাম মীম। নিকটবর্তী জমিনে (তখন) রোমানরা পরাজিত হয়েছে। কিন্তু তারা তাদের এ পরাজয়ের পর শীঘ্র কয়েক বছরের মধ্যে বিজয়ী হবে। আল্লাহরই কর্তৃত্ব পূর্বে এবং পরেও।" (রূম ১-৪)

অতঃপর যারা ইরানীদের বিজয়কে নিজেদের বিজয়ের দলিল রূপে পেশ করছিল সেই মুশরিকদের প্রতিউত্তরে বলা হয়েছে–

ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء و هو العزيز الرحيم،

"আর সেদিন মুমিনরা আল্লাহর সাহায্যের প্রতি আনন্দিত হবে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। আর তিনি সম্মান ও রহমতের মালিক।" (রূম ৫)

ঐশী বাণীর এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল। দশ বছর পরে ৬২২ খৃষ্টাব্দে হিরাক্লিয়াস ইরানীদের উপর প্রচণ্ড হামলা করে এবং মার্চ ৬২৪ খৃষ্টাব্দে ঠিক যে সময় মুসলমানরা বদর প্রান্তরে আরবের মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ের আনন্দ উৎসব করছিলেন, রোমানরা ও ইরানীদের বিরুদ্ধে জয়ের আনন্দ উল্লাস করছিল।

রোমানদের এ বিজয়ের পর ৬২৫ খৃষ্টাব্দে শিরওয়হ কায়সার হিরাক্লিয়াসের সাথে সন্ধি স্থাপন করে। তারা সকল রোমান বন্দীদের ছেড়ে দেয় এবং ক্রুশকাঠ ফিরিয়ে দেয়। কায়সার হিরাক্লিয়াস এই বিরাট বিজয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয় এবং শোকরানা সিজদা আদায় করার জন্য ৬২৫ খৃষ্টাব্দে বায়তুল মুকাদ্দাস উপস্থিত হয়। এখানেই তার নিকট রসূলুল্লাহ (সঃ) এর দাওয়াতী পত্রটি পৌছে যার ঘটনা ১ম খণ্ডে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

www.e-ilm.weebly.com

পারস্য, রোম ও মুসলমান

ইরানী হোক রোমান হোক, উভয়ে কামনা করত আরবদের মত বীরজাতি শতধা গ্রুপে বিভক্ত থাকুক এবং নিজেরা পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ করে নিজেদের শক্তি খর্ব করতে থাকুক। কারণ এতেই তাদের লাভ ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন সাফা পাহাড়ের চূড়া থেকে হকের আওয়াজ তুললেন এবং বিশ্বকে এক ঐশী পরিবার হতে এবং এ পরিবারের সদস্যদের পরস্পরে মৈত্রী ও সাম্যের আচরণ করার দাওয়াত দিলেন, তখন তারা এ আন্দোলনটিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। তারা চিন্তা করল, যদি এ আন্দোলন সফল হয়, তাহলে আরব আমাদের শক্তির মহড়াকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে যাবে। অন্য শাসিত জাতিগুলো এবং স্বয়ং আমাদের দেশের জনগণও আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে যাদের নিশ্চিহ্ন হাড্ডির উপর আমরা নিজেদের শাহেনশাহীর ভিত্তি স্থাপন করে রেখেছি।

৬ষ্ঠ হিজরীতে যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) কিসরা পারভেজের নামে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র পাঠালেন, তখন সে এটিকে টুকরো করে ফেলল এবং য়ামানে তার গভর্ণর বাযানকে নির্দেশ দিল যে, আরবে যে লোকটি নবী হওয়ার দাবী করেছে, তাকে গ্রেফতার করে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। বাযান তার শাহেনশাহ-এর আদেশ পালনার্থে মদীনাতে দুজন লোক পাঠালো। রসূলুল্লাহ (সঃ) লোক দুটিকে বললেন, যাও, তোমাদের যে শাহেনশাহ আমাকে গ্রেফতার করতে নির্দেশ দিয়েছে, সে নিহত হয়েছে। মনে রেখো, আমার দ্বীনের বিজয় সেস্থান পর্যন্ত পৌছবে যেখান পর্যন্ত তোমাদের শাহেনশাহের সাম্রাজ্য রয়েছে। বরং যেখান পর্যন্ত একটি উট বা ঘোড়া পৌছতে পারে।

বাযানের লোকেরা এ জবাব শুনে ফিরে গেল। এখানে এসে জানা গেল যে, রসুলুল্লাহ (সঃ) যা বলেছেন সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। খসরু পারভেজকে তার পুত্র শিরওয়হ হত্যা করে এবং বাযানকে বার্তা পাঠায় যে, আমার পিতা হেজাযের যে লোকটিকে তলব করেছিলেন, তাকে উত্যক্ত করতে হবে না। এরপর ইরানে অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব খুব জোরদার হলো এবং আরবের প্রতি মন দেবার কারো সুযোগই থাকলো না।

একইরূপে সে বছরই রসূলুল্লাহ (সঃ) রোমের কায়সারকে বায়তুল মুকাদ্দাসে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র পাঠালেন। সাম্রাজ্যের আমীররা ও সেনা প্রধানরা তীব্র বিরোধিতার সাথে এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে দিল এবং ইসলামের দূতেরা ফিরবার সময়ে শামের খৃষ্টানরা তাদের মালপত্র লুট করে নিল।

শুরাহবীল ইবনে আমর গাসানী রোমানদের পক্ষ থেকে বুসরার গভর্ণর ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তার নিকট দাওয়াতী পত্র পাঠালেন। এ জালিম শুধু ইসলামের দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকারই করল না, বরং রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পত্রবাহক হারিছ ইবনে উমায়র (রাঃ) কে হত্যাও করে ফেলল। ৮ম হিজরীতে মূতার যুদ্ধ ছিল সে জুলুমের প্রতিশোধ। এতে দু'লাখ শামী ও রোমান খৃষ্টানের

সাথে তিন হাজার মুসলমানের মোকাবেলা হয় এবং প্রচুর সংখ্যক প্রবীণ সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের মর্যাদা রক্ষার্থে জীবন উৎসর্গ করেন।

৯ম হিজরীতে বুসরা শাসনকর্তা কায়সারের সহযোগিতায় মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ত্রিশ হাজার জীবন উৎসর্গকারীসহ খৃষ্টানদের আক্রমণ প্রতিহত করতে নিজেই তাবুক নামক স্থান পর্যন্ত পৌছালেন, তখন তাদের সাহসে ভাটা পড়ে গেল এবং তারা সে সময় মোকাবেলা মুলতবী করে দিল।

এসব ঘটনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুসলমানরা নিজেদের এ দুটি বিশাল প্রতিবেশী সাম্রাজ্য থেকে এক মুহূর্তও নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনি তারা যখনই নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও অভ্যন্তরীন বিবাদ থেকে অবসর পেত তখনই মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসত। এ কারণেই পূর্বেই আত্মরক্ষা হিসেবে ইন্তেকালের কিছুকাল পূর্বে রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রাঃ)-কে শামের উপর আক্রমণ করতে নিযুক্ত করেছিলেন। এরই সম্পাদন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) অন্য সকল কিছুর চেয়ে অগ্রগণ্য করেছিলেন এবং এ কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) মুরতাদ ও মিথ্যা নবীদের মুলোৎপাটন থেকে অবসর হয়েই ইসলামী বাহিনীর গতি ইরাক ও শামের যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন।

ইরাক অভিযানের ঘটনাবলী

হযরত আবূ বকর (রাঃ) ১লা মুহাররম হিজরী ১২ সনে খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ)-কে ইসলামী বিজয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার জন্য এদিকে রওয়ানা করে দিলেন এবং কা'কা' ইবনে আমরকে তাঁর সাহায্যের জন্য পাঠালেন। তিনি তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে, তিনি যেন তাঁর অভিযান রমলা (পারস্য উপসাগরে ইরান সাম্রাজ্যের সীমান্ত এলাকা) থেকে শুরু করেন। অন্যদিকে ইয়াজ ইবনে গানামকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন উত্তর ইরাকের দিকে থেকে আক্রমণ করেন এবং তাঁর সাহায্যের জন্য আবদ ইবনে য়াগূছ হিময়ারীকে নিযুক্ত করলেন। তাঁকেতিনি পরামর্শ দিলেন যে, তিনি যেন তাঁর অভিযান উত্তর ইরাকের মাজীহ গ্রাম এলাকা থেকে শুরু করেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) উভয় সিপাহসালারকে এ মর্মেও নির্দেশ দিলেন যে, তাঁরা যেন এ সকল অভিযানে কোন মুরতাদকে সাথে না নেন। তাদের প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল না এবং তাদের অন্যায় আচরণের জন্য তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতে চাইতেন। খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী ইরাক সীমান্তের শাসনকর্তা হুরমুজকে পত্র দিলেন। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল 'ইসলাম কবুল করুন, নিরাপদ থাকবেন। যদি এতে অমত হয়, তাহলে যিম্মী হোন এবং কর দিতে স্বীকার করুন। নতইবনে আপনাকে নিজেরই নিন্দা করতে হবে। কেননা আমি আপনাদের মোকাবেলায় এমন একদল লোক নিয়ে আসছি যারা মৃত্যুকে এমনই প্রিয়জ্ঞান করে যেমন আপনারা জীবনকে।'

কাজিমা যুদ্ধ

হুরমুজ পত্রখানা ইরানের শাহেনশাহের নিকট পাঠিয়ে দিল এবং নিজে সৈন্য নিয়ে কাজিমার দিকে অগ্রসর হলো। এখানে এসে তারা পানির ঝর্ণা দখল করে নিল। খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) মুসলমানদের বললেন- ভাইয়েরা আমার ঘাবড়াবেন না, দু দলের মধ্যে যারা বীর তারাই পানি দখল করবে। উভয় বাহিনী মোকাবেলার জন্য এলে হযরত খালেদ (রাঃ) এগিয়ে গেলেন এবং হুরমুজকে লড়াইয়ে আহ্বান জানালেন। হুরমুজ ঘোড়া থেকে নেমে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলো। হযরত খালেদ (রাঃ) তাকে হত্যা করে ফেললেন এবং ইরানী সৈন্যরা পালাতে শুরু করল। হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) হযরত মুছান্না ইবনে হারিছা (রাঃ)-কে ইরানী বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনে পাঠিয়ে দিলেন এবং খলীফার দরবারে বিজয়ের সুসংবাদ পাঠালেন। ইরানের শাহেনশাহ উরদশির-এর নিকট এ পরাজয়ের সংবাদ পৌছলে মুসলমানদের মোকাবেলার জন্য তিনি আরেকটি বাহিনী পাঠালেন। এ বাহিনীর প্রধান ছিল কারেন। কারেন হুরমুজের অবশিষ্ট লোকদেরও সাথে নিয়ে বর্তমান বসরার নিকটবর্তী ছানী নামক স্থানে ছাউনি ফেলল।

ছানী যুদ্ধ

হযরত খালেদ (রাঃ) মোকাবেলার জন্য নিজ বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন। উভয় পক্ষে কাতারবন্দী করা হলো। কারেনের নিজ বীরত্বের গর্ব ছিল। সে হুরমুজের প্রতিশোধ নেবার জন্য মুসলমানদের মধ্য থেকে কোন বীরকে লড়াইয়ের আহ্বান জানালো। ইসলামী বাহিনী থেকে এক যুবক বের হলো এবং তাকে হত্যা করে ফেলল। কারেন নিহত হতেই মুসলমানরা ইরানীদের উপর ব্যাপক হামলা শুরু করে দিল। অসংখ্য ইরানী নিহত হলো। অনেকেই পালাতে গিয়ে নদীতে ডুবে গেল এবং কেউ কেউ নৌকায় উঠে পার হয়ে গেল।

ইরানের শাহেনশাহের নিকট এ পরাজয়ের খবর পৌছালে তিনি একজন ইরানী বীর আন্দরজগরের অধীনে এক বিশাল বাহিনী পাঠালেন এবং তারপর তার পিছনে অপর এক বীর বাহমন জাদওয়্হর নেতৃত্বে আরেকটি বাহিনী পাঠালেন। এ দুই ইরানী বীর দুলজা নামক স্থানে ছাউনি ফেলল।

দুলজা যুদ্ধ

হযরত খালেদ (রাঃ) যখন এসব সৈন্যর পৌছুনোর খবর পেলেন, তখন তিনিও অগ্রসর হলেন এবং মোকাবেলায় এলেন। উভয় পক্ষে তুমুল লড়াই হল এবং অবশেষে ইরানীদের শোচনীয় পরাজয় ঘটল। আন্দর্জগর নিহত হলো। কিন্তু বাহমন জাদওয়্হ জীবন রক্ষা করে পালিয়ে গেল। এ লড়াইয়ে বকর গোত্রের খৃষ্টান আরবরাও ইরানীদের সাহায্য করেছিল এবং তারাও বিপুল সংখ্যায় নিহত হয়েছিল।

www.e-ilm.weebly.com

বকর গোত্রের খৃষ্টান আরবদের মধ্যে নিজেদের লোক নিহত হওয়ায় খুব উত্তেজনা সৃষ্টি হল। তারা ইরানের শাহেনশাহকে বার্তা পাঠাল যে, আমরা মুসলমানদের সাথে লড়াই করব, আমাদের সাহায্য করা হোক। ইরানের শাহেনশাহ বাহমন জাদওয়ূহকে নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন বকর গোত্রের লোকদের সাথে নিয়ে পুনরায় মুসলমানদের সাথে লড়াই করে। কিন্তু বাহমনের সাহস হলো না। তাই সে নিজের স্থানে অপর এক সর্দার জাপানকে পাঠিয়ে দিল এবং নিজে রাজধানী মাদায়েনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। উদ্দেশ্য শাহেনশাহকে মুসলমানদের বিপদের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য পরামর্শ গ্রহণ। কিন্তু শাহেনশাহ অসুস্থ থাকায় তাকে সেখানেই অবস্থান করতে হলো।

উল্লায়স যুদ্ধ

জাপান নিজ বাহিনী ও বকর গোত্রের লোকদের নিয়ে আনবার-এর সন্নিকটে পৌছাল এবং উল্লায়স নামক স্থানে ছাউনি ফেলল। হযরত খালেদ (রাঃ)ও নিজ বাহিনী নিয়ে মোকাবেলায় এলেন। তিনি নিজের অভ্যাসমত বিপক্ষের সর্দারদের কাউকে লড়াইয়ের জন্য আহ্বান জানালেন। বনূ বকরের জনৈক সর্দার মোকাবেলায় এলো এবং নিহত হলো। এরপর মুসলমানরা ইরানীদের উপর ব্যাপক আক্রমণ শুরু করে দিল। তুমুল লড়াই হলো। এ যুদ্ধে ইরানীরা খুবই দৃঢ়তার সাথে লড়াই করলো। কেননা তাদের বাহমন জাদওয়ূহর সাহায্যের আশা ছিল। কিন্তু সূর্য ঢলে না যেতেই ইরানী ও বকরী সৈন্যরা উদ্যম হারিয়ে ফেলল এবং পালাতে শুরু করলো। পালাতে গিয়ে তারা হাজার হাজার নিহত হলো। এ ঘটনা সফর ১২ হিজরীর।

হীরা বিজয়

উল্লায়স যুদ্ধ থেকে অবসর হয়ে হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) হীরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। হীরা ছিল ইরাকের আরব রাজাদের (যারা ইরান সাম্রাজ্যের করদাতা ছিল) রাজধানী। হযরত খালেদ (রাঃ) হীরা পৌছাবার জন্য নদীপথ অবলম্বন করেন। তিনি শহরের নিকটবর্তী পৌছালে সেখানকার রাজা পালিয়ে গেল। হযরত খালেদ (রাঃ) শহরের প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ অবরোধ করলেন এবং হীরার নেতাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। শহরের বাসিন্দারা যখন দেখল যে, মুসলমানদের মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই, তখন তারা নিজেদের নেতাদেরকে সন্ধি করতে চাপ দিল। তাদের পক্ষ থেকে সন্ধির বিষয়ে আলাপ আলোচনা করলো এবং বার্ষিক ১ লাখ ৯০ হাজার দেরহাম জিযিয়া দিতে স্বীকার করলো। হীরার নেতারা পুরনো রীতি অনুযায়ী ইসলামী সিপাহসালারের নিকট মুল্যবান উপহারও পেশ করলো। কিন্তু হযরত খালেদ (রাঃ) এসব কিছু বিজয়ের সুসংবাদসহ

www.e-ilm.weebly.com

খলীফার খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) সেগুলোকে জিযিয়ার মধ্যেই গণ্য করলেন, উপহার হিসেবে কবুল করলেন না।

হীরা বিজয়ের পর

এ সকল যুদ্ধে হযরত খালেদ (রাঃ)-এর এই নিয়ম ছিল যে, তিনি ইসলামী যুদ্ধ নীতি অনুযায়ী প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। অতঃপর জিযিয়া দানে স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করতেন। যদি তারা দুটিই অস্বীকার করত তাহলে তিনি লড়াইয়ের আদেশ করতেন। এ যুদ্ধও শুধুমাত্র সৈন্যদের সাথে হত। সাধারণ অধিবাসীদের কোনরূপ বিরক্ত করা হত না। যারা জিযিয়া দিতে স্বীকার করত মুসলমানরা তাদের হেফাযতের জিম্মাদার হয়ে যেতেন এবং ওয়াদা করতেন যে, যদি তাদের হেফাজত করতে না পারেন তাহলে জিযিয়ার অর্থ ফেরত দেবেন। জিযিয়ার নির্ধারিত অর্থ ব্যতীত জিম্মীদের নিকট থেকে কারো একটি পয়সাও আদায় করার অনুমতি ছিল না। অথচ ইরানী শাসকরা তাদের শাসন কালে উপহার উপঢৌকনের নামে বিরাট বিরাট অংক আদায় করত।

গনীমতের মাল হিসাবে মুসলমানদের হাতে যা আসত, ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী তা পাঁচ ভাগ করে চার ভাগ মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হত এবং পঞ্চমভাগ খলীফার দরবারে পাঠিয়ে দেয়া হত।

হীরা বিজয়ের পর হযরত খালেদ (রাঃ) বিজিত এলাকাসমূহে শান্তি শৃংখলা স্থাপনের ব্যবস্থা করলেন। সীমান্তসমূহে তত্বাবধায়ক অফিসার নিয়োগ করলেন এবং খারাজ ও জিযিয়া আদায়ের জন্য দিয়ানতদার আমেলদের (সৎ কর্মচারীদের) পাঠালেন।

হযরত খালেদের এ কর্ম পদ্ধতি দেখে হীরার পার্শ্ববর্তী এলাকার রাজারা মনে করল মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নেয়াই ভাল। সেমতে ফালালীজ থেকে হরমুজ প্রণালী পর্যন্ত এলাকার চৌধুরীরা হযরত খালেদ (রাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বার্ষিক বিশ লাখ দিরহাম জিযিয়ার শর্তে সন্ধি করে নিল।

দুই পত্র

এ সকল অভিযান থেকে অবসর হয়ে হযরত খালেদ (রাঃ) দুটি পত্র লিখলেন। একটি ইরানের শাহেনশাহের নামে এবং অপরটি ইরানের রাজন্যবর্গের নামে। প্রথম পত্রের বিষয়বস্তু ছিল ঃ

'অতঃপর, আল্লাহর শোকর, যিনি আপনাদের শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়েছেন। আপনাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করেছেন এবং আপনাদের বাহিনী ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছেন। আল্লাহ এরূপ না করলে আপনাদেরও অমঙ্গল হত। আপনারা আমাদের কর্তৃত্ব মেনে নিন। আমরা আপনাদের ও আপনাদের দেশের কোনরূপ বিঘ্ন ঘটাব না এবং আমরা আপনাদেরকে রেখে অন্য কোন দিকে চলে যাব। নতইবনে এ-ই ঘটবে। এ জাতি এটি করে দেখাবে যারা মৃত্যুর এমনই আকাংখী আপনারা যেমন জীবনের।

www.e-ilm.weebly.com

দ্বিতীয় পত্রের বিষয়বস্তু ছিল ঃ

"অতঃপর, আল্লাহর শোকর,- যিনি আপনাদের গরম মেজাজ ঠাণ্ডা করে দিয়েছেন, আপনাদের বাহিনী ভেঙ্গে দিয়েছেন, আপনাদের সম্মান নাশ ও আপনাদের প্রতিপত্তি ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। অতএব, আপনারা ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদ থাকবেন। নইলে জিযিয়া আদায় করতে স্বীকার করুন। যদি দুটিতেই অসম্মতি হয়, তাহলে আমি এমন একদল লোক নিয়ে আসছি যারা মৃত্যুকে এমনই ভালবাসে তোমরা যেমন শরাব।"

হযরত খালেদের পত্র যখন ইরানে পৌঁছে, ইরানীরা তখন অভ্যন্তরীন তুমুল গোলযোগে লিপ্ত। শাহেনশাহ উর্‌দশিরের ইন্তেকাল হয়েছে। কিন্তু শাহীবংশে এমন কোন পুরুষ ছিল না যাকে তারা তার স্থলাভিষিক্ত করে। এ সকল পত্রে প্রভাবিত হয়ে তারা নিজেদের মতপার্থক্য ঘুচিয়ে ফেলল এবং বেগমদের পরামর্শে ফরখজাদ নামে জনৈক আমীরকে সাময়িকভাবে শাহেনশাহরূপে মেনে নেয়। শাহীবংশের কোন উপযুক্ত ব্যক্তি না পাওয়া পর্যন্ত তাকে এ পদে রাখার সিদ্ধান্ত হয়।

আনবার ও আইনুত তামার বিজয়

হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) হীরায় কা'কা' ইবনে আমরকে নিজের স্থলবর্তী করে নিজে আনবারের দিকে রওয়ানা হলেন। সেখানে সাবাত শাসনকর্তা শিরজাদের সাথে মোকাবেলা হলো। শিরজাদ তার চতুর্দিকে পরিখা খনন করে রেখেছিল। মুসলমানরা নিজেদের উট জবাই করে পরিখা ভরাট করলেন এবং সেটি পার হয়ে গেলেন। শিরজাদ যখন এ মুসিবত দেখল, তখন মুসলমানদের প্রস্তাবিত শর্তে সন্ধি করে নিল।

আনবারের পর হযরত খালেদ (রাঃ) আইনুত তামারের দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানে ছিল চৌবীন এর পুত্র বাহরাম। বাহরাম এক বিশাল ইরানী বাহিনী নিয়ে ছাউনি ফেলেছিল। এই বাহিনীর সাথে ইরানের অধীন এলাকার আরব গোত্রসমূহের (নামর, তাগলিব ইত্যাদি) সৈন্যরাও ছিল। বাহরাম "লোহা-ই লোহা কাটতে পারে" এই ধারনায় আরবদেরকে মুসলমানদের মোকাবেলায় এগিয়ে দিল। কিন্তু হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) তাদের নেতাকে গ্রেফতার করে ফেললেন। নেতার গ্রেফতারে আরব গোত্রগুলো পালাতে শুরু করে দিল। তারপর তাদের দেখাদেখি ইরানী সৈন্যদের মধ্যেও পলায়ন শুরু হয়ে গেল। মুসলমানরা দুর্গ দখল করে নিলেন এবং পরাজিত আরব সৈন্যদের হত্যা করে ফেললেন।

www.e-ilm.weebly.com

দৌমাতুল জানদাল বিজয়

আইনুত তামার-এ অবস্থানকালে হযরত খালেদ (রাঃ) এর নিকট হযরত ইয়াজ ইবনে গানাম (রাঃ)-এর পত্র এল। ইয়াজ (রাঃ) তাঁকে নিজের সাহায্যের জন্য দৌমাতুল জানদালে (উত্তর ইরাক) আহ্বান জানিয়েছিলেন।

রসুলুল্লাহ (সঃ) নিজ জীবদ্দশায় হযরত খালেদ (রাঃ) কে দৌমাতুল জানদাল জয় করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) সেখানে পৌঁছে সেখানকার শাসনকর্তা উকায়দির ইবনে আবদুল মালিককে গ্রেফতার করে মহানবী (সঃ) এর খেদমতে উপস্থিত করেছিলেন। তিনি (সঃ) তার জীবন ভিক্ষা দিলেন এবং জিযিয়া আদায়ের অঙ্গীকারে তার এলাকা তাকেই অর্পণ করেন।

হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর সময়ে উকায়দির ও তার সহকর্মী জূদী প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল এবং জিযিয়া আদায় করা বন্ধ করে দিল। ইয়াজ ইবনে গানাম (রাঃ) নিজ অভিযানসমূহের এক পর্যায়ে যখন সেখানে পৌছালেন, তখন আরব খৃষ্টানদের এক বিরাট দল জূদীর নেতৃত্বে তাঁর মোকাবেলার জন্য একত্রিত হলো। বাধ্য হয়ে তাই তাঁকে হযরত খালেদ (রাঃ) কে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানাতে হলো।

হযরত খালেদ (রাঃ) এর আগমনের খবর শুনে উকায়দির কোনক্রমে পালিয়ে গেল এবং জূদী মোকাবেলা করে পরাজিত হলো। মুসলমানরা দুর্গ দখল করে নিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) উকায়দিরের তল্লাশীতে লোক পাঠালেন। তারা তাকে গ্রেফতার করে আনল এবং প্রতিজ্ঞা ভংগের কারণে হত্যা করলো।

হীরায় প্রত্যাবর্তন

দৌমাতুল জান্দালের অভিযান থেকে অবসর হয়ে হযরত খালেদ (রাঃ) হীরায় ফিরে এলেন। এখানে এসে জানতে পারলেন যে, আইনুত তামার–এর প্রতিশোধ নেবার জন্য আরব ও ইরানীদের একটি সৈন্যবাহিনী হাসীদ ও খানাফেস–এ জড়ো হয়েছে। তিনি তাদের মোকাবেলার জন্য দু দল সৈন্য পাঠালেন। এঁরা তাদেরকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দিলেন। এরপর হযরত খালেদ (রাঃ) মাজীহ–এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এখানে আরবদের একটি দল মোকাবেলার জন্য জড়ো হয়েছিল। হযরত খালেদ (রাঃ) সে দলটিকেও পরাজিত করলেন। অতঃপর ছানী ও বিশর–এ লড়াই হয়। এতে হযরত খালেদ (রাঃ) জয়ী হন।

ফিরাজ যুদ্ধ

ফিরাজ নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইরানী, রোমান ও আরবদের বিশাল বাহিনী মুসলমানদের মোকাবেলা করার জন্য অত্যন্ত

তেজোদ্দীপনার সাথে ফোরাত অতিক্রম করল। তুমুল লড়াই হল এবং অবশেষে বিজয় মুসলমানদেরই পদ চুম্বন করলো। এ ঘটনা ১৫ জিলকদ হিজরী ১২ সনের।

এ লড়াই থেকে অবসর হয়ে হযরত খালেদ (রাঃ) হযরত আসেম ইবনে আমর (রাঃ) কে সৈন্যসহ হীরা ফিরে যেতে আদেশ দিলেন। নিজের সম্পর্কে বললেন যে, আমি পশ্চাদবাহিনীর সাথে পিছনে থাকব। কিন্তু তিনি সোজা মক্কা মুয়াজ্জামা পৌঁছুলেন এবং সেখানে হজ্জ পালন সম্পন্ন করে এত দ্রুত ফিরে এলেন যে, পশ্চাদবাহিনী তখনও হীরা পৌঁছেনি। তিনি পশ্চাদবাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে হীরা প্রবেশ করলেন এবং কতিপয় সাথী ব্যতীত কেউ জানতে পারলো না যে, তিনি এত দীর্ঘ সফর করে এসেছেন। (বিদায়া নিহায়া ৬খ, ৩৫২)

শাম অভিযানের ঘটনাবলী

১৩ হিজরীতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) শামীয় ও রোমানদের পক্ষের আশংকা নির্মূল করবার জন্য শাম ও ফিলিস্তীনের দিকে একটি সেনাদল পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। তিনি এ সৈন্যদলকে চারভাগে বিভক্ত করলেন, প্রতি ভাগের জন্য স্বতন্ত্র অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন এবং তার আক্রমণের জন্য পৃথক দিক প্রস্তাব করে দিলেন।

হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) কে হিমস এর দিকে, আমর ইবনুল আস (রাঃ)-কে ফিলিস্তিনের দিকে, য়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ)-কে দামেশকের দিকে এবং শুরাহবীল ইবনে হাসানা (রাঃ) কে জর্ডানের দিকে পাঠিয়ে দিলেন।

সোনালী উপদেশমালা

ইসলামের খলীফা হযরত আবূ বকর (রাঃ) এ সৈন্যদলের বিদায় দেবার জন্য কিছুদূর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে গমন করলেন এবং বিদায় দেবার সময় সেনানায়কদেরকে উত্তম উপদেশমালা দান করেন। সে সকল উপদেশের মধ্যে কতিপয় এই ঃ

(১) সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করবে, তিনি গোপনকে তেমনই জানেন যেমন প্রকাশ্যকে ;

(২) অধীনস্থদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে, তাদের সাথে সদাচরণ করবে;

(৩) তাদেরকে যখন উপদেশ দেবে তখন সংক্ষিপ্ত উপদেশ দেবে। কেননা কথা দীর্ঘ হলে তার একটি অংশ অন্যটিকে ভুলিয়ে দেয় ;

(৪) প্রথমে নিজেকে সংশোধন করবে, অন্যরা নিজে নিজেই সংশোধন হয়ে যাবে;

www.e-ilm.weebly.com

(৫) তোমাদের নিকট দুশমনের দূত এলে তাকে সম্মান করবে;

(৬) নিজেদের রহস্য গোপন রাখবে, যাতে তোমাদের শৃংখলায় বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়;

(৭) সর্বদা সত্য কথা বলবে, যাতে সঠিক পরামর্শ পাওয়া যায়;

(৮) রাতে নিজ সাথীদের বৈঠকে বসবে, যাতে তোমরা সবরকমের সংবাদ জানতে পার;

(৯) সৈন্য বাহিনীতে পাহারা চৌকির ভাল ব্যবস্থা করবে, কখনো কখনো হঠাৎ গিয়ে পাহারাদারি কাজের পরিদর্শন করতে থাকবে;

(১০) মিথ্যাবাদীদের সাহচর্য পরিহার করে চলবে, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত সাথীদের সাহচর্য অবলম্বন করবে;

(১১) যার সাথে সাক্ষাত করবে, ইখলাসের সাথে সাক্ষাৎ করবে, কাপুরুষতা ও খেয়ানত থেকে বিরত থাকবে;

(১২) তোমরা কিছু লোককে দেখতে পাবে যে, তারা দুনিয়াবিমুখ হয়ে নিজ উপাসনালয়গুলোতে বসে আছে। তোমরা কখনই তাদেরকে উত্যক্ত করবে না, তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেবে।

ইসলামী বাহিনীর চার অধিনায়ক নিজ নিজ সৈন্যদল নিয়ে শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। হযরত আবূ উবায়দা (রাঃ) জারিয়াতে, হযরত য়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান, শুরাহবীল ইবনে হাসানা বুসরায় এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) আরবায় পৌছে মোর্চা স্থাপন করলেন। শামীয় ও রোমানরা যখন দেখল যে, মুসলমানরা তাদের দেশ বেষ্টন করে নিয়েছে, তখন তারা খুবই চিন্তিত হল এবং নিজেদের শাহেনশাহ রোমের কায়সার হিরাক্লিয়াসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল।

হিরাক্লিয়াসের পরামর্শ

রোমের কায়সার হিরাক্লিয়াস এ সময় বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করছিলেন। তিনি তাঁর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ডাকলেন এবং বললেন ঃ

"আমার অভিমত হলো- মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নেয়া হোক। শামের অর্ধেক রাজস্ব মুসলমানদের দেবে এবং বাকী অর্ধেক নিজেদের জন্য রেখে দেবে। তার চেয়ে শ্রেয় হয় শামের পুরো রাজস্ব মুসলমানদের সোপর্দ করে দেয়া হোক এবং রোমের অর্ধেক রাজস্ব থেকেও হাত গোটাতে হবে।"

কিন্তু নেতৃবৃন্দ তাঁর উপদেশ গ্রহণ করলেন না এবং লড়াই করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। হিরাক্লিয়াস বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে রওয়ানা হয়ে হিমস এলেন এবং এখানে তিনি নিজ সৈন্য জড়ো করলেন। তিনি জানতে

www.e-ilm.weebly.com

পেরেছিলেন যে, ইসলামী বাহিনী চার ভাগে বিভক্ত। তিনিও প্রতি অংশের মোকাবেলার জন্য পৃথক পৃথক বাহিনী নিজের চার অধিনায়কের নেতৃত্বে রওয়ানা করে দিলেন। এ বাহিনী সংখ্যার দিক দিয়ে ইসলামী বাহিনী থেকে প্রচুর বেশী ছিল।

হিরাক্লিয়াসের ভাই তাজারেক নব্বই হাজার সৈন্য নিয়ে আমর ইবনে আস (রাঃ)-এর মোকাবেলার জন্য, জারজের ইবনে তুদর পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে য়াযীদ (রাঃ) এর মোকাবেলার জন্য, কায়কার ইবনে নাসতুস ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে আবূ উবায়দা (রাঃ) এর মোকাবেলার জন্য এবং অরাকেস চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে শুরাহবীল (রাঃ) এর মোকাবেলার জন্য রওয়ানা হলো।

সম্মিলিত মোকাবেলা

মুসলমানরা যখন জানতে পারলেন যে, তাদের সৈন্যের প্রতি ভাগের মোকাবেলার জন্য তার কয়েক গুণ রোমান সৈন্য আসছে এবং শত্রুর পরিকল্পনা হলো- মুসলমানদেরকে পৃথক পৃথকভাবে পিষে ফেলা, তখন তারা আমর ইবনেল আস (রাঃ) এর নিকট পরামর্শ চাইলেন।

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বললেন- আমার মত হলো- আমাদের সবার এক স্থানে সমবেত হওয়া উচিত। এতে আমরা সংখ্যাস্বল্পতার কারণে কখনই পরাজিত হতে পারিনা। সবাই হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) এর পরামর্শ পছন্দ করলেন এবং খলীফার দরবারে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) অনুমতি দিয়ে দিলেন এবং এ-ও লিখে দিলেন যে, মুসলমানরা সংখ্যাল্পতার কারণে কখনই পরাজিত হতে পারে না। অবশ্য যদি তারা গোনাহে নিমজ্জিত হয়ে যায়, তাহলে তো পরাজিত হবে। অতএব তাদের গুনাহ পরিহার করা উচিত।

হিরাক্লিয়াস যখন জানতে পারলেন যে, ইসলামী সৈন্য একস্থানে সমবেত হয়েছে, তখন তিনিও নিজ সৈন্যকে একত্রিত হতে নির্দেশ দিলেন। রোমান সৈন্যরা য়ারমূক প্রান্তরের নিকটে দাকূসা নামক স্থানে নিজেদের মোর্চা স্থাপন করলো। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক ইসলামী সৈন্যরাও রোমান সৈন্যদের সামনে এসে একত্রিত হলেন এবং তারা রোমানদের রাস্তা বন্ধ করে দিলেন।

সফর ১৩ হিজরী থেকে রবিউসছানী ১৩হিজরী পর্যন্ত উভয় সেনাদল সামনা সামনি অবস্থান করতে থাকল এবং কারো অপরের উপর হামলা করার সাহস হলো না।

সাইফুল্লাহর আগমন

রোমানদের পজিশনও মজবুত ছিল। কেননা তাদের সামনে ছিল নদী এবং পিছনে পাহাড়। তাদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। অতএব মুসলমানরা খলীফার

www.e-ilm.weebly.com

দরবারে প্রার্থনা জানালেন যে, তাদের জন্য সাহায্য পাঠানো হোক। সেখান থেকে হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ)-কে আদেশ করা হলো যে, তিনি যেন ইরাক অভিযান ছেড়ে শাম রওয়ানা হয়ে যান। হযরত খালেদ (রঃ) মুছান্না ইবনে হারিছা (রাঃ)-কে নিজের স্থলবর্তী নিযুক্ত করেন এবং দশ হাজার সৈন্য নিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে য়ারমুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

যদিও য়ারমূকে পৌছুনোর জন্য হযরত খালেদকে অত্যন্ত দ্রুত পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল, তথাপি তিনি রাস্তায় নিজ তলোয়ারের তীক্ষ্ণতা প্রদর্শন করে যেতে থাকেন। আরাক পৌছুলে সেখানকার বাসিন্দারা সন্ধি করে নিল। অতঃপর তাদমার পৌছলে তাদমারবাসীরা দুর্গে আশ্রয় নিল এবং অবশেষে সন্ধি করে নিল। করয়াতাইন পৌছে তিনি সেখানকার লোকদের পরাজিত করলেন। মরজেরাহেত এসে গাসানীদের তছনছ করলেন। অতঃপর গোতা আক্রমণ করে তা জয় করলেন। বুসরা পৌছুলে সেখানকার বাসিন্দাদের সাথে মোকাবেলা হলো। বুসরাবাসীরা হযরত খালেদ (রাঃ) এর নিকট সন্ধির প্রার্থনা করলো। তিনি মঞ্জুর করলেন। বুসরা হযরত খালেদ (রাঃ) এর হাতে বিজিত শামের প্রথম শহর। এভাবে জয়ের পতাকা উড়াতে উড়াতে হযরত খালেদ (রাঃ) রবিউল আখের মাসে য়ারমূক পৌছুলেন। ইসলামী বাহিনীর নিকট হযরত খালেদ (রাঃ) এর সাহায্য পৌছুনোর সাথে সাথে রোমান সৈন্যদেরও অতিরিক্ত সাহায্য এসে গেল। একজন বিখ্যাত রোমান অধিনায়ক বাহান তার সাথে অনেক ধর্মীয় নেতাসহ রোমান সৈন্যদের সাথে এসে মিলিত হলো। এখন ইসলামী সৈন্যের মোট সংখ্যা ৩৬ হাজার আর রোমান সৈন্য সংখ্যা ২ লাখ ৪০ হাজার গিয়ে দাঁড়াল।

য়ারমূক যুদ্ধ

হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) দেখলেন, রোমানরা সংখ্যায় অনেক বেশী। তদুপরি যুদ্ধনীতি মোতাবেক নিজেদের সৈন্যদের বিন্যস্ত করে রেখেছে। মুসলমানরা সংখ্যায় তাদের চেয়ে কম। তদুপরি যা রয়েছে তারাও এক পতাকার নীচে নয়। এমতাবস্থায় এ আশংকা ছিল যে, লড়াই দীর্ঘস্থায়ী হবার এবং তাতেও শত্রুর কোন ক্ষতি করা যাবে না। সেজন্য তিনি ইসলামী বাহিনীর সর্দারদের ডাকলেন এবং এ বক্তৃতা দিলেন ঃ

"এ যুদ্ধ এক মহান ধর্মযুদ্ধ। আজ আমাদের গর্ব ও নাফরমানীর খেয়াল অন্তর থেকে বের করে দেয়া উচিত এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য নিজেদের প্রচেষ্টা ব্যয় করা প্রয়োজন। দেখুন, দুশমন সুশৃংখল ও সুবিন্যস্তভাবে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত। কিন্তু আপনারা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন। আপনাদের এ বিক্ষিপ্ততা আপনাদের জন্য দুশমনের হামলার চেয়ে বেশী ক্ষতিকর এবং দুশমনের জন্য তাদের সাহায্য

www.e-ilm.weebly.com

করার চেয়ে বেশী উপকারী। উত্তম হয় যদি সকল সৈন্য একজন আমীরের কমাণ্ডে নিয়ে আসা যায় এবং সৈন্যের নেতৃত্ব পালাক্রমে বন্টন করে দেয়া যায়। একদিন একজন সর্দার আমীর হবেন, পরের দিন অপরজন। যদি এ অভিমত আপনাদের পছন্দসই হয় তাহলে আজ আমাকে আমীর হতে দিন।"

ইসলামী সৈন্যের সর্দারগণ হযরত খালেদ (রাঃ) এর মত পছন্দ করলেন এবং তাঁকে সৈনাধ্যক্ষ হিসেবে মেনে নিলেন।

ইসলামী বাহিনীর বিন্যাস

রোমান সৈন্যরা অত্যন্ত সুন্দররূপে ময়দানে কাতারবন্দী হলো। হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ)ও ইসলামী সৈন্যদের এভাবে বিন্যস্ত করলেন, যে ভাবে ইতিপূর্বে কখনও দেননি। তিনি মোট সৈন্যদের ৪০টি দলে ভাগ করলেন। কিছু দল রাখলেন কেন্দ্রে। এদের নেতা নিযুক্ত করলেন হযরত আবূ উবায়দা (রাঃ)–কে। কিছুদল রাখলেন দক্ষিণে, তাদের নেতা আমর ইবনে আস (রাঃ) ও শুরাহবীল ইবনে হাসানা (রাঃ)-কে নিযুক্ত করলেন। কিছুদল বামে রাখলেন। তাদের নেতা নিযুক্ত করলেন য়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) কে। কিছু দলের জন্য কা'কা' ইবনে আমর ও মাজউর ইবনে আদী প্রমুখকে নেতা নিযুক্ত করলেন। তিনি প্রায় চল্লিশজন সিপাহীবিশিষ্ট প্রতিটি দলে পৃথক পৃথক অফিসার নিযুক্ত করলেন। এ সকল অফিসার কেন্দ্রীয়, দক্ষিণ ও বাম বাহিনীর অধিনায়কের অধীনে ছিলেন। আবূ সুফিয়ান (রাঃ) সেনাবাহিনীর ঘোষক নিযুক্ত হলেন। তিনি পুরো সেনাবাহিনীর মধ্যে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিতেন এবং সৈন্যদের উত্তেজিত করতেন।

কারা বেশী?

যখন উভয় পক্ষের সৈন্যরা সামনা সামনি এসে গেল, তখন ইসলামী সৈন্যদের এক ব্যক্তি বলল, রোমানরা কত বেশী আর মুসলমানরা কত কম! হযরত খালেদ (রাঃ) শুনে বললেন– এভাবে বল যে, মুসলমানরা কত বেশী আর রোমানরা কত কম! তারপর তিনি তাকে বললেন, কম আর বেশী কোন বিষয় নয়, জয় পরাজয়ই মূলবস্তু।

অবশেষে লড়াই বেঁধে গেল এবং তলোয়ারে তলোয়ারে আঘাত খেতে লাগলো। হযরত খালেদ (রাঃ) স্বয়ং কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে দুশমনদের কাতারে গিয়ে ঢুকে পড়লেন এবং দুশমনের আরোহী সৈন্য ও পদাতিক সৈন্যদের মাঝখানে অন্তরায় হয়ে গেলেন। দুশমনের আরোহী সৈন্য মুসলমানদের হামলা বরদাশত করতে পারলো না এবং পালাতে শুরু করে দিল। মুসলমানরা তাদের পালানোর পথ করে দিলেন। এখন শুধু পদাতিক বাহিনী রয়ে গেল। হযরত খালেদ (রাঃ) নিজ দল নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রোমানরা অনুভব

www.e-ilm.weebly.com

করল যেন তাদের উপর কোন দেয়াল ভেঙ্গে পড়েছে। পালাতে চাইল। কিন্তু কোথায় যাবে? পিছনে ছিল পাহাড়। দিশেহারা হয়ে নদীর দিকে ফিরল এবং ডুবে গেল। তাবারীর বর্ণনামতে নদীতে নিমজ্জিত সৈন্যের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২০ হাজার। তলোয়ারে মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা এর অতিরিক্ত। মুসলমান মোট ৩ হাজার শহীদ হন।

মৃত্যু শপথ

প্রথম দিকে রোমান সৈন্যরা আক্রমণ করলে ইসলামী সৈন্যের কোন কোন দল টিকে থাকতে পারলো না। কিন্তু ইকরিমা ইবনে আবূ জেহেল ও তাঁর পুত্র আমর ইবনে ইকরিমা এসময় বড়ই জীবনবাজির প্রমাণ দিলেন। ইকরিমা চিৎকার করে বললেন, আমি প্রতিটি ময়দানে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে সাথে যুদ্ধ করেছি। আমি কি আজ পিঠ দেখাতে পারি? আমার হাতে মৃত্যুর শপথ করতে কে কে প্রস্তত আছে? হারিছ ইবনে হিশাম ও জিরার ইবনে আযওয়ার প্রমুখ চার শো জানবাজ তাঁর আওয়াজে ময়দানে বেরিয়ে এল এবং হযরত খালেদের তাঁবুর সামনে এমন বীরত্বের সাথে লড়াই করলো যে, দুশমনের গতি ফিরিয়ে দিল।

পরবর্তী দিন সকালে ইকরিমা (রাঃ) ও আমর ইবনে ইকরিমা (রাঃ)-কে হযরত খালেদের নিকট আনা হলো। তাঁরা দুজনে জখমে জর্জরিত ছিলেন এবং হাফাচ্ছিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) একজনের মাথা নিজের উরুর উপর এবং অপর জনেরটি নিজের পায়ের নলার উপর রাখলেন এবং তাঁদের চেহারা থেকে ধুলা পরিষ্কার করছিলেন। আর গলায় পানি দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তাদের দুজনের রূহ উড়ে গেল। (আল্লাহ তাঁদের দুজনকে রহম করুন)

এ যুদ্ধে মুসলমান মহিলারাও নিজেরা একটি দল তৈরী করে পৌরুষের নৈপুন্য প্রদর্শন করেন। এ যুদ্ধ 'য়ারমূকের যুদ্ধ' নামে প্রসিদ্ধ এবং ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রাখে। এ যুদ্ধে জয়ের পর শামে মুসলমানদের অবস্থান মজবুত হয়ে যায় এবং এরপর তাঁরা আরও অগ্রসর হতে লাগলেন।

ইখলাসের চিত্র

ইয়ারমুক যুদ্ধ তখনও চলছে। এরই মধ্যে মদীনা থেকে দূত একটি পত্র নিয়ে এল। পত্রে লেখা ছিল- খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবূ বকর (রাঃ) ইন্তেকাল করেছেন, হযরত উমর (রাঃ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। পত্রে এ-ও লেখা ছিল যে, নতুন খলীফা হযরত খালেদ (রাঃ)-কে অব্যাহতি দিয়ে তাঁর স্থানে হযরত আবূ উবায়দা ইবনেুল জাররাহ (রাঃ)-কে ইসলামী বাহিনীসমুহের অধিনায়ক নিযুক্ত করেছেন।

এ পত্র প্রথমে হযরত খালেদ (রাঃ) এর হাতে পৌছল। তিনি তা পাঠ করে বিন্দুমাত্র বিরূপমন হলেন না। নিরবে হযরত আবূ উবায়দা (রাঃ) এর সংবাদ

www.e-ilm.weebly.com

দিলেন যে, এখন আপনি আমার নেতা, আমি আপনার অধীনে এবং এ সংবাদ ব্যাপক ভাবে প্রচার করলেন না, পাছে সৈন্যদের মধ্যে বিরূপ মনোভাব ও হতাশা ছড়িয়ে পড়ে।

জনৈক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, অব্যাহতিদানের সংবাদে আপনার আক্রমণের তীব্রতায় তো বিন্দুমাত্র তফাৎ হলো না। তিনি জবাব দিলেন, আমি আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করছি, উমর (রাঃ) এর জন্য নয়।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর অসুখ ও ইন্তেকাল

৭ই জুমাদাল উখরা হিজরী সন ১৩ হযরত আবূ বকর (রাঃ) জ্বরে আক্রান্ত হলেন। পনের দিন পর্যন্ত অবিরাম জ্বর চললো। অবশেষে ২১শে জুমাদাল উখরা হিজরী সন ১৩ বিকালে তিনি ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (মতান্তরে ২৩শে জুমাদাল উখরা)। হযরত আয়েশা (রাঃ) এর কক্ষে রসুলুল্লাহ (সঃ) এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর খেলাফত কাল দুই বছর তিন মাস দশ দিন।

ইন্তেকালের সময় তিনি অসিয়ত করে যান যে, আমার জমি বিক্রি করে যেন ঐ অর্থ পরিশোধ করে দেয়া হয় যা আমি খেলাফতের পারিশ্রমিক হিসেবে গ্রহণ করেছি।* এ হুকুম পালন করা হয়েছিল। কাফন সম্পর্কে বলেন যে, আমার শরীরে বর্তমানে যে কাপড় রয়েছে তা-ই ধুয়ে তাতে কাফন দেবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, আব্বাজান, এতো পুরোনো। তিনি বললেন, আমার জন্য এই ছেঁড়া পুরানো কাপড়ই যথেষ্ট।

তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত উমর (রাঃ) আরো কতিপয় প্রবীণ সাহাবীসহ বায়তুল মালের হিসেব নিলেন। সেখানে মাত্র একটি দীনার পাওয়া গেল। বায়তুল মালের খাজাঞ্চীকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, প্রথম থেকে এ পর্যন্ত খেলাফতের ভাণ্ডারে কত অর্থ এসে থাকবে? তিনি বললেন, দুই লাখ দীনার।

হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর নিয়ম ছিল, যা কিছু আসবে তৎক্ষণাৎ বন্টন করে দিতে হবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর তরিকা অনুযায়ী তিনি সম্পদ জমিয়ে রাখা পছন্দ করতেন না।

---

* খেলাফতের দায়িত্ব কাঁধে নেয়ার পূর্বে হযরত আবূ বকর (রাঃ) একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করা হলে তাঁর জীবিকার চিন্তা করার সময় থাকল না। তাই সাহাবায়ে কেরাম পরামর্শ করে তাঁর জন্য ৬০০০ দেরহাম আজিফা নির্ধারিত করেন। (মুহাজারাতুল খাজারী ১খ, ২৯৩)

www.e-ilm.weebly.com

এক নজরে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর খেলাফত

হযরত আবু বকর (রাঃ) একজন সচেতন, কুশলী, অভিজ্ঞ, চিন্তাশীল ও সাহসী সিপাহসালার ছিলেন। তাঁর খেলাফত তাঁর এই খেলাফতী খুতবার কার্যব্যাখ্যা ছিল ঃ

"হে মানুষেরা, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী দুর্বল, সে আমার নিকট সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী, যতক্ষণ না আমি তাকে তার প্রাপ্য দিয়ে দিই এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে শক্তিশালী সে আমার নিকট সবচেয়ে দুর্বল, যতক্ষণ না আমি তার নিকট থেকে অন্যের প্রাপ্য নিয়ে নিই। হে লোকসলক, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর অনুসারী। আমি নিজে কোন নতুন বিষয় সৃষ্টিকারী নই। আমি যতক্ষণ হক পথে থাকি, তোমরা আমাকে সাহায্য করবে, আর যখন আমি এ পথ থেকে বিচ্যুত হই তখন আমাকে সোজা পথে এনে ছেড়ে দেবে।"

ধর্মান্তর ফিতনার অমানিশার পর্দা বিদীর্ণ করতে তাঁর স্বচ্ছ চিন্তা যে সকল কর্ম সম্পাদন করেছে, তা ইসলামের ইতিহাসের ললাটের আলোকস্বরূপ। অতঃপর ইরান ও রোমের শাহেনশাহদের সিংহাসন উল্টে দেবার জন্য তিনিই প্রথম হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এদের অত্যাচারে সারা বিশ্ব আর্ত চিৎকার করছিল। কুরআন কারীম (যা দ্বীন ইসলামের মৌলিক কানুন) এর সুরাসমূহ গ্রন্থাকারে সংকলন ও সুবিন্যস্তকরণ তাঁরই গৌরবময় কীর্তি।

তাঁর এসকল বৈশিষ্ট্যের কারণে মেনে নেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর নবীদের পরে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাঁকে অফুরন্ত অসীম পরিপূর্ণ রহমত দান করুন।

হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর পরিবার

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) কতিপয় বিবাহ করেন। ইসলামের পূর্বে তিনি বনী আমের ইবনে লুওয়াই এর পরিবারে কাতীলা বিনতে আবদুল উজ্জাকে বিবাহ করেন। তার গর্ভে একপুত্র আবদুল্লাহ এবং এক কন্যা আসমা জন্ম লাভ করেন। আসমার বিবাহ হয় হযরত জুবায়র ইবনে আওয়াম (রাঃ) এর সাথে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র (রাঃ) তাঁরই পুত্র। সে সময়েই তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন বনী কিনানা পরিবারের উম্মে রূমান বিনতে আমেরকে। তাঁর গর্ভে একপুত্র আবদুর রহমান এবং এক কন্যা আয়েশা সিদ্দীকা জন্মলাভ করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ), রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি খাছআম পরিবারের আসমা বিনতে উমায়স (রাঃ)-কে বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন হযরত জাফর ইবনে আবু তালেবের বিধবা স্ত্রী। তাঁর গর্ভে এক পুত্র মুহাম্মাদ জন্মলাভ করেন। একই সময়ে খাযরাজ পরিবারের হাবীবা

www.e-ilm.weebly.com

বিনতে খারেজাকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর এক কন্যা উম্মে কুলসুম জন্মলাভ করেন।

আবূ বকর (রাঃ)-এর গভর্নরগণ

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর খেলাফতকালে শুধুমাত্র আরব উপদ্বীপে নিয়মিত ইসলামী হুকুমত ছিল। তিনি আরব উপদ্বীপকে দশটি প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন। প্রতিটি প্রদেশে তাঁর প্রতিনিধিরূপে একজন আমীর নিযুক্ত ছিলেন। আঞ্চলিক শৃংখলা রক্ষা ব্যতীত নামাজের ইমামত, মোকদ্দমাসমূহ শোনা এবং শাস্তি দণ্ডাদি প্রয়োগও আমীরের দায়িত্বের অন্তর্গত ছিল।

প্রদেশসমূহ ও আমীরদের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

প্রদেশ **আমীর**

মক্কা আত্তাব ইবনে উসায়দ

উছমান ইবনে আবীল আস তায়েফ

মুহাজির ইবনে আবী উমায়্যা সানআ

যিয়াদ ইবনে লাবীদ হাজরামাউত

য়া'লা ইবনে উমায়্যা খাওলান

আবু মূসা আশআরী জুবায়েদ

মুআয ইবনে জাবাল জুনদ

আবদুল্লাহ ইবনে ছাওর জারাশ

আলা ইবনে হাযরামী বাহরাইন

জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী নাজরান

ইরাক ও শামে লড়াই তখনও চলছিল এবং সেখানকার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়দায়িত্বও সেনানায়কদের হাতেই ছিল।

উমর ফারূক (রাঃ) এর যুগ

হযরত উমর (রাঃ) এর নির্বাচন

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর রোগ যখন বেড়ে গেল এবং তিনি অনুভব করলেন যে, দুনিয়া থেকে তাঁর বিদায় হবার সময় নিকটে এসেছে, তখন তাঁর খেলাফতের চিন্তা হল। তিনি চিন্তা করলেন, যদি খেলাফতের বিষয়টি ফয়সালা না করে দেয়া হয়, তাহলে মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হবে এবং তাদের শক্তি খর্ব হয়ে যাবে। তিনি যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে হযরত উমর ফারূক (রাঃ) এর নাম প্রস্তাব করলেন। অতঃপর তিনি নিজের এ প্রস্তাবটি প্রবীণ সাহাবীদের নিকট পেশ করলেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই এ প্রস্তাব খুবই পছন্দ করলেন। কিন্তু কেউ কেউ বললেন, এমনিতে তো উমর উত্তম ব্যক্তি। তবে তাঁর মেজাজে একটু কঠোরতা রয়েছে। হযরত আবূ বকর (রাঃ) জবাব দিলেন, যখন তাঁর উপর খেলাফতের বোঝা এসে পড়বে তখন এ কঠোরতা আপনাআপানিই চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত সবাই হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর প্রস্তাবে একমত হলেন।

সব প্রবীণ সাহাবী হযরত উমর (রাঃ) এর খলীফা হওয়াতে রাজী হয়ে গেলে হযরত উছমান (রাঃ) কে ডেকে তিনি খেলাফতের শপথনামা লেখালেন এবং সাধারণ সমাবেশে তা শোনাতে আদেশ করলেন। শপথনামার সারাংশ ছিল এই ঃ

"এ শপথনামা মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সঃ) এর খলীফা আবূ বকর (রাঃ) এর পরকাল যাত্রার সময়ের। এ সেই নাজুক সময় যখন কাফেরও ঈমান আনে এবং গোনাহগারও আল্লাহর প্রতি য়াকীন করতে থাকে। আমি উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-কে আপনাদের শাসক করছি এবং এ নিয়োগে আমি আপনাদের কল্যাণের পূর্ণ লক্ষ্য রেখেছি। যদি তিনি হকের উপর কায়েম থাকেন এবং ন্যায্যতার সাথে কাজ চালান, তাহলে এ-ই আমি তাঁর কাছে আশা রাখি। আর যদি তিনি অত্যাচার করেন এবং হক পথ থেকে বিচ্যুত হন, তাহলে আমি তো গায়েব জানি না। আমার তো ইচ্ছা মুসলমানদের সাথে কল্যাণের। সকল মানুষ নিজ কর্মের দায়িত্বশীল।"

এরপর তিনি এক ব্যক্তির উপর ভর দিয়ে উপর তলার কক্ষে গেলেন এবং মুসলমানদের সমাবেশকে সম্বোধন করে বললেন- ভাইয়েরা আমার, আমি নিজের কোন আত্মীয় বা ভাইকে খলীফা নিযুক্ত করি নাই। বরং সে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেছি যিনি আপনাদের মধ্যে উত্তম। আপনারা কি তাঁকে পছন্দ করেন?

উপস্থিত সকলে এ নির্বাচন পছন্দ করল এবং হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর মতের সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করল।

www.e-ilm.weebly.com

এরপর তিনি হযরত উমর (রাঃ) এর প্রতি ফিরলেন এবং তাঁকে অনেকক্ষণ যাবত উপদেশ দিতে লাগলেন। হযরত উমর (রাঃ) এর খেলাফত কালের সাফল্যের পিছনে এ সকল উপদেশের অনেক প্রভাব রয়েছে।

খেলাফতপূর্ব অবস্থা

নাম উমর, উপনাম আবূ হাফস, উপাধী ফারূক। পিতার নাম খাত্তাব এবং মায়ের নাম হানতামা। তিনি আদী ইবনে কাব এর বংশধর আর রসূলুল্লাহ (সঃ) মুররা ইবনে কাব-এর। এভাবে তাঁর বংশ পরম্পরা অষ্টম পুরুষে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে মিশে যায়। তাঁর পরিবারকে আরবে খুব সম্মানিত মনে করা হত। কুরাইশদের দূতিয়ালী এবং তাদের অভ্যন্তরীন বিবাদের সালিসীর দায়িত্ব পালন করা এ পরিবারেরই কাজ ছিল।

হযরত উমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) এর জন্মের বারো বছর পর জন্ম লাভ করেন। তিনি যুদ্ধ বিদ্যা ও বাগ্মিতায় পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং যৌবন বয়সেই তাঁর সাহস ও বীরত্বের খ্যাতি সারা আরবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তদুপরি ব্যবসা উপলক্ষে তিনি দূরদূরান্তের দেশে সফর করেন। এতে তাঁর দুরদর্শিতা, প্রশস্থ দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার গুণাবলী অর্জিত হয়।

ইসলাম গ্রহণ

তাঁর বয়স যখন সাতাশ বছর তখন রসূলে আকরাম (সঃ) মক্কার প্রান্তরে সত্যের আওয়াজ তুললেন। উমর এর নিকট এ আওয়াজ ভাল লাগল না। তিনি তা দমিয়ে দিতে চেষ্টা শুরু করলেন। উমরের বিরোধিতা আল্লাহর নবী (সঃ) এর জন্য খুব কঠিন ছিল। তিনি দুআ করলেন-

اللهم اعز الإسلام بأحد الرجلين إما إبن هشام و إما عمر بن الخطاب.

"হে আল্লাহ আমর ইবনে হিশাম বা উমর ইবনে খাত্তাবের দ্বারা ইসলামকে সম্মান দান কর"।

একদিন তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে শহীদ করবার ইচ্ছায় ঘর থেকে বের হলেন। রাস্তায় একব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলো। তিনি তাঁর হাবভাব দেখে জিজ্ঞেস করলেন, উমর, ভাল তো, কোথায় যাও? হযরত উমর জবাব দিলেন, "মুহাম্মদের (সঃ) ফয়সালা করার জন্য যাচ্ছি।" লোকটি বললেন, আরে মিয়া, মুহাম্মদের (সঃ) ফয়সালা পরে করবে, প্রথমে নিজের ঘরের সংবাদ নাও। তোমার বোন ও বোনাই মুহাম্মাদের (সঃ) কালেমা পাঠ করছে। এ কথা শুনেই হযরত উমর (রাঃ) ফিরলেন এবং নিজ বোনের বাড়ীর রাস্তা ধরলেন। বোন তখন কুরআন মজীদের কোন সূরা পাঠ করছিলেন। পায়ের শব্দ পেয়ে তিনি সূরার পৃষ্ঠাগুলো লুকালেন। কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) এর কানে গুনগুন শব্দ এসেছিল। তিনি বোন বোনাই উভয়কে এত প্রহার করলেন যে, তারা জখমে জর্জরিত হয়ে গেলেন।

www.e-ilm.weebly.com

উমর বললেন- বলো- এখনো কি কুধর্ম থেকে ফিরবে না? বোন বললেন- উমর, যাচ্ছে তাই করো। এ নেশা উত্তেজিত হয়ে নমিত হয় না। তাঁদের এ দৃঢ়তা ও য়াকীনে উমর হয়রান হলেন এবং বললেন, আচ্ছা, তার স্বাদ আমাকেও কিছু উপভোগ করাও। বোন সে সুরাটিই পাঠ করতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর দুআ কবুল হওয়ার সময় হয়ে গিয়েছিল। হযরত নিরবে শুনতে লাগলেন, তারপর স্বতস্ফুর্তভাবে চিৎকার করে উঠলেন–.

اشهد أن لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল।"

কুফরের এ বিদ্যুত যখন ইসলামের তলোয়ারে পরিণত হলো তখন মক্কার দুর্বল মুসলমানদের অনেক শক্তি অর্জিত হলো। এখন পর্যন্ত মুসলমানরা গোপনে নিজেদের দীনি কর্মসমূহ পালন করতেন। নিজেদের ইসলামের কথাও গোপন রাখতেন। কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) ই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি কাফেরদের একত্রিত করে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি আরজ করলেন- হে আল্লাহর রসূল, এখন কাবায় নামাজ আদায় করতে হবে। হযরত উমর (রাঃ) এর ইচ্ছা মোতাবেক রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদের দুটি কাতার নিয়ে কাবা শরীফে গমন করলেন। একটি কাতারের নেতৃত্ব দিলেন হযরত উমর (রাঃ), অপরটির হযরত হামযা (রাঃ) । কাবা শরীফে তারা জামাআতের সাথে নামায আদায় করলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন,

ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر رضـ (بخاری باب الهجرة)

উমর (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমরা সম্মানিত হলাম। (সহীহুল বুখারী, হিজরত অধ্যায়)

হিজরতের ঘোষণা

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে যখন মুসলমানদের মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি হলো তখন হযরত উমর (রাঃ)ও হিজরতের ইচ্ছা করলেন। সাধারণ ভাবে মুসলমানরা কাফেরদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবার জন্য নীরবে এ সফর করতে লাগলেন। কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) তা পছন্দ করলেন না। তিনি নিজ শরীরে হাতিয়ার সজ্জিত করলেন এবং তারপর কাফেরদের সমাবেশের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে কাবাঘরে পৌঁছুলেন। সেখানে তিনি ধিরস্থির ভাবে তওয়াফ করলেন এবং নামায আদায় করলেন। তারপর উচ্চ স্বরে ঘোষণা করলেন- আমি মদীনা যাচ্ছি। কারো তার মাকে নিজের জন্য কাঁদাতে হলে ঐ প্রান্তরের নিকটে আমার সাথে মোকাবেলা করুক। কিন্তু কাফেরদের কারো তাঁর সাথে মোকাবেলা করার সাহস হলো না এবং তিনি নিরাপদে মদীনায় পৌঁছুলেন।
(মুহাজারাতুল খজরী ১খ, ২৯৭)

www.e-ilm.weebly.com

যুদ্ধে অংশগ্রহণ

বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত সকল যুদ্ধে তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পাশাপাশি থেকে যুদ্ধ করেছেন। বদর যুদ্ধে কাফেরদের প্রায় সত্তরজন নিহত হয় এবং সে পরিমাণে বন্দী হয়। প্রশ্ন উঠলো এসব কাফের বন্দীদের সাথে কি আচরণ করা যায়? হযরত আবূ বকর (রাঃ) ছিলেন স্বভাবগতভাবে দয়ালু। তিনি অভিমত দিলেন যে, পণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া যাক। কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) এ মতের তীব্র বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন, এসব কাফেরকে যারা ইসলামকে নির্মূল করতে কোন প্রচেষ্টা বাকী রাখেনি, হত্যা করে ফেলা হোক। হত্যার ক্ষেত্রেও তিনি এই নিয়ম প্রস্তাব করলেন যে, প্রত্যেকে তার নিজের নিকটজনকে নিজের হাতে হত্যা করবে।

রসূলুল্লাহ (সঃ) এর জগতের করুণাসুলভ মনোভাবের কারণে হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর প্রস্তাব পছন্দ হলো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা অহীর মাধ্যমে হযরত উমর (রাঃ) এর মত সঠিক বলে বর্ণনা করলেন।

উহুদ যুদ্ধে যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) এর আদেশ লংঘনের কারণে মুসলমানদের বিজয় পরাজয়ে পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) কাফেরদের ভিড়ে আটকা পড়লেন তখন হযরত উমর (রাঃ) এর স্থির পা এক মূহূর্তের জন্যও স্থানচ্যুত হয়নি।

রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন নিজের জীবনোৎসর্গীদের একটি দলসহ পাহাড়ের একটি উপত্যকায় উঠলেন এবং খালেদ ইবনে অলীদ (যিনি তখনও মুসলমান হন নাই) সৈন্যদের একটি দল নিয়ে তাঁর উপর হামলা করার ইচ্ছা করলেন, তখন হযরত উমর (রাঃ) অগ্রসর হলেন এবং কতিপয় সাথীসহ কাফের সৈন্যদলকে পিছে হটিয়ে দিলেন। লড়াই শেষ হলে আবূ সুফিয়ান চিৎকার করে বললেন, মুহাম্মাদ কি জীবিত আছে? মহানবী (সঃ) সাথীদেরকে উত্তর দিতে নিষেধ করলেন। আবু সুফিয়ান বললেন, তবে আবূ বকর ও উমর কি জীবিত আছে? এবারও কোন উত্তর পাওয়া গেল না। তখন তিনি চিৎকার করে বললেন, নিশ্চয় মুহাম্মাদ ও তাঁর বন্ধুরা নিহত হয়েছেন। হযরত উমর (রাঃ) থেকে এবার আর রেহাই পাওয়া গেল না। তিনি চিৎকার করে বললেন- হে আল্লাহর দুশমন, আমরা সবাই জীবিত আছি। অতঃপর আবু সুফিয়ান যখন أعلى هبل "হোবল শ্রেষ্ঠ' শ্লোগান তুললেন, তখন উমর (রাঃ) তৎক্ষণাত জবাব দিলেন,

الله أعلى و أجل। 'আল্লাহই মহান ও শ্রেষ্ঠ'।

খন্দক যুদ্ধে যখন কফের ও য়াহূদদের প্লাবন মদীনাকে চারিদিক থেকে বেষ্টন করে নিল, তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) খন্দক খনন করালেন। তিনি কতিপয় জানবাজ সাহাবীকে খন্দক হেফাজতের জন্য মোতায়েন করলেন- তারা এ প্লাবনকে খন্দক পার হতে দেবেন না। এ জানবাজদের অন্যতম ছিলেন হযরত উমর (রাঃ)। তিনি নিজ সৈন্য দলসহ কাফেরদের হামলা প্রতিহত করতে লাগলেন। একদিন তো এ

www.e-ilm.weebly.com

কাজে এতই ব্যস্ত থাকলেন যে, আসরের নামাজ কাযা হবার উপক্রম হলো। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট অভিযোগ করলেন, হে আল্লাহর রসূল- আজ তো কাফেররা নামাজ পড়ার সময় পর্যন্ত দিল না। মহানবী (সঃ) বললেন- আমিও আজ এখনও নামাজ পড়ি নাই।

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যখন সন্ধির শর্তাবলী লেখা হচ্ছিল, তখন সেগুলোর মধ্যে একটি শর্ত এ-ও ছিল যে, "সন্ধিকালে কুরাইশদের কোন লোক মুসলমানদের নিকট চলে গেলে মুসলমানরা তাকে ফেরত দেবে। কিন্তু মুসলমানদের কোন ব্যক্তি কুরাইশদের নিকট চলে এলে তারা তাকে আটকে রাখতে পারবে।" হযরত ফারূক (রাঃ) এ শর্ত মেনে নিতে পারলেন না। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি যেহেতু আল্লাহর সত্য নবী, তাহলে আমরা এ শর্ত মেনে নিয়ে নিজেদের ধর্মকে অপমানিত করব কেন? মহানবী (সঃ) জবাব দিলেন- হে উমর, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর সত্য নবী। কিন্তু যা কিছু করছি তাও আল্লাহর হুকুমেই করছি। হযরত উমর (রাঃ) এর এ কথোপকথন যদিও সম্পূর্ণ দীনি মর্যাদাবোদের ভিত্তিতে হয়েছিল, তথাপি এর রূপটা নবীর সম্মানের পরিপন্থী ছিল। সেজন্য পরবর্তীতে তিনি খুব লজ্জিত হলেন এবং এর কাফফারা আদায় করেন।

মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন অত্যন্ত মর্যাদা ও প্রতিপত্তির সাথে হারাম শরীফে প্রবেশ করলেন এবং কাফেরদের জন্য সাধারণ নিরাপত্তার ঘোষণা দিলেন, তখন মানুষেরা দলে দলে ইসলামের নিরাপত্তা ও শান্তির বৃত্তে প্রবেশ করতে ভেঙ্গে পড়ল। রসূল আকরাম (সঃ) নিজে পুরুষদের বায়আত গ্রহণ করলেন এবং স্ত্রীলোকদের বায়আত গ্রহণের জন্য হযরত ফারূক (রাঃ)-কে নিজের স্থলবর্তী নিযুক্ত করলেন।

তাবুক যুদ্ধের সময় যখন মুসলমানরা অবগত হলেন যে, রোমের কায়সার মদীনা আক্রমণের ইচ্ছা করছে, তখন মুসলমানদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়ল। এদিকে অভাব এতই প্রকট ছিল যে, মুসলমানদের পেটে দেবারও কিছু ছিল না। আবার এ ছিল দুনিয়ার (তৎকালীন) একটি পরাশক্তির সাথে লড়াইয়ের সময়। রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পদশালীদের নিকট আবেদন করলেন দরিদ্র মুজাহিদদের সাহায্য করতে। এ আবেদনে সাড়া দিতে হযরত উমর ফারূক (রাঃ) নিজের অর্ধেক সম্পত্তি মহানবী (সঃ) এর চরণে এনে ফেললেন। যুদ্ধের সরঞ্জামাদি যোগাড় করে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাবূক নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে জানা গেল যে, রোমের কায়সার নিজ ইচ্ছা মুলতবী করে দিয়েছেন। অতএব কিছুদিন অবস্থান করার পর ইসলামী বাহিনী ফিরে এল।

www.e-ilm.weebly.com

নবী প্রেম

হিজরী ১১সনে যখন নবুওয়াতরবি বাহ্যিক চক্ষুর অন্তরালে চলে গেল এবং মহানবী (সঃ) এর ওফাতের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল, তখন জীবনোৎসর্গীদের দৃষ্টিতে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেল। এ সময়ে সবাই তো স্বাভাবিকভাবে কাতর হয়েছিলেন। কিন্তু হযরত উমরের অবস্থা ছিল ভিন্ন। তিনি তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ঘোষণা করলেন- যে ব্যক্তি বলবে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ওফাত হয়েছে, আমি তাঁকে জীবিত ছাড়ব না। অবশেষে হযরত আবূ বকর (রাঃ) যখন এলেন এবং তিনি কুরআনের পাঠ দ্বারা হযরত উমর (রাঃ) এর ধারণা নাকচ করে দিলেন, তখন কোন প্রকারে তিনি নিজ তলোয়ার খাপবদ্ধ করলেন।

সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এর সঙ্গ

সিদ্দীকি যুগে হযরত উমর (রাঃ) প্রথম থেকেই সিদ্দীক আকবরের পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী ছিলেন। রসূলে আকরাম (সঃ) এর ওফাতের পর খেলাফত সমস্যার গ্রন্থি তাঁর কৌশলী হস্তেই মীমাংসিত হয়। সর্বপ্রথমে তিনিই হযরত সিদ্দীক আকবরের হাতে বায়আত হন। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সিদ্দীক (রাঃ) তাঁকে উসামা বাহিনীর সাথে গমন থেকে রেখে দিয়েছিলেন যাতে তিনি খেলাফতের বিষয়াদিতে তাঁর সাহায্য করতে পারেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) যেসকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছেন তা সবই হযরত ফারুক (রাঃ) এর পরামর্শ ও সহযোগিতায় সম্পন্ন করেছেন। ইসলামী বিধানের ভিত্তি কুরআনে কারীমের সংকলন ও বিন্যাস তারই পরামর্শে কার্যকর হয়। মোকদ্দমা সমূহের মীমাংসা যা খেলাফতের দায়িত্ব সমুহের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, তা তাঁরই সাথে সম্পর্কিত ছিল।

খেলাফতকালের ঘটনাবলী

ইরাক বিজয়

হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) যখন খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ)-কে ইরাক থেকে শাম প্রেরণ করেন, তখন মুছান্না ইবনে হারিছা (রাঃ) তাঁর ভারপ্রাপ্ত হিসাবে হীরায় অবস্থান করতে থাকেন। অর্ধেক সৈন্য হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং অর্ধেক সৈন্য হযরত মুছান্না (রাঃ) এর নিকট ছিল। এ সময়েই ইরানের দরবার থেকে এক বিরাট বাহিনী হীরার দিকে পাঠানো হলো। এ বাহিনীর প্রধান ছিল হুরমুজ। বাবেলের নিকটে আরবী ও ইরানী সৈন্যদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াই হলো। যুদ্ধের ফল মুসলমানদের পক্ষে রইল। মুছান্না (রাঃ) মাদায়েন পর্যন্ত ইরানীদের ধাওয়া করলেন। অতঃপর হীরা ফিরে এলেন। (বিদায়া নিহায়া ৭খ, ১৭)

www.e-ilm.weebly.com

এখানে এসে তিনি জানতে পারলেন যে, ইরানীরা খুব জোরেশোরে মুসলমানদের উপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মুছান্না (রাঃ) বাশীর ইবনে খাসাসিয়্যাকে নিজের স্থানে রেখে নিজে ইরানী হামলার গুরুত্ব খলীফাকে অবহিত করতে মদীনা রওয়ানা হলেন।

যেদিন হযরত মুছান্না (রাঃ) মদীনা পৌঁছুলেন সেদিন ছিল হযরত সিদ্দীক আকবরের জীবনের শেষ দিন। তথাপি তিনি হযরত মুছান্না (রাঃ) কে ডেকে সঠিক অবস্থা শুনলেন- অতঃপর হযরত উমর ফারূক (রাঃ)-কে ডেকে বললেন ঃ

"হে উমর, আমার মনে হচ্ছে, আমি দুনিয়া থেকে বিদায় হচ্ছি। আমি যদি মারা যাই তাহলে তোমার প্রথম কাজ হবে এই যে, মুছান্না ইবনে হারিছার সাহায্যের জন্য মদীনা থেকে সৈন্য পাঠিয়ে দেবে। দেখো এ কাজে দেরী করবে না, এ হচ্ছে দ্বীনের সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপার।"

হযরত উমর (রাঃ) খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে সর্বপ্রথমে ইরাকের বিষয়ে মনোযোগ দিলেন। খেলাফতের বায়আত উপলক্ষে দূর দুরান্ত থেকে মুসলমানরা এসেছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) তাদের সামনে এক বক্তৃতায় ইরাকের অভিযানের গুরুত্ব বর্ণনা করলেন এবং তাদেরকে এতে শরীক হতে উৎসাহিত করলেন। ইরানের রাজদানী মাদায়েন ইরাকেই অবস্থিত ছিল। সেকারণে ইরাক জয় করা সহজ ব্যাপার ছিল না। সাধারণভাবে মুসলমানদের ধারণা ছিল হযরত খালেদ ইবনে অলীদ এর ঐশী তলোয়ারই ইরানীদের গতি ফিরিয়ে দিতে পারে। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে মুসলমান সেনানায়কগণ নীরব রইলেন এবং হযরত উমর (রাঃ) এর আহ্বানে সাড়া দিতে কারো সাহস হলো না।

কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষ যত বড়ই হোক না কেন মুসলমানরা তাকে দ্বীনি অভিযানের ভরসাস্থল মনে করবে- হযরত উমর (রাঃ) ছিলেন তার ঘোর বিরোধী। সেজন্য তিনি বক্তৃতা চালিয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে বানূ ছাকীফের প্রসিদ্ধ নেতা আবূ উবায়দ ছাকাফী উদ্দীপিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তিনি ইরাক অভিযানের দায়িত্ব স্বীকার করে নিলেন। আবূ উবায়দ ছাকাফী (রাঃ) এর পরে আরো অনেক নেতাও নিজেদের আগ্রহের কথা পেশ করলেন। কিন্তু যেহেতু প্রথম আগ্রহ আবু উবায়দ ছাকাফী (রাঃ) এর পক্ষ থেকে প্রকাশ পেয়েছিল, সেকারণে হযরত উমর (রাঃ) তাঁকেই সিপাহসালার নিযুক্ত করলেন।

হযরত উমর (রাঃ) হযরত মুছান্না ইবনে হারিছাকে তৎক্ষণাত ইরাকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করিয়ে দিলেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন আবু উবায়দ (রাঃ) এর আগমনের অপেক্ষা করেন। তিনি মুছান্না ইবনে হারিছার আবেদনে ধর্মান্তর ফিতনা থেকে তওবাকারীদেরও জিহাদে শরীক করার অনুমতি দিলেন।

www.e-ilm.weebly.com

রুস্তমের অধিনায়কত্ব

মুছান্না (রাঃ) মদীনাতে থাকতেই ইরাকের অবস্থা অতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে গেল। ঘটনা ছিল এই যে, ইরানীদের একের পর এক পরাজয় তাদের আলসে ঘুম ভেঙ্গে দিল। সকল সর্দার ও আমীর পারস্পরিক মত পার্থক্য দূর করে জাতীয় সংকটের সম্মিলিত মোকাবেলার কৌশল চিন্তা করতে লাগল। যথেষ্ট ভাবনা চিন্তা করে পুরানদুখতকে সিংহাসনে বসানো হলো এবং জ্ঞান, কৌশল, সাহস ও বীরত্বে বিশ্বখ্যাত সরদার রুস্তমকে সহকারী সম্রাট ও প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হলো। সমস্ত আমীর অঙ্গীকার করলো যে, তারা রুস্তমের আনুগত্যের বাইরে যাবেনা।

রুস্তম প্রথম কাজ এই করলেন যে, তিনি ইরাকের গ্রামগুলোতে সব দিকে হরকরা পাঠিয়ে দিলেন। তারা ধর্মীয় মর্যাদাবোধ ও জাতীয় ক্রোধের উত্তেজনা দিয়ে ইরাকের চৌধুরীদেরকে বিদ্রোহে উস্কানী দিল এবং মুছান্না (রাঃ) এর আগমনের পূর্বেই ফোরাতের তীরবর্তী এলাকা মুসলমানদের হাত থেকে বেরিয়ে গেল।

রুস্তম দ্বিতীয় কাজ এই করলেন যে, নরসী ও জাপানের নেতৃত্বে দুটি শক্তিশালী সৈন্যদল মুসলমানদের মোকাবেলা করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। নরসী ছিল কিসরার খালাতো ভাই ও ইরাকের জাগীরদার, জাপান ও ইরাকের একজন তালুকদার। জাপান নিজ বাহিনী নিয়ে নামারেক পৌছুল এবং নরসী কসকর-এ ছাউনি ফেলল। মুছান্না (রাঃ) ইরাক পৌছে এ সকল পরিস্থিতি জানতে পারলেন। কিন্তু তিনি হযরত উমর (রাঃ) এর উপদেশ মোতাবেক আবূ উবায়দ (রাঃ) এর আগমনের অপেক্ষায় রইলেন।

নামারেক যুদ্ধ

এক মাস পরে আবু উবায়দ ছাকাফী নিজ বাহিনী নিয়ে ইরাক পৌছুলেন এবং কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে জাপানের মোকাবেলার জন্য অগ্রসর হলেন। নামারেক-এ উভয় সৈন্যদলের মোকাবেলা হলো। ইরানীরা প্রাণান্তকর লড়াই করল। কিন্তু শেষে পরাজিত হলো ও পালাতে লাগলো। বাহিনীপ্রধান স্বয়ং জাপানকে জনৈক মুসলমান সৈন্য গ্রেফতার করে ফেলল। এ সৈন্য জাপানকে চিনত না। জাপান বলল, তুমি আমাকে কি করবে, আমি এক বুড়ো সৈন্য। তুমি যদি আমাকে ছেড়ে দাও, তাহলে আমি যথেষ্ট বিনিময় দেব। মুসলমান সৈন্যটি মেনে নিলো। জাপান বলল, আচ্ছা, এ বিষয়টির মজবুতি তোমাদের অধিনায়কের সামনে হওয়া দরকার। আমাকে তাঁর সামনে নিয়ে চলো। জাপানকে আবু উবায়দ (রাঃ) তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হলে তাকে সনাক্ত করা হলো। কোন কোন মুসলমান

বললেন, এ ব্যক্তি প্রতারণা করে নিজের জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। অতএব, এ চুক্তি বাতিল করে দেয়া হোক। কিন্তু বাহিনীপ্রধান হযরত আবু উবায়দ ছাকাফী (রাঃ) বললেন- তা হতে পারে না। একজন মুসলমান যখন নিরাপত্তা দিয়েছে, সকলকে তা মেনে নেওয়া আবশ্যক। ইসলামে ওয়াদাভঙ্গের কোন সুযোগ নেই। জাপানকে ছেড়ে দেয়া হলো। (মুহাজারাতে খাজারী পৃ. ৩০০)

কসকর যুদ্ধ

এ বিজয়ের পর আবূ উবায়দ (রাঃ) কসকরের দিকে রওয়ানা হলেন। এখানে নরসী ছাউনি ফেলেছিল। জাপানের অবশিষ্ট লোকেরাই নরসীর বাহিনীতে শামিল হয়েছিল। সাকাতিয়া নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মোকাবেলা হলো। ইরানীরা বীরত্বের সাথে লড়াই করল। কিন্তু তথাপি পরাজিত হলো এবং পালাতে শুরু করল। আবু উবায়দ (রাঃ) সাকাতিয়ায় অবস্থান করলেন এবং কতিপয় ছোট ছোট সৈন্যদল বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দিলেন- তারা ইরানী সৈন্যরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছে সেখান থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করবে।

ইসলামের সাম্য

এ বিজয়ের খুব ভাল প্রতিক্রিয়া হলো। পার্শ্ববর্তী এলাকার রাজা আনুগত্য প্রকাশের জন্য আবু উবায়দ (রাঃ) এর নিকটে উপস্থিত হলো এবং নিষ্ঠা প্রকাশের লক্ষ্যে হযরত আবু উবায়দ (রাঃ) এর জন্য উন্নতমানের খাবার তৈরী করে সাথে নিয়ে এলো। আবু উবায়দ (রাঃ) প্রশ্ন করলেন- এ খাবার কি সকল সৈন্যের জন্য না শুধু আমার জন্য? রাজা জবাব দিল- অল্প সময়ে সকল সৈন্যের জন্য খাবার তৈরী করা কঠিন ছিল। এ শুধুমাত্র আপনার জন্য। আবু উবায়দ (রাঃ) বললেন- যে সব লোক রক্ত বহাতে আবু উবায়দ (রাঃ) এর সাথী, খাবারের স্বাদ উপভোগে তারা পৃথক হতে পারে না। আবু উবায়দ তা-ই আহার করবে যা একজন সাধারণ সৈন্য করবে। (মুহাজারাতে খাজারী পৃ. ৩০১)

মারওয়াহা যুদ্ধ

এ সকল পরাজয়ের সংবাদ রুস্তমের নিকট পৌঁছুলে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। প্রসিদ্ধ ইরানী সরদার বাহমন জাদাওয়হের নেতৃত্বে তিনি আরো একটি বিশাল সৈন্যদল মোকাবেলার জন্য পাঠালেন। এ বাহিনীর বরকতের জন্য দরফশ কাদিয়ানীও দান করা হলো। দরফশ কাদিয়ানী ছিল ইরানের প্রাচীন জাতীয় পতাকা যা ফেরীদুনের স্মৃতিবাহীরূপে চলে আসছিল এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বরকতলাভের জন্য ব্যবহার করা হতো।

আবু উবায়দ (রাঃ) বাহমনের আগমনের সংবাদ পেয়ে মোকাবেলার জন্য অগ্রসর হলেন। কুফার নিকটবর্তী ফোরাতের তীরে মারওয়াহা নামক স্থানে

www.e-ilm.weebly.com

দুপক্ষের সৈন্য মুখোমুখি হল। দুদলের মধ্যে অন্তরায় ছিল ফোরাত নদী। হযরত আবু উবায়দ (রাঃ) এর নিকট বাহমনের বার্তা এলো যে, নদী পার হয়ে তোমরা আসবে না আমরা তোমাদের দিকে আসব? আবু উবায়দ (রাঃ) অন্য সেনানায়কদের রায়ের বিপরীতে উত্তেজনার সাথে জবাব দিলেন 'আমরাই আসব।'

নদীতে নৌকার সেতু স্থাপন করা হলো এবং মুসলমানরা নদী পার হয়ে বাহমনের সৈন্যদের মোকাবেলায় গিয়ে পৌঁছুলেন। এখানকার স্থান ছিল অসমতল এবং ইসলামী সৈন্যদের শৃংখলার সাথে দাঁড়ানোর উপায় ছিল না। এদিকে ইরানী বাহিনীর সম্মুখভাগে পাহাড়সদৃশ হাতির উপর তীরন্দাজ দাঁড়ানো ছিল। তাদের গলায় ঘন্টা বাজছিল খুব জোরে।

অপরিণামদর্শী সাহস

আরবী ঘোড়া এ সকল কালো দৈত্য কখনও দেখেনি। তাই প্রথম বারের মত দেখে ভড়কে গেল। আবু উবায়দ (রাঃ) এ অবস্থা দেখে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লেন এবং নিজ সাথীদের উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করে বললেন- বাহাদুরেরা, পদাতিক হয়ে যাও এবং হাওদাগুলোর রশি কেটে আরোহীদের নিচে ফেলে দাও। নেতার আওয়াজে সকল আরোহী ঘোড়ার উপর থেকে নেমে এলেন এবং শত শত হস্তিআরোহীকে নীচে ফেলে হত্যা করে ফেললেন। কিন্তু বড় মুসিবত দাঁড়াল এই যে, হাতিটি যেদিকে ফিরে পড়ছিল সেদিকে কাতারের পর কাতার উল্টে দিচ্ছিল। মুসলমানরা পরিণাম না ভেবে হাতিগুলোর সাথে মল্লযুদ্ধ শুরু করে দিলেন। হযরত আবু উবায়দ (রাঃ) মাতাল সাদা হাতীর উপর হামলা করলেন। এর শুঁড় মস্তক থেকে পৃথক করে দিলেন হাতী অগ্রসর হয়ে তাঁকে আছাড় দিয়ে ফেলল এবং বুকের উপর পা রেখে হাড্ডি চূর্ণ করে দিল। আবু উবায়দ (রাঃ) এর শাহাদাতের পর তাঁর ভাই হাকাম হাতীর উপর হামলা করলেন। তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। এভাবে একের পর এক তাঁর পরিবারের সাত ব্যক্তি হাতীর উপর হামলা করে শহীদ হয়ে গেলেন।

এখন ইসলামী সৈন্যদের মধ্যে নৈরাশ্য ও দুশ্চিন্তা ছড়াতে লাগল। সৈন্যদের মধ্যে যেন পলায়ন শুরু না হয় এই চিন্তায় বনু ছাকীফের জনৈক যুবক নদীর সেতু কেটে দিলেন। এখন যেসকল মুসলমান হটে এসে নদীর নিকটে এসে সেতু পেলেন না, তারা দিশেহারা অবস্থায় নদীতে পড়লেন আর ডুবে গেলেন।

বর্তমান সেনানায়ক হযরত মুছান্না এ অবস্থা দেখে নতুনভাবে সেতু স্থাপনের ব্যবস্থা করলেন এবং সেতু স্থাপন পর্যন্ত নিজের সাথীদের নিয়ে দুশমনের সামনে সিকান্দরী প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরেও হিসাব করে দেখা গেল যে,

www.e-ilm.weebly.com

নয় হাজারের মধ্য থেকে তিন হাজার মুসলমান বাকী রইলেন। এ ঘটনা ঘটে শাবান ১৩ হিজরীতে। এ ঘটনাটিকে সেতুর ঘটনা নামে স্মরণ করা হয়ে থাকে। (বিদায়া নিহায়া ৭খ. ২৮)

বুওয়ব যুদ্ধ

এ পরাজয়ের খবর হযরত উমর (রাঃ) পেয়ে খুব ব্যথিত হলেন। মুছান্না (রাঃ) এর নিকট তখন খুব স্বল্প সংখ্যক সৈন্য রয়ে গিয়েছিল। হযরত উমর (রাঃ) আরবের বিভিন্ন গোত্রের সর্দারের নেতৃত্বে তাঁর নিকট সাহায্য সৈন্যদল পাঠালেন। এ সকল সৈন্যদের মধ্যে বনু বাজীলার প্রসিদ্ধ সরদার জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রাঃ) ও শামিল ছিলেন।

রুস্তম মুসলমানদের মোকাবেলা করার জন্য মিহরান ইবনে মাহরাওয়হকে মনোনীত করলেন। এ সর্দার পূর্বে আরবে ছিলেন এবং আরবদের যুদ্ধ পদ্ধতি সম্পর্কে খুব অবগত ছিলেন। মিহরানের বাহিনীতে বারো হাজার বিশেষ বাহিনীর সৈন্য ছিল। এদেরকে দরবারের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে পাঠানো হয়েছিল। কুফার নিকটবর্তী বুওয়ব নামক স্থানে উভয় বাহিনী তাবু ফেলল। দুপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে ফোরাত নদী ছিল অন্তরায়। মিহরান মুছান্না (রাঃ)-কে প্রশ্ন করল, নদী পার হয়ে আমরা আসব না তোমরা আসবে? সেতুর ঘটনার ভুলের কথা হযরত মুছান্নার স্মরণ ছিল। তিনি বলে পাঠালেন- তোমরাই এস।

ইরানী সৈন্য নদী পার হয়ে খুবই হুড়মুড় করে মুসলমানদের মোকাবেলায় এল। মুসলমানরাও খালেদী পদ্ধতি মোতাবেক কাতারবন্দী হলেন।

তাগলাব যুবক

ইসলামী বাহিনীর নিয়ম ছিল সিপাহসালার তিনবার তাকবীর বলতেন। প্রথম তাকবীরে সৈন্যরা হাতিয়ার সামলে নিত, দ্বিতীয় তাকবীরে হাতিয়ার উঠিয়ে নিত এবং তৃতীয় তাকবীরে হামলা করত মুছান্না (রাঃ) দেখলেন যে, দ্বিতীয় তাকবীরেই কতিপয় ব্যক্তি কাতার থেকে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি রাগতঃ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? জবাব পাওয়া গেল- এরা তারা যারা পূর্বের লড়াইয়ে দৃঢ়পদ থাকতে পারেনি। আজ শহীদ হয়ে নিজেদের গুনাহের কাফফারা আদায় করতে চাইছে। মুছান্না (রাঃ) বললেন- ভাইয়েরা আমার, অনর্থক জীবন দান করবে না। দুশমনের সাথে মোকাবেলার সময় মনের সাহস প্রকাশ করবে। (মুহাজারাত ১খ. ৩০৩)

অবশেষে লড়াই শুরু হলো। এ যুদ্ধ ছিল খুব ভয়ানক। কারণ শত্রু সংখ্যা ছিল প্রচুর বেশী। তথাপি মুসলমানরা দৃঢ়তার সাথে লড়াই করলেন এবং

www.e-ilm.weebly.com

বাহিনীর কালব (কেন্দ্রীয় গ্রুপ) সম্পূর্ণ নাশ করে দিলেন। তাগলাব গোত্রের এক যুবক মিহরানকে দেখে নিলেন। তারপর তলোয়ার নিয়ে তার উপর হামলা করলেন এবং তার ঘাড় থেকে মাথা পৃথক করে দিলেন। অতঃপর চিৎকার করে বললেন- 'আমি তাগলাব যুবক অনারব সেনানায়কের হত্যাকারী।'

মিহরান নিহত হতেই ইরানী সৈন্যদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। সৈন্যরা দিশেহারা হয়ে নদীর দিকে পালাতে লাগল। মুছান্না (রাঃ) অগ্রসর হয়ে নদীর সেতু কেটে দিলেন এবং অসংখ্য ইরানীকে মৃত্যুর ঘাটে নামিয়ে দিলেন। অনুমান করা হয় যে, এ যুদ্ধে এক লাখ ইরানী নিহত হয়। ইরানীদের অন্তরে আরবদের ভয় জমে গেল। এ যুদ্ধে কয়েকটি আরব খৃষ্টান গোত্রও অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মুসলমানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল।

এ যুদ্ধ থেকে অবসর হয়ে মুছান্না (রাঃ) বিভিন্ন দিকে সৈন্যদল পাঠালেন। এসব সৈন্যদল পুরো ইরাক জয় করে নেয় এবং ফোরাতের পশ্চিম তীরে ইরানীদের কর্তৃত্ব বাকী রইল না।

ইরানের সিংহাসনে য়াজদগারদ

মুসলমানদের এ সকল বিজয়ের সংবাদ মাদায়েন পৌঁছুলে সাম্রাজ্যের কর্তাব্যক্তিরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। সবাই একত্রিত হয়ে পরামর্শ করল যে, স্ত্রীলোককে সিংহাসন থেকে নামিয়ে কোন পুরুষকে বসানো উচিত এবং রুস্তম ও ফিরোজের দ্বন্দ্ব নিরসন হওয়া প্রয়োজন। অতএব খুব অনুসন্ধান করে শাহরিয়ার ইবনে কিসরার বংশধরদের মধ্য থেকে য়াজদগারদ নামের এক শাহজাদাকে সিংহাসনে বসানো হলো। রুস্তম ও ফিরোজ অঙ্গীকার করল যে, আমরা এখন একাত্ম হয়ে দুশমনের মোকাবেলা করব এবং নিজেদের সকল মতপার্থক্য ভুলে যাব।

য়াজদগারদ ছিলেন একুশ বছরের এক তেজোদীপ্ত যুবক। তিনি নিজ সেনাবাহিনীকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করলেন। সীমান্ত চৌকি ও দুর্গগুলোকে শক্তিশালী করলেন। এভাবে ইরানী সাম্রাজ্যে নতুন জীবন এল এবং ইরাকের বিজিত এলাকাসমূহ পুনরায় মুসলমানদের হাত থেকে বের হয়ে গেল।

এ খবর হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট এলে তিনি মুছান্না (রাঃ)-কে নির্দেশ পাঠালেন যে, সবদিক থেকে গুছিয়ে আরবের সীমান্তের দিকে চলে আসুন। সেমতে মুছান্না (রাঃ) যীকার নামক স্থানে এসে অবস্থান করতে লাগলেন।

www.e-ilm.weebly.com

কাদেসিয়্যা যুদ্ধ

হযরত উমর (রাঃ) অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে ইরানীদের মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করলেন। তিনি আরবের আমেলদের নিকট এ মর্মে আদেশ পাঠালেন যে, কোথাও কোন বীর সর্দার, সচেতন কুশলী জাদুবাক কবি ও বাগ্মী থাকলে খেলাফত দরবারে হাজির হোক। হযরত উমর (রাঃ) এর এ আদেশ পেয়েই মানুষ দলে দলে খেলাফতালয়ের প্রতি রওয়ানা হলো এবং মদীনার চতুর্দিকে সৈন্যের অরণ্য দেখা যেতে লাগল।

হযরত উমর (রাঃ), তালহা (রাঃ), জুবায়ের (রাঃ), আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) প্রমুখ নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামকে বাহিনীর বিভিন্ন অংশের সরদার নিযুক্ত করলেন এবং নিজে সর্বাধিনায়ক হয়ে মদীনা থেকে বের হলেন।

মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে একটি স্থান সিরাব। সেখানে পৌঁছে তিনি যাত্রাবিরতি করলেন এবং নিজের যাওয়া না যাওয়ার বিষয়ে মতামত নিলেন। সাধারণ লোকদের ইচ্ছা ছিল হযরত উমর (রাঃ) নিজে চলুন। কিন্তু আহলুর রায় সাহাবায়ে কেরাম এতে দ্বিমত প্রকাশ করলেন। তাঁরা আরজ করলেন- হে আমীরুল মুমিনীন, যুদ্ধে জয় পরাজয় দুটোই হয়। আপনার উপস্থিতিতে যদি সৈন্যদের পরাজয় হয়, তাহলে ইসলামের শক্তির শেষই মনে করবেন। হযরত উমর (রাঃ) নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামের সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করলেন এবং তাঁদেরই পরামর্শে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর মামা হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)-কে নিজের স্থলে সর্বাধিনায়ক মনোনীত করে নিজে মদীনা ফিরে এলেন।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এ বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে যরোদ (কূফার নিকটবর্তী) নামক স্থানে পৌঁছুলেন এবং হযরত উমর (রাঃ) এর আদেশ মোতাবেক সেখানে অবস্থান করলেন। এখানে এসে তিনি জানতে পারলেন যে, মুছান্না (রাঃ), যিনি যীকর–এ তাঁদের অপেক্ষায় অবস্থান করছিলেন, ইন্তেকাল করেছেন। মুছান্না (রাঃ) মারওয়াহা যুদ্ধে মারাত্মক জখম হয়েছিলেন। তাঁর সে সকল জখম দিনদিন খারাপের দিকে যেতে লাগল এবং অবশেষে তিনি চিরস্থায়ী দেশের পথিক হলেন।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) যরোদ থেকে অগ্রসর হয়ে শারাফ পৌঁছুলেন এবং সেখানে অবস্থান নিলেন। সেখানে হযরত মুছান্না (রাঃ) এর ভাই মুয়ান্না নিজের আট হাজার সৈন্য নিয়ে এসে তাঁর সাথে মিলিত হলেন। হযরত মুছান্না (রাঃ) ইন্তেকালের পূর্বে যুদ্ধ সম্পর্কে যে সকল পরামর্শ দিয়ে গিয়েছিলেন তা তিনি হযরত সা'দ (রাঃ) এর নিকট বর্ণনা করলেন।

www.e-ilm.weebly.com

এখানে হযরত সা'দ (রাঃ) এর নিকট হযরত উমর (রাঃ) এর ফরমান এলো। এতে সৈন্যের বিন্যাস ও শৃংখলা সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা ছিল। এ নির্দেশনা মোতাবেক হযরত সা'দ (রাঃ) প্রথমে সকল সৈন্য গণনা করালেন। মোট সৈন্য ছিল ত্রিশহাজার। তারপর তা ডান, বাম, কেন্দ্রীয়, পশ্চাদ, ভ্রাম্যমাণ ও রিজার্ভ অংশে বিভক্ত করলেন এবং প্রতিটি অংশের জন্য পৃথক পৃথক অফিসার নিযুক্ত করলেন। এ বাহিনীর গুরুত্ব এ থেকে অনুমান করা যায় যে, এর নেতৃবৃন্দের মধ্যে সত্তরজন এমন সাহাবী ছিলেন যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনশত ছিলেন বায়আতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী এবং তিনশত ছিলেন মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণকারী।

হযরত সা'দ (রাঃ) শরাফে থাকতেই হযরত উমর (রাঃ) এর দ্বিতীয় ফরমান এলো। এতে লেখা ছিল যে, কাদেসিয়্যা গিয়ে ছাউনি ফেলুন এবং এমনভাবে মোর্চা স্থাপন করবেন যে, সামনে থাকবে অনারব ভূমি এবং পিছনে আরবের পাহাড়। যদি বিজয় লাভ হয় তাহলে অগ্রসর হতে পারবে, আর যদি পরাজয় ঘটে তাহলে পাহাড়ে আশ্রয় নিতে পারবে। মুছান্না (রাঃ)ও তার অসিয়তে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন।

সা'দ (রাঃ) শরাফ থেকে রওয়ানা হয়ে কাদেসিয়্যা পৌছুলেন। কাদেসিয়্যা ছিল কূফার পথে উনচল্লিশ মাইল দূরে এক সবুজ শ্যামল স্থান। হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট থেকে অবিরাম নির্দেশনা আসতে লাগল। এখানে পৌছুনোর পর আবার ফরমান এলো যে, কাদেসিয়্যা ও আশপাশ এলাকার পুরো নকশা তৈরী করে পাঠান এবং এ-ও জেনে নিয়ে লিখুন যে, ইরানীদের পক্ষ থেকে কোন সর্দার মোকাবেলার জন্য নিযুক্ত হয়েছে, সে কোথায় অবস্থান করছে।

সা'দ (রাঃ) কাদেসিয়্যার পুরো নকশা তৈরী করে হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট পাঠালেন এবং লিখলেন যে, ইরানী সিপাহসালার রুস্তম স্বয়ং মোকাবেলার জন্য আসছে এবং মাদায়েন থেকে অগ্রসর হয়ে সাবাত এসে অবস্থান করছে।

ইরান দরবারে ইসলামী দূত

খেলাফত দরবার থেকে ফরমান এলো যে, যুদ্ধের পূর্বে কিসরার দরবারে কয়েকজন সম্মানিত প্রাজ্ঞ মুসলমানকে দূত করে পাঠান এবং ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে চুক্তির শর্তাবলী পেশ করুন। সা'দ (রাঃ) চৌদ্দজন গোত্রনেতাকে নির্বাচন করে মাদায়েনে ইরানের শাহেনশাহের দরবারে পাঠালেন। ইরানের শাহেনশাহ ইসলামী দূতের আগমনের সংবাদ শুনে নিজ দরবার খুব আড়ম্বরে সাজালেন। এ দূতগণ য়ামানী চাদর কাঁধে ফেলে, চামড়ার মোজা পরিধান করে এবং ছড়ি হাতে এমন নির্ভীক ভাবে দরবারে প্রবেশ করলেন যে, দরবারের লোকজন ভীত হয়ে পড়ল এবং শাহেনশাহ তাদের সাহসে হয়রান হয়ে গেল।

www.e-ilm.weebly.com

যাই হোক, দোভাষীর মাধ্যমে আলাপ আলোচনা শুরু হল। য়াজদগারদ প্রশ্ন করলেন, বলুন, আপনারা আমাদের দেশে কেন এলেন? প্রতিনিধি দলের নেতা নু'মান ইবনে মুকাররিন অগ্রসর হলেন এবং নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করলেন।

তিনি বললেন- হে বাদশাহ, কিছুদিন পূর্বে আমরা ছিলাম অসভ্য, অশিক্ষিত। কিন্তু আল্লাহ আমাদের উপর বড়ই অনুগ্রহ করলেন। তিনি আমাদের হেদায়েতের জন্য একজন মকবূল রসূল পাঠালেন। আল্লাহর এই পূণ্যবান রসূল আমাদেরকে সত্যপথ দেখালেন। তিনি কল্যাণের পথে আহ্বান জানালেন এবং অন্যায় থেকে নিবৃত্ত করলেন। তিনি অঙ্গীকার করেছেন যে, যদি আমরা তাঁর দাওয়াত কবূল করি, তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতরে সাফল্য আমাদের পদচুম্বন করবে।

আমরা তাঁর দাওয়াত কবূল করে নিয়েছি। তারপর তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন, আমরা যেন এ দাওয়াত সেসব জাতির নিকট পৌছে দিই যারা আমাদের প্রতিবেশী এলাকায় বসবাস করছে এবং তাদের যেন জানিয়ে দিই যে, 'ইসলাম' নামে অভিহিত এ দাওয়াতই সকল কল্যাণের ভিত্তি এবং সত্যকে সত্য ও মিথ্যাকে মিথ্যারূপে পেশ করে। অতএব, হে ইরানের কর্তাবৃন্দ, আমরা আপনাদেরকে এই পবিত্র ধর্মে আহ্বান জানাচ্ছি। আপনারা যদি এ আহ্বান কবুল করেন, তাহলে আপনাদের উত্যক্ত করার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। আমরা আল্লাহর কিতাব আপনাদের নিকট বুঝিয়ে দেব। তা-ই আপনাদের পথনির্দেশক হবে এবং এর বিধানাবলী অনুসরণ করা আপনাদের জন্য অত্যাবশ্যক হবে। কিন্তু যদি এ দাওয়াত কবূল করতে আপনাদের অমত থাকে, তাহলে আপনাদেরকে জিযিয়া আদায় করে আমাদের কর্তৃত্ব মেনে নিতে হবে এবং এ ওয়াদা করতে হবে যে, আপনাদের সাম্রাজ্যে অত্যাচার হবে না, অপকর্ম মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে না। আর যদি আপনাদের নিকট এ-ও স্বীকার্য না হয় তাহলে তলোয়ার আপনাদের ও আমাদের মধ্যে ফয়সালা করবে।"

য়াজদগারদ অবাক হয়ে এ বক্তব্য শুনছিলেন। বক্তব্য শেষ হলে তিনি প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সম্বোধন করে বললেন–

'হে আরব জাতি, সারা দুনিয়ায় আপনাদের চেয়ে হতভাগা ও দুর্দশাগ্রস্থ দ্বিতীয় কোন জাতি ছিল না। আমরা যদি একটি উট জবাই করে ক্ষুধার্ত মাতাল আপনাদের মেহমানদারী করতাম, তাহলে আপনারা সন্তুষ্ট হয়ে যেতেন এবং আপনাদের সকল চিৎকার গোলমাল ঠাণ্ডা হয়ে যেত। আপনারা যখন কিছু হাত পা বাড়াতেন, তখন আমরা সীমান্তের সর্দারদের লিখে পাঠাতাম, তারা আপনাদেরকে শায়েস্তা করে দিতো। দেখুন, আমি আপনাদের পরামর্শ দিচ্ছি যে, রাজত্ব করার এ উম্মাদনা নিজেদের মস্তিষ্ক থেকে বের করে ফেলুন। হ্যাঁ যদি

www.e-ilm.weebly.com

জীবন যাপনের প্রয়োজনাদি আপনাদেরকে এ পদক্ষেপে উদ্বুদ্ধ করে থাকে, তাহলে আমরা আপনাদের আহার্য পানীয়ের বন্দোবস্ত করব, আপনাদের পোশাকেরও ব্যবস্থা করব। আর আপনাদের জন্য এমন একজন বাদশাহ নিযুক্ত করে দেব যিনি আপনাদের সাথে নমনীয় ব্যবহার করবেন'।

য়াজদগারদ–এর বক্তব্যের জবাব দেবার জন্য মুগীরা ইবনে জুরারাহ এগিয়ে গেলেন এবং তিনি বললেন-

"হে বাদশাহ, নিঃসন্দেহে আমরা এমনই দুর্ভাগা ও দুর্দশাগ্রস্থ ছিলাম যেমনটি আপনি বললেন। বরং তার চেয়েও খারাপ। আমরা মৃত জন্তু খেতাম। পশম ও চামড়া আমাদের পোশাক ছিল, আর মাটি ছিল আমাদের বিছানা। কিন্তু ঘটনা এই যে, আমাদের মধ্যে আল্লাহর মকবুল রাসূল প্রেরিত হলেন, যিনি ছিলেন বংশ পরিচয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ, শানশওকতে সর্বোচ্চ এবং সচ্চরিত্রে নজীরবিহীন। তিনি আমাদের রূপ বদলে দিলেন। তাঁর অলৌকিক শিক্ষায় আমরা সারা দুনিয়ার পথপ্রদর্শক হয়েছি এবং বর্তমানে অবস্থা এই যে, আপনার মত অহংকারী বাদশাহও আমাদের সম্মান ও প্রতিপত্তির ভয় পান।

হে বাদশাহ, এখন বেশী যুক্তি কৌশলের কোন অর্থ হয় না। হয়তো সে মকবূল রসূলের দাওয়াত কবূল করুন এবং মহাসৌভাগ্যের সামনে মাথা নত করুন, নতইবনে জিযিয়া আদায় করতে সম্মত হোন। দুটিই অগ্রাহ্য হলে তলোয়ারের ফয়সালার অপেক্ষা করুন'।

মুগীরা (রাঃ) এর এ বক্তব্যে বাদশাহ খুব ক্রুদ্ধ হলেন এবং উত্তেজিত হয়ে বললেন, দূতদের হত্যা করা যদি আন্তর্জাতিক নিয়মের পরিপন্থী না হত তাহলে আপনাদেরকে হত্যা করাতাম। আচ্ছা যান, আমি আপনাদের মোকাবেলার জন্য রুস্তমকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তিনি আপনাদেরকে এবং আপনাদের সাথীদেরকে কাদেসিয়্যার গর্তে দাফন করে দেবেন। এরপর তিনি মাটির একটি ঝুঁড়ি চাইলেন এবং দূতদের জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন কে? আসেম ইবনে উমার বললেন- আমি। য়াজদগারদ আদেশ করলেন এ ঝুঁড়িটি ঐ ব্যক্তির মাথায় রেখে দেয়া হোক। আসেম নিজ সাথীদের সাথে ঘোড়া ছুটিয়ে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এর নিকট এলেন এবং বললেন- বিজয় কল্যাণকর হোক। দুশমন নিজেই নিজের মাটি আমাদের সোপর্দ করেছে।

রুস্তম সাবাতে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে তিনি এক লাখ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং কাদেসিয়্যা পৌছে তাঁবু ফেললেন। তিনি মুসলমানদের প্রতি এতই ভীত হয়েছিলেন যে, যুদ্ধ করতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু ইরানের দরবার থেকে যুদ্ধের অবিরাম নির্দেশ আসছিল। তথাপি কয়েক মাস তিনি টালবাহানা করছিলেন এবং এ সময়ে দুপক্ষের দূতেরা একে অপরের শিবিরে আসা যাওয়া করলেন।

www.e-ilm.weebly.com

শেষবারে মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) দূত হয়ে রুস্তমের শিবিরে গমন করেন। রুস্তম মুসলমান দূতকে সন্ত্রস্থ করার জন্য নিজের তাঁবু খুব জাঁকজমকপূর্ণ করে সাজালেন। রেশমের অতিমূল্যবান ফরাশ মাটিতে বিছালেন এবং স্বর্ণখচিত পর্দা দেয়ালে টানালেন। দরবারের মাঝখানে স্বর্ণের সিংহাসনে মনি মুক্তার মুকুট মাথায় পরে রুস্তম অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে বসে ছিলেন। দু পাশে দরবারীরা স্বর্ণের প্রলেপযুক্ত মুকুট পরে নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী বসেছিল। মুগীরা (রাঃ) ঘোড়া থেকে নেমে সোজা সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হলেন এবং নির্ভীক ভাবে রুস্তমের হাঁটুর সাথে হাঁটু মিশিয়ে বসে গেলেন। মুগীরা (রাঃ) এর এ সাহসে দরবারের সবাই হতচকিত হয়ে গেল। পাহারাদার এগিয়ে এলো এবং মুগীরা (রাঃ)-কে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিল।

মুগীরা (রাঃ) বললেন হে ইরানের নেতৃবৃন্দ, আমরা তো আপনাদেরকে জ্ঞানী মনে করতাম। কিন্তু আপনারা তো বড়ই নির্বোধ সাব্যস্ত হলেন। আমরা মুসলমানরা বান্দাদের প্রভু করি না এবং দুর্বলদের জন্য শক্তিশালীদের প্রভুত্ব স্বীকার করি না। আমাদের ধারণা ছিল না যে, আপনাদের এখানে দুর্বলরা শক্তিশালীদের পূজা করে এবং তাদেরকে দেবতা বানিয়ে উঁচু স্থানে বসায়। মানবীয় সাম্যের নীতি আপনাদের নিকট স্বীকৃত নয়। এ যদি আমার পূর্বে জানা থাকত, তাহলে আমি কখনই এখানে আসতাম না। আচ্ছা এখন তো এসে গিয়েছি, তবে আপনাদের বলে দিচ্ছি, সাম্রাজ্য টিকে থাকার লক্ষণ এ নয়। অধীনস্থদের স্বস্তি আপনাদের সিংহাসন উল্টিয়ে দেবে।

মুগীরা (রাঃ) এর মুখে এসব শব্দ শুনে কানাঘুষা শুরু হয়ে গেল। নিম্নস্তরের লোকেরা বলল- খোদার শপথ, এ আরব সত্য কথা বলেছে। সর্দার বলল- এ ব্যক্তি আমাদের প্রজাকে বিদ্রোহে উস্কানি দিল। যারা এ জাতিকে তুচ্ছজ্ঞান করে তারা বড়ই নির্বোধ। (মুহাজারাত ৩১৪)

যুদ্ধ শুরু

এ কথাবার্তার পর বার্তা ও শুভেচ্ছা আদান প্রদানের ধারা বন্ধ হয়ে গেল। মুহাররম হিজরী ১৪-এ উভয় সৈন্যদল মুখোমুখি কাতারবন্দী হলো। ইরানী সৈন্যরা খুব আড়ম্বরের সাথে তের কাতারে দাঁড়িয়েছিল। কেন্দ্র, ডান ও বাম বাহিনীর পিছনে হাতির সারি বাঁধা ছিল। সংবাদ পৌছানোর জন্য কাদেসিয়্যা থেকে মাদায়েন পর্যন্ত কিছুদূর অন্তর অন্তর সংবাদবাহী বসানো হলো। এভাবে প্রতি মুহূর্তের খবর শাহী দরবারে পৌছে যেতে লাগল। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বাতের ব্যথায় আক্রান্ত হওয়ায় নিজে ময়দানে ছিলেন না। যুদ্ধ

ময়দানের নিকট এক পুরাতন ভবন ছিল। তিনি এর ছাদের উপর গিয়ে বসে নির্দেশনা দিতে লাগলেন। খালেদ ইবনে উরফুতা (রাঃ) তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী সৈন্যদের কমাণ্ড দিতে লাগলেন। ইসলামী বাহিনীর পিছনে ছিল পরিখা এবং ইরানী বাহিনীর পিছনে ছিল আতীক নদী। এ দুয়ের মাঝখানে যুদ্ধ ময়দান।

আরমাছ দিবস (স্তূপ দিবস)

জুহর নামাজের পর ইসলামী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) তিনবার তাকবীর দিলেন। দুদিক থেকে অভিজ্ঞ বাহাদুররা মোকাবেলার জন্য এগিয়ে এলো এবং উত্তেজক কবিতা পাঠ করতে করতে বীরত্বের পুরস্কার পেশ করছিল। চতুর্থ তাকবীরে নিয়মানুযায়ী সাধারণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বনু বাজীলার সেনাদল হাতীর আক্রমণে পড়ে গেল। তাদের ঘোড়া হাতীর আকৃতি দেখে ভড়কে যেতে লাগল। মুসলমানদের জন্য এই বালাই খুব মুসিবতের কারণে হয়ে দাঁড়াল। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বনূ আসাদকে আদেশ করলেন বনূ বাজীলার সাহায্য করতে। বনূ আসাদ বর্শা নিয়ে হাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইরানীরা বাজীলাদের ছেড়ে বনূ আসাদের উপর সকল শক্তি প্রয়োগ করল। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বনূ তামীমকে বললেন, তোমরাই হাতীগুলোর কোন উপায় কর। বনূ তামীম এত তীর বর্ষণ করল যে, সকল হস্তি আরোহী মাটিতে নেমে আসতে লাগল। লড়াই কিছু রাত পর্যন্ত অব্যাহত রইল। বানূ আসাদের প্রায় পাঁচ শত জওয়ান হাতীর চাপে পিষ্ট হলো। এদিন ইরানীদের পাল্লা ভারী রইল। এদিনকে 'আরমাছ দিবস' বলা হয়।

আগওয়াছ দিবস

দ্বিতীয় দিন প্রথমে শহীদদের দাফন করা হলো এবং আহতদের ব্যাণ্ডেজ সুশ্রুষা করার জন্য মহিলাদের নিকট অর্পণ করা হলো। লড়াই শুরু হওয়ার পূর্বেই শাম থেকে সাহায্যকারী বাহিনী এসে পৌঁছুলো। এ বাহিনী হযরত উমর (রাঃ) এর নির্দেশ মোতাবেক হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) পাঠিয়েছিলেন। এর সংখ্যা ছিল ছয় হাজার এবং সিপাহসালার ছিলেন হাশেম ইবনে উতবা ইবনে আবী ওয়াক্কাস। এ বাহিনী এ কৌশলে এলো যে, একটি দল পৌঁছে গেলে পরবর্তী দলটি দৃষ্টিগোচর হত। এভাবে সারা দিন সৈন্যের আগমন ধারা অব্যাহত রইল এবং ইরানীদের উপর ত্রাস ছেয়ে গেল।

বিকালে সৈন্যরা আরেকটি কৌশল করল। তা ছিল এই যে, তারা নিজেদের উটের উপর ঝুলি ইত্যাদি বেঁধে ভয়ানক আকৃতি তৈরী করল। এ সকল উট ইরানী সৈন্যদের মধ্যে ঐ মুসিবত সৃষ্টি করল যা তাদের হাতী ইসলামী বাহিনীর মধ্যে করেছিল।

www.e-ilm.weebly.com

এদিন অর্ধরাত পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত রইল। সাহায্যকারী সৈন্যর একটি দলের সর্দার কা'কা' প্রসিদ্ধ ইরানী সর্দার বাহমনকে হত্যা করল। তাছাড়া সীস্তানের শাহজাদা শাহরিজার ও বজরচমহুর হামদানীও নিহত হলো। এদিন মুসলমানদের পাল্লা ভারী থাকল। এদিনকে আগওয়াছ দিবস বলা হয়ে থাকে।

আবু মিহজান ছাকাফী

আগওয়াছ দিবসের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। আবু মিহজান ছাকাফী ছিল একজন প্রসিদ্ধ কবি ও বীর। মদ্যপানের অপরাধে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) তাকে বন্দী করেছিলেন। সে কয়েদ খানার জানালা দিয়ে যুদ্ধের দৃশ্য দেখছিল এবং বীরত্বের উত্তেজনায় অস্থির হচ্ছিল। হযরত সা'দ (রা) এর স্ত্রী জাবরা ওদিক দিয়ে যাবার সময় সে তাঁকে বলল- আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ছেড়ে দিন। আমিও দুশমনের সাথে দুহাতে করে নিজের আফসোস বের করে ফেলব। জীবিত থাকলে নিজেই এসে বেড়ি পরে নেব। জাবরা অস্বীকার করলে সে দরদমাখা কণ্ঠে এ কবিতা পাঠ করতে লাগল ঃ

كفى حزنا ان تردى الخيل بالقنا ، واترك مسدودا على و ثاقيا

اذا قمت عنا نى الحد يد و اغلقت، مصاريح من دونى تصم المناريا

"আমার জন্য এ দুশ্চিন্তাই যথেষ্ট যে, আরোহীরা তীর চালাচ্ছে আর আমি শিকলের বন্দী অবস্থায় পরিত্যক্ত। আমি যখন উঠতে চাই, শিকল আমাকে উঠতে দেয়না এবং দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। আর চিৎকারকারী চিৎকার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায়"।

জাবরার ভয় হলো। তিনি তার পায়ের বেড়ি কেটে দিলেন। আবু মিহজান মুক্ত হয়েই বিদ্যুতের মত যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে পৌছালো এবং এমন জোরে আক্রমণ করলো যে, যেদিকে চলছিল কাতারের পর কাতার ওলট পালট করে দিচ্ছিল। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)ও হয়রান হচ্ছিলেন যে, এ বাহাদুর কে? মনে মনে বলছিলেন যে, আক্রমণের রূপ তো আবূ মিহজানের মত। কিন্তু সে তো কয়েদখানায় বন্দী। বিকালে যুদ্ধ শেষ হলে আবু মিহজান ফিরে এসে বেড়ি পরে নিল। তখন সালমা সকল ঘটনা হযরত সা'দ (রা) এর নিকট বর্ণনা করেন। সা'দ (রাঃ) তখনই তাঁকে মুক্ত করে দিলেন এবং বললেন- আল্লাহর শপথ, যে ব্যক্তি এভাবে মুসলমানদের জন্য উৎসর্গ হয়, আমি তাকে কয়েদ করতে পারি না। আবূ মিহজান বলল, তাহলে আল্লাহর শপথ, আমিও আজ থেকে শরাবে হাত দিতে পারি না। (বিদায়া নিহায়া ৭খ, ৪৪)

www.e-ilm.weebly.com

উমাস দিবস

তৃতীয় দিন প্রথমে শহীদদের দাফন করা হলো এবং আহতদের ব্যাণ্ডেজ সুশ্রুষার জন্য মহিলাদের নিকট সোপর্দ করা হলো। অতঃপর লড়াই শুরু হলো। এ দিনেও হাতীর মুসীবতের সম্মুখীন হতে হলো। সা'দ (রাঃ) দুজন নওমুসলিম ইরানীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, এ মুসিবতের প্রতিকার কি? তারা বলল- এগুলোর চোখ ও শুঁড় অকেজো করে দিতে হবে। কা'কা' ও তাঁর সাথীদের ডেকে হযরত সা'দ (রাঃ) বললেন, তোমরাই এ কাজটি সম্পন্ন করো। আবয়াজ ও আজরাব নামে দুই হাতি সকল হাতীর নেতা ছিল। কা'কা' ও আসেম একই সাথে বর্শা দিয়ে আবয়াজের চোখকে নিশানা বানালেন। হাতী আঘাত খেয়ে পিছে হটে গেল। তখন কা'কা' তলোয়ার দিয়ে এমন আঘাত করলেন যে, এর শুঁড় মাথা থেকে আলাদা হয়ে গেল। রবিল ও হামাল আজরাবের উপর আক্রমণ করলেন। সে জখম খেয়ে নদীর দিকে পারালো। অন্য হাতীগুলোও তার পিছু নিল। হাতীগুলোর এ পলায়নে ইরানীদের কাতারগুলো লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। সারারাত যুদ্ধ অব্যাহত থাকল। শুধু ঘোড়ার হ্রেষা ও তলোয়ারের খটাখট ব্যতীত আর কোন আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল না। এদিনকে উমাস দিবস এবং রাতকে হারীর রজনী বলা হয়।

যুদ্ধের সমাপ্তি

সকাল হয়ে গেল। কিন্তু যুদ্ধের কোন ফয়সালা হলো না। তখন কা'কা', কায়স, আশআছ, আমর ইবনে ম'দীকারাব ইবনে যিলবারদাইন প্রমুখ গোত্রনেতাগণ নিজেদের সাথীদের চিৎকার করে বললেন- ভাইয়েরা, মজবুত হয়ে আরেক বার হামলা করো। জয় তোমাদেরই। এ আওয়াজে মুসলমানরা ঘোড়ার উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল এবং তলোয়ার উচিয়ে দুশমনের কাতারে ঢুকে পড়ল। কায়স, 'আশআছ, আমর ইবনে ম'দীকারাব প্রমুখ নেতাগণ খুবই বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। দুপুর না গড়াতেই ইরানী বাহিনীর দুই বাহু ভেঙ্গে গেল। মুসলমানরা কেন্দ্রের উপর হামলা করল। কতিপয় মুসলমান বীর ইরানী সিপাহসালার রুস্তমের দিকে এগিয়ে গেলেন। রুস্তম আসনে বসে নিজ বাহিনীকে লড়াচ্ছিলেন। তিনি এ অবস্থা দেখে আসন থেকে লাফিয়ে পড়লেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করলেন। যখন জখমে জর্জরিত হয়ে গেলেন, তখন পালাতে গেলেন। জনৈক মুসলমান সৈন্য হিলাল ইবনে আলকামা তাকে ধাওয়া করেন এবং হত্যা করেন। অতঃপর তার আসনে উঠে চিৎকার করে বললেন- কাবার প্রভুর শপথ, আমি রুস্তমকে হত্যা করেছি।

www.e-ilm.weebly.com

রুস্তম নিহত হতেই ইরানী সৈন্যদের পলায়ন শুরু হয়ে গেল। মুসলমানরা পলায়নপর ইরানীদের ধাওয়া করে হাজার হাজার ইরানীকে তলোয়ারের নীচে স্থাপন করলেন এবং দরফশ কাদিয়ানী আয়ত্ত করে নিলেন।

কাদেসিয়্যা যুদ্ধ ইরানী যুদ্ধসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ বলে মনে করা যায়। এ যুদ্ধে ত্রিশ হাজার ইরানী নিহত হয় এবং আট হাজার মুসলমান শহীদ হন। (মুহাজারাত পৃ. ৩১৬)

দূতের পিছনে খলীফা

কাদেসিয়্যা যুদ্ধ সম্পর্কে হযরত উমর (রাঃ) এর খুব চিন্তা ছিল। তিনি প্রতিদিন সকালে মদীনা থেকে বের হয়ে এসে বসতেন এবং সংবাদ বাহকের পথ চেয়ে থাকতেন। একদিন তিনি অভ্যাসমত বসে আছেন। এমন সময়ে একজন উটারোহী দেখা গেল। হযরত উমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, কোত্থেকে এলে? সে উত্তর দিল, কাদেসিয়্যা থেকে। হযরত উমর (রাঃ) বললেন- আল্লাহর বান্দা, আমাকেও কিছু বলতো সেখানে কি হয়েছে? সংবাদবাহক বলল, আল্লাহ দুশমনকে পরাজিত করেছেন।

দূত শহরের দিকে দৌড়ে চলল। হযরত উমর (রাঃ) পিছে পিছে দৌড়াতে লাগলেন এবং তার কাছে জয়ের অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছিলেন। উভয়ে যখন শহরে প্রবেশ করলেন, তখন লোকেরা হযরত উমর (রাঃ)-কে আমীরুল মুমিনীন খেতাবে সম্বোধন করে সালাম করতে শুরু করল। এতক্ষণে দূত বুঝতে পারল যে, সওয়ারীর পিছে পিছে দৌড়রত ব্যক্তিটি হচ্ছেন স্বয়ং খলীফাতুল মুসলিমীন। সে ভয়ে কেঁপে গেল এবং বলতে লাগল- হযরত, আপনি প্রথমেই আমাকে আপনার নাম বললেন না কেন? তিনি নির্লিপ্ত ভাবে জবাব দিলেন, কোন ক্ষতি নেই। তুমি অবস্থাদি বলে যেতে থাক। যাই হোক, সে অবস্থায়ই বাড়ীতে এলেন। তারপর একটি সাধারণ সমাবেশ করে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এর সুসংবাদ পত্র শোনালেন। (ইতমাম ৮৬)

সাধারণ নিরাপত্তা

কিছুদিন পরে হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট হযরত সা'দ (রাঃ) এর আরেকটি পত্র এলো। এতে তিনি লিখেছিলেন- কাদেসিয়্যার যুদ্ধে যারা লড়াই করেছিল, তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলছে যে, তাদেরকে জোর করে লড়াইয়ে শরীক করা হয়েছে। আর কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা যুদ্ধের সময়ে নিজেদের বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এখন তারা ফিরে এসেছে। নিরাপত্তা চাইছে। এদের সম্পর্কে কি নির্দেশ? হযরত উমর (রাঃ) নেতৃস্থানীয়

সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে তাঁদের মত নিলেন এবং সাধারণ নিরাপত্তা দানের নির্দেশ দিলেন।

সম্মুখ গমন

বিজয়ের পর সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) দুমাস যাবত কাদেসিয়্যায় অবস্থান করলেন। সৈন্যদের যখন ক্লান্তি দূর হয়ে গেল, তখন খলীফার দরবার থেকে আসা নির্দেশ মোতাবেক তিনি মাদায়েন জয়ের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন। জহরা ইবনে হাবিয়ার নেতৃত্বে তিনি কিছু সৈন্য পূর্বে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বরস নামক স্থানে হুরমুজের সাথে জহরার মোকাবেলা হল। হরমুজ কাদিসিয়্যা থেকে পালিয়ে এখানে সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছিল। জহরা হুরমুজকে পরাজিত করলেন এবং সে বাবেলের দিকে পালিয়ে গেল।

সা'দ (রাঃ) নিজের সৈন্যদের নিয়ে ফোরাত পার হয়ে বাবেল পৌছুলেন। এখানে অনেক ইরানী সর্দার ফিরোজ, হুরমুজ, মিহ্‌রান, মিহ্‌রজান প্রমুখ নিজেদের সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছিল। কিন্তু একাদিক্রমে পরাজয়ের কারণে কিছুটা এমন ভীত হয়ে পড়েছিল যে, মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারল না এবং প্রথম আক্রমণেই পালাতে লাগল। ফিরোজ নিহাওন্দের দিকে চলল, হুরমুজ আহওয়াজের পথ ধরল এবং অন্যরা মাদায়েন চলে গেল। জহরা পলাতকদের ধাঁওয়া করলেন এবং দিয়াব ও কূছা (যেখানে নমরুদ ইবরাহিম (আঃ)-কে বন্দী করেছিল) এর মধ্যবর্তী স্থানে একটি বিরাট দলকে তলোয়ারের নিচে স্থাপন করলেন। অতঃপর জহরা কূছার দিকে অগ্রসর হলেন এবং একজন বিখ্যাত রাজা শাহরিয়ারের সাথে তাঁর মোকাবেলা হল। শাহরিয়ার স্বয়ং লড়াইয়ে নামল এবং নায়েল নামে জনৈক আরবী গোলামের হাতে নিহত হল। জহরা কূছা থেকে অগ্রসর হয়ে সাবাত পৌছুলেন। এখানকার বাসিন্দারা জিযিয়া দেওয়ার শর্তে সন্ধি করে নিল। জহরা সাবাতে সা'দ ইবনে আবি ওয়াককাস (রাঃ) এর অপেক্ষায় অবস্থান করতে লাগলেন। যখন তিনি এলেন, তখন সকল ইসলামী সৈন্য বাহ্‌রাশীর অভিমুখে চললেন।

বাহ্‌রাশীর বিজয়

বাহ্‌রাশীর মাদায়েনের সাথে সংযুক্ত এলাকাসমূহের অন্তর্গত। এ এলাকা ও মাদায়েনের মাঝখানে শুধুমাত্র দাজলা নদীর পার্থক্য ছিল। এখানে একটি সরকারী বাহিনী মাদায়েনের হেফাযতের জন্য মোতায়েন ছিল। এরা প্রতিদিন সকালে এ মর্মে শপথ করত যে, যতক্ষণ আমাদের নিঃশ্বাস বাকী থাকবে, পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতি কেউ চোখ তুলে তাকাতে পারবে না।

www.e-ilm.weebly.com

এখানে হযরত সা'দ (রাঃ) দুমাস যাবত শহর অবরোধ করে থাকলেন। একদিন অবরুদ্ধরা দুর্গ থেকে বের হয়ে অত্যন্ত জোরে শোরে মোকাবেলা করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পালিয়ে গেল এবং নদী পার হয়ে মাদায়েনে প্রবেশ করল। শহরবাসীরা সন্ধির পতাকা উত্তোলন করল। বাহরাশীরে অবস্থানকালে আশেপাশের জমিদারেরা সা'দ (রাঃ) এর নিকট আনুগত্যের প্রস্তাব পাঠাল। সা'দ (রাঃ) তা কবুল করলেন এবং সাধারণ জিযিয়ায় তাদের সাথে সন্ধি করে নিলেন।

মাদায়েন বিজয়

বাহরাশীর বিজয়ের পর মাদায়েন ছিল মুসলমানদের সামনে। কিসরার শ্বেত প্রাসাদ সামনে চমকাচ্ছিল। এ প্রাসাদের প্রস্তরসমূহ দেখেই মুসলমানদের স্মরণ হল রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর বিজয় সুসংবাদ। তিনি বলেছিলেন, মুসলমানদের একটি দল কিসরার শ্বেত প্রাসাদ জয় করবে। (মুসলিম শরীফ, জাবির ইবনে সামুরা থেকে)। এ সুসংবাদ স্মরণে আসতেই মুসলমানদের অন্তর আনন্দ হিল্লোলে ওষ্ঠাগত হল। তাদের বাহুতে তখন বীরত্বের বিদ্যুততরঙ্গ দৌড়ে ফিরছিল। যিরার ইবনে খাত্তাব স্বতঃই চীৎকার করে উঠলেন। আল্লাহু আকবর, এইতো শ্বেত প্রাসাদ, যা বিজয়ের ওয়াদা আল্লাহ ও তাঁর রসুল করেছেন। যিরারের তাকবীরের জবাবে মুসলমানরাও তাকবীর দিলেন এবং পুরো পরিবেশ ধ্বনিতে গর্জে উঠলো। ইরানীরা পালাতে গিয়ে বাহরাশীর ও মাদায়েনের মধ্যেকার দাজলা নদীর সেতু ভেঙ্গে দিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানদের ঈমানী উত্তাপের নিকট দাজলার পানি কিইবনে ছিল। সা'দ (রাঃ) বললেন, সে কোন বাহাদূর যে নদী পার হয়ে তীর দখল করে নেবে? বনূ তামীমের সর্দার আসেম ইবনে আমর নিজের ষাটজন সাথীসহ নদীতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে পার হয়ে গেলেন। ইরানী রক্ষী বাহিনী মুসলমানদের এভাবে আসতে দেখে মনে করল যে, এরা মানুষ হতে পারেনা। দিকশূন্য হয়ে চীৎকার করতে করতে পালিয়ে গেল॥ দেওয়াঁ আমাদান্দ, দেওয়াঁ আমাদান্দ (দানব এসে গেছে, দানব এসে গেছে)।

এ দলটি নদীর তীরে গিয়ে পূর্বতীর দখল করে নিলে হযরত সা'দ (রাঃ) আদেশ করলেন যে, সব সৈন্য আল্লাহর নাম নিয়ে নদীতে ঘোড়া নামিয়ে দাও। সামনে ছিলেন হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াককাস (রাঃ) ও সালমান ফারসী (রাঃ)। আর তাঁদের পিছনে সকল ইসলামী সৈন্য। মুসলমান সৈন্যদের ঘোড়ার সাথে ঘোড়া মিলে ছিল এবং গভীর সাগরে তাঁরা এমনভাবে সাঁতরে যাচ্ছিলেন যেন হাঁস সাঁতরে যাচ্ছে। তাঁদের মুখে এ দুআ ছিল। "আমরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর উপর ভরসা করি। আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম কর্মসম্পাদনকারী। গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা ও নেককাজ করার শক্তি একমাত্র মহামহিম আল্লাহর সাহায্যেই হয়ে থাকে"।

www.e-ilm.weebly.com

আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সব সৈন্য এ ভাবে নদী পার হয়ে গেল কিন্তু তাদের শৃংখলায় এতটুকু বিঘ্ন ঘটেনি। একজন আরোহী অবশ্য ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কা'কা তৎক্ষনাত নিজ ঘোড়ার লাগাম নদীতে ফেলে দিয়ে তাকে অক্ষত সুস্থাবস্থায় উঠিয়ে নেন। (ইতমাম ৯০ ও বিদায়া নিহায়া ৭খ, পৃ. ৬৮)

শ্বেত প্রাসাদ

ইসলামী বাহিনী নদীর ওপারে পৌঁছুলে বাঁধা প্রদানের কেউ ছিলনা। ইরানের শাহেনশাহ য়াজদগারদ রাজধানী ছেড়ে হুলওয়ানের দিকে পালিয়ে গেলেন। পূর্বেই তিনি পরিবার পরিজনদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মুসলমানরা বিনা বাঁধায় শহরে প্রবেশ করলেন এবং শ্বেত প্রাসাদে ইসলামী ঝাণ্ডা স্থাপন করলেন। সা'দ (রাঃ) সুউচ্চ সুরম্য প্রাসাদ ও সবুজ শ্যামল সতেজ বাগিচাসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে স্বতঃই বলে উঠলেন ঃ

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك
واورثناها قوما اخرين

"কাফেররা অনেক বাগান, প্রস্রবণ, ক্ষেত উৎকৃষ্ট গৃহ ও সামগ্রী ছেড়ে গিয়েছে যেগুলোতে তারা স্বাচ্ছন্দে থাকত। এমনই হবার ছিল এবং আমি এসবগুলো অপর জাতিদের দান করেছি।"

হযরত সা'দ (রাঃ) শাহী প্রাসাদে শুকরানা নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর সেখানে হিজরী ১৬ এর সফর মাসে জামায়াতের সাথে জুমআর নামাজ আদায় করলেন। দৃশ্যতঃ আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি শাহী প্রাসাদে রক্ষিত মানুষ, পশু ইত্যাদির ছবিসমূহ অবিকৃত অবস্থায় রেখে দিলেন। (মুহাজারাত ৩২১)

দুনিয়া দ্বীনদারদের আয়ত্তে

শাহী প্রাসাদ থেকে মুসলমানরা যে সকল গণীমতের মাল লাভ করেন তা দেখে তারা হয়রান হয়ে গেলেন। প্রচুর স্বর্ণ মণিমুক্তা ছাড়াও অনেক বিরল ও দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক বস্তু ছিল। কতিপয় বিখ্যাত বিশ্ববিজয়ীর শাহী পোশাক ও হাতিয়ার ছিল। নওশিরওয়াঁর স্বর্ণখচিত মুকুট ও দরবারী পোশাক ছিল। আর ছিল স্বর্ণের একটি ঘোড়া যার বুকে ছিল ইয়াকূত পাথর লাগানো। রুপার তৈরী একটি উটনী ছিল যার উপর একটি স্বর্ণের গদি ছিল আর লাগামে ছিল বহু মূল্যবান মুক্তা গাথা। এ উটনীর আরোহী আপাদমস্তক মনিমুক্তার প্রলেপ যুক্ত ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ছিল শাহী মহলের একটি গালিচা, এর নাম ছিল বাহার। এর মধ্যভাগ ছিল স্বর্ণের, সবুজ অংশ জমরদের, প্রান্তরেখাগুলো ছিল পখরাজের। গাছগুলো ছিল স্বর্ণরূপার। পাতা রেশমের এবং ফল মনিমুক্তার। বসন্তকাল অতিবাহিত হয়ে গেলে শাহেনশাহ সঙ্গী সাথীদের নিয়ে এই গালিচায় বসতেন এবং বায়ুপান করে তৃপ্তি লাভ করতেন।

www.e-ilm.weebly.com

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) আশ্চর্যজনক ও বিরল বস্তুসহ এক পঞ্চমাংশ পৃথক করে অবশিষ্ট মাল মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। মূল্যবান জিনিসপত্র ব্যতীত প্রতিজন সৈন্যরা অংশে বার হাজার দীনার পড়ে। মদিনা মুনাওওয়ারায় গণিমতের এক পঞ্চমাংশ এলে হযরত উমর (রাঃ) ইরানী শান শওকতের প্রদর্শনী করলেন। প্রদর্শনী শেষ হলে তিনি সেগুলো উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। কারো কারো মত ছিল যে, বাহারকে স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ রেখে দেয়া হোক। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) বললেন- আমিরুল মুমিনীন, এ-ও বন্টন করে দিন। নইলে অন্যদের জন্য অনিয়ম করার একটি অজুহাত সৃষ্টি হবে। হযরত উমর (রাঃ) তৎক্ষনাত সেটি টুকরো টুকরো করে বন্টন করে দিলেন। (খাজারী ৩২০)

এখানে উল্লেখ্য যে, মুসলমান সৈন্যরা এ সকল বহু মূল্যবান জিনিসপত্র হুবহু নিজেদের আমীরের নিকট সোপর্দ করে দিয়েছেন। কেউ অবৈধভাবে একটি মুক্তাও ছিড়েননি। হযরত সা'দ (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) উভয়ে নিজেদের সৈন্যদের এই দিয়ানতদারী স্বীকার করেন এবং আল্লাহর শুকুর আদায় করেন।

মাদায়েন বিজয়ের পর মুসলমান সৈন্যরা মাদায়েনে অবস্থান করতে লাগলেন। হযরত উমর (রাঃ) এর এক ফরমান এল। সে মোতাবেক সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) ইরাকের নামাজের ইমাম এবং সিপাহসালার নিযুক্ত হলেন। নু'মান ইবনে উমর ইবনে মুকাররিনকে দাজলা নদীর অববাহিকা এলাকার রাজস্ব অফিসার নিযুক্ত করা হলো।

জালুলা যুদ্ধ

মাদায়েন থেকে পালিয়ে ইরানী সৈন্যরা জালুলা এসে জড়ো হয়েছিল। এ স্থানটি থেকে আজারবাইজান, বাব, জিবাল ও পারস্যের রাস্তা ভাগ হয়ে যেত। ইরানী সর্দাররা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল যে, এখান থেকে পিছিয়ে গেলে আমরা আর একত্রিত হতে পারব না। এজন্য এখানে আমাদের শেষবারের মত ভাগ্য পরীক্ষা করে নেয়া শ্রেয়। ইরানীরা জালুলায় যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিল। য়াজদগারদও হুলওয়ান থেকে সাহায্যকারী সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। মিহরানবাজী সিপাহসালার মনোনীত হল এবং শহরের চারিদিকে পরিখা খুড়ে ও তার সামনে কাটা ঝাড় লাগিয়ে তা হেফাজত করা হলো। হযরত উমর (রাঃ) এর পরামর্শ মোতাবেক হযরত সা'দ (রাঃ) হাশেম ইবনে উতবাকে এ অভিযানে পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে মাদায়েন রয়ে গেলেন।

হাশেম ১৬ হিজরী সফর মাসে মাদায়েন থেকে বার হাজার সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং জালুলা পৌঁছে শহর অবরোধ করলেন। ইরানীরা সময়ে সময়ে পরিখা থেকে বের হয়ে মোকাবেলা করছিল, তারপর আবার পরিখায় গিয়ে ঢুকছিল। এ পরিস্থিতি কয়েক মাস চলল। অবশেষে মুসলমানরা একদিন

www.e-ilm.weebly.com

প্রচণ্ডভাবে হামলা করলেন। তাঁরা পরিখা পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। এত ভয়ানক যুদ্ধ হল যে, লাইলাতুল হারির ভিন্ন অন্য কোথাও এমন যুদ্ধ আর হয়নি। ইরানীরাও জীবনপণ লড়াই করল। কিন্তু অবশেষে পালিয়ে গেল। হাশেম কা'কা'কে তখন তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি খানিকীন পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং পলায়নরতদের অসংখ্যকে হত্যা করলেন। ইমাম শা'বীর বর্ণনামতে একলাখ ইরানীকে খতম করা হয় এবং তিন কোটি গণিমত মুসলমানদের হস্তগত হয়।

এ পরাজয়ের সংবাদ য়াজদগারদের নিকট পৌছলে তিনি হুলওয়ান ছেড়ে রাই চলে গেলেন এবং কা'কা' অগ্রসর হয়ে হুলওয়ান দখল করে নিলেন। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াককাস (রাঃ) নিজ কেরাণী যিয়াদ কে বিজয়ের সুসংবাদ ও গনিমতের মালের এক পঞ্চমাংশসহ মদীনা মুনাওয়ারা পাঠিয়ে দিলেন। তিনি অত্যন্ত নৈপুন্যের সাথে যুদ্ধের অবস্থাসমূহ মুসলমানদের শোনালেন এবং আগামীতে বিজয়ের ধারা অব্যাহত রাখা সম্পর্কে মুজাহিদদের আগ্রহও প্রকাশ করলেন। হযরত উমর (রাঃ) তার বক্তৃতায় খুব সন্তুষ্ট হলেন এবং তার বাক নৈপুন্যের প্রশংসা করেন। যিয়াদ বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন, আমাদের মুজাহিদদের কার্যক্রম আমাদের ভাষা খুলে দিয়েছে। পরবর্তী দিন মসজিদের প্রাঙ্গনে গণিমতের মাল বন্টন করা হয়। দীনার দেরহাম ছাড়াও মনিমুক্তার স্তুপ ছিল। হযরত উমর (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল- হযরত এ কি কান্নার সময়? তিনি বললেন- যে জাতির মধ্যে ধনসম্পদ আসে, তার সাথে ঈর্ষা ও হিংসা আসে। আর ঈর্ষা ও হিংসার পর প্রভাব ও ভীতি অবশিষ্ট থাকে না।
(বিদায়া নিহায়া ৭ খ. পৃ. ৭০)

তিকরীত যুদ্ধ

মাদায়েনে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) জানতে পারলেন যে, মোসেলের রোমান ও আরব খৃষ্টানরা মুসলমানদের মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই আবদুল্লাহ ইবনে মু'তাম এর নেতৃত্বে পাঁচ হাজার সৈন্যের একটি দল তিকরীতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা হল। খৃষ্টানরা মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পেয়ে শহরের চারিদিকে পরিখা খনন করে অবরুদ্ধ হয়ে রইল। খৃষ্টানরা সময় সুযোগমত পরিখা থেকে বের হয়ে এসে মোকাবেলা করত এবং প্রতিবার পরাজিত হত। এভাবে চব্বিশটি মোকাবেলা হল এবং এতে খৃষ্টানদের শক্তি ভেঙ্গে গেল। রোমানরা মোকাবেলায় টিকে থাকতে না পেরে নৌপথে পালানোর ইচ্ছা করল। আবদুল্লাহ ইবনে মু'তাম তাদের এ ইচ্ছার কথা জেনে ফেললেন। তিনি আরব খৃষ্টানদের সাথে গোপনে চিঠিপত্র আদান প্রদান করে তাদেরকে মুসলমান করে নিলেন। সিদ্ধান্ত হলো যে, মুসলমানরা যখন রোমানদের উপর

www.e-ilm.weebly.com

হামলা করবেন এবং তারা পালিয়ে যেতে চাইবে, তখন তাদের এই সাথীরা তাঁদের পালিয়ে যেতে দেবে না। বরং নদীর দিক থেকে তাদের উপর হামলা করবে। তা-ই হলো। মুসলমানরা বাইর থেকে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে হামলা করলেন, আর ভিতর থেকে নওমুসলিমরা তাকবীর ধ্বনিতে যোগ দিল এবং রোমানদের পথ আটকে দিল। এভাবে সকল রোমান সৈন্য তলোয়ারে অর্পিত হলো এবং কেউ রক্ষা পেল না। এখানেও প্রচুর গণিমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হয়।

এ বিজয়ের পর আবদুল্লাহ একটি সৈন্যদল নীনুয়া ও মোসেল জয়ের জন্য রওয়ানা করে দিলেন। এ দলে তিকরীতের আরব খৃষ্টানরাও ছিল। এ আরববরা মুসলমানদের পূর্বে পৌছে প্রসিদ্ধ করে দিল যে, তিকরীতে রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছে। এখন তারা এ দিকে আসছে। নীনুয়া ও মোসেলের অধিবাসীরা সন্তুষ্টচিত্তে দরজা খুলে দিল এবং মুসলমানরা বিনা প্রতিরোধে শহর দখল করে নিলেন।

সা'দ (রাঃ) মাদায়েন থেকে একটি সৈন্যদল যিরার ইবনে খাত্তাবের নেতৃত্বে মাসীজানের দিকে এবং আরেকটি দল উমর ইবনে মালেকের নেতৃত্বে কারকীসা ও হীতের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। এ এলাকাসমূহও মুসলমানদের হাতে জয় হয়।

এ সকল বিজয়ের মাধ্যমে ইরাকের সমগ্র এলাকা মুসলমানদের আয়ত্তে আসে। হযরত উমর (রাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক কৃষকদের জমিসমূহ মামুলী ট্যাক্সের ভিত্তিতে তাদেরই নিকট রেখে দেয়া হয়। অমুসলিমদের উপর সামান্য জিযিয়া বসানো হয়। দেশে শান্তি শৃংখলার ব্যবস্থা করা হয় এবং সীমান্তে রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করা হয়।

কূফা ও বসরা স্থাপন

সফর ১৬ হিজরী থেকে মুহাররম ১৭ হিজরী পর্যন্ত মাদায়েন ছিল ইরাকে ইসলামী সৈন্যদের কেন্দ্রস্থল। কিন্তু এখানকার আবহাওয়া আরবদের অনুকূল হলোনা। তাদের শরীরের মজবুতি নষ্ট হতে লাগল এবং তাদের রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। হযরত উমর (রাঃ) হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াককাস (রাঃ)-কে লিখলেন যে, এমন কোন স্থান খোঁজ করুন যা স্থল ও জল উভয় প্রকৃতির হয় এবং সেখান থেকে মদীনা আসতে মাঝখানে কোন নদী না পড়ে। হযরত সা'দ (রাঃ) এ কাজের জন্য হযরত সালমান (রাঃ) ও হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-কে নিযুক্ত করেন। তাঁরা উভয়ে কূফার ভূমি পছন্দ করলেন। এখানকার ভূমি ছিল বালু ও কংকরময়। ফোরাত নদী এখান থেকে দেড় মাইল দূরে ছিল এবং নু'মান ইবনে মুনযির এর প্রসিদ্ধ এলাকাসমূহ খরনক ও সাদীরও এই এলাকায় অবস্থিত ছিল।

www.e-ilm.weebly.com

হযরত উমর (রাঃ) এর নির্দেশ মোতাবেক প্রথমে ঘাস খড়ের ঘর বানানো হলো। পরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে থাকলে পাকা ভবনাদি নির্মাণ করা হলো।

হযরত উমর (রাঃ)-এর নির্দেশনা মোতাবেক আবুল হায়াজ ইবনে মালিক আসাদী কুফার নকশা প্রস্তুত করেন। প্রথমে শহরের মধ্যভাগে এক চতুর্কোনী চত্বরে জামে মসজিদ নির্মাণ করা হলো। এতে চল্লিশ হাজার মানুষ নামাজ আদায় করতে পারত। জামে মসজিদের সামনে মর্মর পাথরের খুঁটির উপর দুইশত হাত লম্বা একটি বারান্দা তৈরী করা হয়। এর ছাদ ছিল রোমান ভবনাদির ছাদের অনুরূপ। মসজিদের সামনে ইরাকের শাসনকর্তার জন্য প্রশাসন ভবন নির্মাণ করা। মসজিদ ও প্রশাসন ভবনের মাঝখানে গুদামঘর আকারে দুইশত গজ দীর্ঘ বায়তুলমাল ভবন নির্মাণ করা হয়। মসজিদ ও প্রশাসন ভবনের চারিদিকে কিছুটা স্থান ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন গোত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মহল্লা বসতি করা হলো। এ সকল মহল্লায় চল্লিশ হাজার বাসিন্দার উপযোগী ভবনাদি নির্মাণ করা হয়। প্রতি মহল্লায় একটি করে মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

শহরের সকল রাস্তা জামে মসজিদের সম্মুখ থেকে শুরু হয়েছিল। প্রধান সড়কসমূহ ৪০ গজ প্রস্থ রাখা হয়। সাধারণ সড়কসমূহ ৩০ গজ ও ২০ গজ প্রশস্থে এবং গলিসমূহ ৭ গজ প্রশস্থ রাখা হয়। শহর নির্মাণে এ দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হলো যে, চত্বর ও সড়কসমূহ এত বেশী হবে যাতে আরব লোকেরা মাঠের মুক্ত হাওয়ার স্বাদ থেকে বঞ্চিত না হয়।

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) মুহররম ১৭ হি. (জানুয়ারী ৬৩৮ খৃ.)-এ মাদায়েন থেকে কুফায় স্থানান্তরিত হন। এর দুবছর পূর্বে হযরত উমর (রাঃ) এর নির্দেশে পারস্য উপসাগরের বন্দরস্থল উবাল্লার নিকট বসরা নামে আরেকটি শহর স্থাপন করা হয়। এখানকার ভূমিও বালুময় ও কংকরময় ছিল এবং আশেপাশে পানি ও তৃণভূমি ছিল। কূফার মত এখানেও জামে মসজিদ, প্রশাসন ভবন ও কয়েদখানা ইত্যাদি। সরকারী ভবনাদি নির্মাণ করা হয়। দজলা থেকে বসরা পর্যন্ত দশ মাইল দূরে একটি খালও কেটে আনা হয়।

প্রথমে বসরায়ও ঘাস খড়ের ঘর তৈয়ার করা হয়। কিন্তু পরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে ইট ও মাটির ঘর প্রস্তুত হয়।

কূফা ও বসরা প্রতিষ্ঠার পর এ দুই শহর ইসলামী সৈন্যদের কেন্দ্ররূপে সাব্যস্ত হয়। হযরত উমর (রাঃ) ইরাককে দুভাগে বিভক্ত করলেন। উপর ভাগ ও নিম্নভাগ। উপর ইরাকের সদর ছিল কূফা এবং এর শাসনকর্তা ছিলেন হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) নিম্ন ইরাকের সদর ছিল বসরা এবং এর

www.e-ilm.weebly.com

শাসনকর্তা ছিলেন উতবা ইবনে গাজওয়ান। ইরানের এলাকা বিজয়ের পর বাব, আজারবাইজান, হামাদান, রই, ইসফাহান, মাহ্, মোসেল, কারকিসা ইত্যাদি এলাকাসমূহ কূফার সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং খোরাসান, খাজিস্তান, মাকরান, কিরমান, পারস্য ও আহওয়াজ বসরার সাথে সম্পৃক্ত হয়।

বাহ্‌রাইন থেকে পারস্যে আক্রমণ

আলা ইবনুল হাযরামী (রাঃ) ছিলেন একজন ইসলামী বীর সর্দার। তিনি মুরতাদদের মোকাবেলায় উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন। উমর (রাঃ) তাঁকে বাহরাইনের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ইরানীদের মোকাবেলায় হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াককাস (রাঃ) এর বৃত্তান্ত শুনে ভাবলেন এক্ষেত্রে আমি কেন সা'দ (রাঃ) থেকে পিছিয়ে থাকব? এ ধারণা থেকেই তিনি নদীপথে বাহ্‌রাইন থেকে পারস্যে আক্রমণের জন্য একটি সেনাদল রওয়ানা করিয়ে দিলেন। এ সেনাদল ইসতাখার-এ পৌঁছুলে ইরানীদের একটি বিরাট বাহিনী তাদের ও তাদের নৌকার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। ইসলামী বাহিনীর জনৈক নেতা খালীদ ইবনে মুনযির অত্যন্ত বীরত্বের সাথে ইরানীদের মোকাবেলা করে তাদের একটি বিরাট দলকে তলোয়ারন্যস্ত করলেন। তথাপি তিনি নিজেদের নৌকাগুলো ইরানীদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারলেন না। এখন মুসলমানদের অনুভূতি হলো যে, ইরানীদের মাঝখানে স্বল্প সংখ্যার বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের অবস্থান করা দুরদর্শিতা নয়। তারা স্থলপথে বসরা ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু ইরানীদের একটি বাহিনী এ পথেও বাঁধার সৃষ্টি করল। মুসলমানরা তাউস নামক স্থানে অবরূদ্ধ হয়ে রইলেন।

হযরত উমর (রাঃ) এ সকল ঘটনা অবহিত হয়ে বসরার আমীর উতবা ইবনে গাজওয়ানকে নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, একটি বিরাট বাহিনী অতি সত্বর অবরূদ্ধদের সাহায্যের জন্য পাঠাও। উতবা বারো হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী আবু সাবরার নেতৃত্বে পাঠিয়ে দিয়ে দিলেন। আবু সাবরা তীরবর্তী এলাকা দিয়ে অগ্রসর হয়ে মুসলমানরা যেখানে অবরুদ্ধ ছিলেন সেখানে পৌঁছুলেন এবং নিজ ভাইদেরকে শত্রুকবল থেকে মুক্ত করলেন। আলা ইবনুল হাযরামীর এ অদূরদর্শী সাহসিকতায় হযরত উমর (রা) খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি তাঁকে বাহরাইনের আমীরের পদ থেকে অব্যাহতি দিলেন এবং নির্দেশ দেন যে, তিনি কূফায় গিয়ে সা'দ ইবনে আবী ওয়াককাস (রাঃ) এর অধীনে থাকুন।

(বিদায়া নিহায়া ৭খ. ৮৪)

www.e-ilm.weebly.com

আহওয়াজ * বিজয়

আহওয়াজের সীমান্ত বসরার সীমান্তের সাথে মিলিত ছিল। এখানে ইরানের প্রসিদ্ধ নেতা হুরমুজান অবস্থান করত। হুরমুজান ছিল শিরাওয়হের মামা। সে যখন তখন ইসলামী এলাকার উপর হামলা করত। বসরার আমীর উতবা ইবনে গাজওয়ান তার মোকাবেলা করতে চাইলেন এবং কুফার আমীর হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াককাস (রাঃ) এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কূফার সহযোগী বাহিনীসহ বসরার বাহিনীর সাথে হুরমুজানের মোকাবেলা হল। হুরমুজান পরাজিত হল এবং আহওয়াজ ও মিহরজান এলাকা মুসলমানদের দিয়ে সন্ধি করে নিল। মানাসির ও নাহরতীরিতে ইসলামী বাহিনীর চৌকি বসানো হলো। কিছুদিন পর সীমান্ত নির্ধারণ নিয়ে মুসলমান নেতাদের সাথে হুরমুজানের মত পার্থক্য হলো। সে সন্ধি ভংগ করল এবং মুসলমানদের মোকাবেলায় কুর্দীদের সাহায্য প্রার্থনা করল। হযরত উমরের নির্দেশে উতবা তখন হুরমুজানের মোকাবেলার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। আহওয়াজের জামারসুক নামক স্থানে মোকাবেলা হল। হুরমুজান পরাজিত হল এবং রামাহুরমুজ অভিমুখে পালিয়ে গেল। এভাবে তস্তর পর্যন্ত আহওয়াজের পুরো এলাকা ইসলামী পতাকার নীচে এসে গেল।

যিম্মীদের সাথে সদাচার

হুরমুজানের সন্ধিভঙ্গের কারণে হযরত উমর (রাঃ) ভাবলেন, মুসলমানরা যিম্মীদের সাথে বাড়াবাড়ি করছে না তো? এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য তিনি কূফার সম্ভ্রান্তদের একটি প্রতিনিধিদল ডেকে পাঠালেন। এ প্রতিনিধিদল দশব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত হয়। এতে আহনাফ ইবনে কায়সও ছিলেন। আহনাফ ইবনে কায়সকে হযরত উমর (রাঃ) বললেন, আমি আপনাকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বলে মনে করি। বলুন, যিম্মীদের সাথে কোন প্রকার অত্যাচার করা হচ্ছে না তো? আহনাফ বললেন- না, তাদের সাথে আপনার মনঃপুত আচরণ করা হচ্ছে। হযরত উমর (রাঃ) ভালভাবে নিশ্চিত হয়ে প্রতিনিধিদলকে উপহার দিয়ে বিদায় দিলেন। তিনি উতবাকে একটি পত্রও লিখলেন। বিষয়বস্তু ছিল ঃ

মুসলমানদেরকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখুন এবং যিম্মীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। এমন যেন না হয় যে, আপনার পক্ষ থেকে কোন বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, আর সেকারণে যিম্মীরা কোন বাড়াবাড়ি করে বসবে। আল্লাহ তাআলা আপনাকে যা দিয়েছেন, তা অঙ্গীকার পূরণের কারণে দিয়েছেন।

---

*আহওয়াজ ছিল বসরা ও পারস্যের মধ্যবর্তী প্রদেশের নাম। এ এলাকার শহরগুলো ছিল সূকুল আহওয়াজ , রামাহুরমুজ , ঈজাজ, আসকার মকরম, তসতর, হান্দিসাবুর, সূসসিরক, নহরতীরী ও মানাযির।

www.e-ilm.weebly.com

অতএব, অঙ্গীকার পূরনের কথা সর্বদা স্মরণ রাখবেন এবং যিম্মীদের সাথে সদাচারে আল্লাহর বিধানের অনুসরণ করবেন। আপনি এরূপ করলে আল্লাহ আপনার সহায় হবেন। (খাজরী পৃ. ৩১)

রামাহুরমুজ ও তস্তর বিজয়

শাহেনশাহ য়াজদগারদ তখন মরভে অবস্থান করছিলেন। এখান থেকে তিনি আহওয়াজের ইরানীদের নিকট গোপনে চিঠিপত্র পাঠালেন এবং তাদেরকে আরবদের নেতৃত্ব গ্রহণ করায় মর্যাদাবোধের উস্কানী দিলেন। এদিকে তিনি পারস্যের* সর্দারদেরকেও উস্কানী দিয়ে তাদেরকে আরবদের মোকাবেলার জন্য উৎসাহিত করলেন। ফল দাঁড়াল এই যে, আহওয়াজে স্থানে স্থানে বিদ্রোহ দানা বাঁধল এবং আহওয়াজবাসী ও পারস্যবাসী মিলিত হয়ে মুসলমানদের সাথে মোকাবেলার প্রস্তুতি নিতে লাগল।

হযরত উমর (রাঃ) এসব পরিস্থিতি অবগত হলেন। তিনি কুফার আমীর সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং বসরার আমীর হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) (উতবা ইবনে গাজওয়ানের পর তিনি বসরার আমীর নিযুক্ত হন) কে নির্দেশ পাঠালেন যে, তাঁরা যেন নিজ নিজ এলাকা থেকে আহওয়াজ অভিমুখে সৈন্য পাঠান। কূফা থেকে নু'মান ইবনে মুকাররিন এক বিরাট সেনাদল নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং রামাহুরমুজ পৌঁছে হুরমুজানের মোকাবেলা করলেন। হুরমুজান পরাজিত হয়ে তস্তর চলে গেল এবং নু'মান রামাহুরমুজ দখল করে নেন। অতঃপর নু'মান তস্তর অভিমুখে রওয়ানা হলেন। এখানে পৌঁছুলে বসরা থেকে আগত সাহল ইবনে আদীর নেতৃত্বাধীন সৈন্যদলও তাঁর সাথে মিলিত হল। হুরমুজান ইসলামী সৈন্যদের আগমনের সংবাদ শুনে শহর বন্ধ করে ভিতরে অবস্থান নিল। ইরানীরা সুযোগ বুঝে বের হত এবং মুসলমানদের সাথে খণ্ড যুদ্ধ করে শহরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ত। এভাবে এক মাস সময়ের মধ্যে আশিটি খণ্ড যুদ্ধ হল। এর কোনটিতে মুসলমানরা জয়ী হল, আর কোনটিতে ইরানীরা।

গায়েবী মদদ

ইতোমধ্যে জনৈক ইরানী ব্যক্তি ইসলামী বাহিনীতে এল। সে বলল, আমাকে নিরাপত্তা দান করলে আমি শহরে প্রবেশের পথ বলে দিতে পারি। কূফা ও বসরার সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক আবু সাবরা ইবনে আবী আরহাম

---

* খেলাফতে রাশেদার যুগে পারস্য বলতে ইসপাহান, পারস্য উপসাগর, কিরমান ও আরব ইরাকের মধ্যবর্তী এলাকা বুঝানো হতো। এখানকার সবচেয়ে বড় শহর ছিল শিরাজ।

www.e-ilm.weebly.com

তৎক্ষনাত তার প্রার্থনা মঞ্জুর করে নিলেন। ইরানী ব্যক্তিটি জনৈক মুসলমান সৈন্য আশরাসকে সাথে নিয়ে মাটির নীচের একটি সুড়ঙ্গপথে শহরে প্রবেশ করল। আশরাস যখন ভালভাবে শহর ঘুরে দেখে নিলেন এবং সুযোগ সুবিধা বুঝে নিলেন তখন ইরানী ব্যক্তিটি সে রাস্তায়ই তাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল। আশরাস ফিরে এসে ইসলামী বাহিনীর সিপাহসালারকে বললেন, আমি দুই শত বীরের সাহায্যে শহর জয় করতে পারি। একথা শুনেই দুইশত নওজোয়ান তলোয়ার নিয়ে আশরাসের সাথে চলল। আশরাস নিজ সাথীদের নিয়ে সেই গোপন পথে শহরে প্রবেশ করলেন এবং পাহারাদারদের হত্যা করে শহরের দরজা খুলে দিলেন। এদিকে বাইরে পুরো বাহিনী সুযোগের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। দরজা খুলতেই তাকবীর ধ্বনি দিয়ে তারা শহরে প্রবেশ করল।

হুরমুজান এ আকস্মিক বিপদের কথা জানতে পেরে ভিতর থেকে দুর্গ বন্ধ করে দিল। অতঃপর একটি চূড়ায় উঠে বলল, আমি এ শর্তে নীচে আসতে পারি যে, আমাকে খলীফাতুল মুসলিমীনের নিকট পৌঁছে দিতে হবে। তিনি আমার সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করেন, আমি তা মেনে নেব।

আবু সাবরা হুরমুজানের এ শর্ত মেনে নিলেন। হুরমুজান দুর্গের দরজা খুলে দিল এবং নিজে নিজেকে মুসলমানদের নিকট সঁপে দিল।

এভাবে তস্তর জয় হয়ে গেলে আবু সাবরা পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে কতিপয় সেনাদল পাঠালেন। এ সকল সেনাদল আশে পাশের সকল শহর জয় করেন।

এ যুদ্ধে হযরত বারা ইবনে মালিক (রাঃ) সহ কতিপয় সুবিখ্যাত সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

মদীনায় আহওয়াজ শাসক

আবু সাবরা একটি প্রতিনিধিদলসহ হুরমুজানকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। এ প্রতিনিধিদলে আহনাফ ইবনে কায়স এবং হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) শামিল ছিলেন। হুরমুজান রাজকীয় শান শওকতের সাথে মদিনায় প্রবেশ করল। তার শরীরে ছিল স্বর্ণখচিত রেশমের জামা, মাথায় প্রলেপযুক্ত মুকুট। পিছনে বড় বড় সর্দারগণ। ইসলামী প্রতিনিধিদল হুরমুজানকে নিয়ে মসজিদে নববীতে পৌছুলেন। এ সময় হযরত উমর (রাঃ) ঘুমাচ্ছিলেন। তাঁর ঘুমানোর এই অবস্থা ছিল যে, বিছানা ছিল মাটি, আর হাতে চামড়ার দুররা। হুরমুজান জিজ্ঞেস করল- মুসলমানদের খলিফ কোথায়? লোকেরা ইশারা করে বলল যে, ইনি। হুরমুজান আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল যে, তাঁর কোন ঘোষক ও দূত নেই? লোকেরা জবাব দিল, উমরের ওসবের প্রয়োজন নেই। হুরমুজান বলল- এ সাদাসিধে ভাব থেকে

www.e-ilm.weebly.com

মনে হচ্ছে, তিনি রাজা বাদশাহ নন, নবী। লোকেরা জবাব দিল- নবী তো নন, তবে নবীর স্থলাভিষিক্ত এবং তাঁর সাচ্চা অনুসারী তো অবশ্যই।

এসব কথাবার্তায় হযরত উমর (রাঃ) এর চোখ খুলে গেল। তিনি মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার নজর বুলিয়ে নিলেন এবং বললেন- আমি আল্লাহর নিকট দোযখের আগুন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বললেন– হে আমীরুল মুমিনীন, ইনি আহওয়াজের বাদশাহ, তাঁর সাথে কথা বলুন। তিনি বললেন– প্রথমে তাঁর এ কাপড় খুলে ফেল। তারপরে কথা বলব।

হুরমুজানের রাজকীয় পোশাক খুলে তাকে সাধারণ কাপড় পরানো হল। তারপর তিনি হুরমুজানকে লক্ষ্য করে বললেন– হে হুরমুজান, তুমি সন্ধি ভংগ ও আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরানোর পরিণতি দেখলে? হুরমুজান জবাব দিল, হে উমর–জাহেলিয়াতের যুগে যখন আল্লাহ আমাদের সাথেও ছিলেন না, আপনাদের সাথেও ছিলেন না, তখন আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী ছিলাম। এখন আল্লাহ আপনাদের সাথে রয়েছেন। তাই আপনারা আমাদের উপর বিজয়ী হয়েছেন। হযরত উমর (রাঃ) বললেন- জাহেলিয়াতের যুগে আমাদের উপর তোমরা এজন্য জয়ী হতে যে, তোমরা ছিলে ঐক্যবদ্ধ, আর আমরা ছিলাম বিচ্ছিন্ন।

হযরত উমর (রাঃ) প্রশ্ন করলেন- হুরমুজান, বল তো, তুমি একের পর এক সন্ধিভংগ কেন করলে? হুরমুজান বলল, উমর, আমাকে প্রথমে পানি পান করতে দিন। হযরত উমর (রাঃ) তৎক্ষনাত পানি আনালেন। হুরমুজান পানির পেয়ালা হাতে নিয়ে বলল, হে উমর- আমার আশংকা হয়, আমাকে এ পানি পান করার পূর্বেই হত্যা করে ফেলা হয় কিনা। হযরত উমর (রাঃ) বললেন– না, এরূপ হবে না, একথা শুনেই হুরমুজান পানির পেয়ালাটি ফিরিয়ে দিল এবং বলতে লাগল, এখন আপনারা আমাকে হত্যা করতে পারবেন না। কেননা আমি পানি পান করিনি।

হযরত উমর (রাঃ) হুরমুজানকে ছাড়তে চাইছিলেন না। কারণ তার হাতে কতিপয় অতি সম্মানী সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন। তিনি তার এ প্রতারণায় অপ্রতিভ হলেন। তিনি বলতে লাগলেন– হুরমুজান, তুমি আমাকে ধোকা দিলে। কিন্তু আমি মুসলমান ব্যতীত কারো ধোকায় পড়তে চাইনা, এ কথা শুনে হুরমুজান মুসলমান হয়ে গেল। হযরত উমর (রাঃ) হুরমুজানকে মদীনা মুনাওয়ারায় থাকার অনুমতি দিলেন এবং বার্ষিক দুই হাজার দিরহাম তার ওজিফা নির্ধারণ করে দিলেন। হযরত উমর (রাঃ) ইরানের বিজয়সমূহ সম্পর্কে তার সাথে পরামর্শ করতেন। (বিদায়া ৭খ. ৮৮)

www.e-ilm.weebly.com

সম্মুখগমনের সিদ্ধান্ত

যিম্মিদের সাথে সদাচারের প্রতি হযরত উমর (রাঃ) এর খুবই লক্ষ্য ছিল। হুরমুজান প্রতিনিধিদলকেও তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, এ যিম্মীরা বারবার সন্ধিভংগ করে কেন? মুসলমানরা তাদের কষ্ট দিচ্ছে না তো? প্রতিনিধিদল বলল- হে আমীরুল মুমিনীন, মুসলমানরা যিম্মিদের সকল হক আদায় করছে। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, তাহলে কি ব্যাপার? আহনাফ ইবনে কায়স বললেন– হে আমীরুল মুমিনীন, ব্যাপারটি এই যে, আপনি আমাদেরকে অনারব দেশে প্রবেশে নিষেধ করেছেন। এ যা কিছু বিজয় হয়েছে, তা তাদের চুক্তিভংগ ও বিশৃংখলা সৃষ্টির পরিণতিতে হয়েছে। তাদের শাহেনশাহ যতদিন তাদের মাথার উপর থাকবেন ততদিন এ বিশৃংখলা হতে থাকবে। তিনি নিজ জাতিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মোকাবেলায় উস্কানী দিতে থাকবেন। আপনি অনুমতি দিলে আমরা এ ফিতনার মাথা গুড়িয়ে দিই এবং তাঁর দেশে এগিয়ে গিয়ে তাঁর সকল আশা খতম করে দিই। এ জবাবে হযরত উমর (রাঃ) নিশ্চিন্ত হলেন এবং তিনি আহনাফ ইবনে কায়সের সম্মুখগমনের রায়ের সাথে একমত হলেন।

নিহাওন্দ বিজয়

জালুলা যুদ্ধের পর য়াজদগারদ রই চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু রই এর রাজা বিশ্বাসঘাতকতা করলে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েন। ইসপাহান ও কিরমান হয়ে তিনি খোরাসান পৌঁছুলেন এবং মরভে অবস্থান নিলেন। তিনি এখানে একটি অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করালেন। এতে তিনি পারসিক অগ্নি (সঙ্গে আনীত) সংযোগ করলেন এবং নতুনভাবে প্রশাসনের সাজসরঞ্জামাদি সাজালেন। অতঃপর মুসলমানদের হাত থেকে নিজ রাজ্য ফিরিয়ে নেয়ার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করলেন। ইতিমধ্যে খুজিস্তান জয় ও হুরমুজানের গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়ে তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং মুসলমানদের সাথে শেষ লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন।

মর্ভ থেকে য়াজদগারদ সকল রাজ্যের রাজা ও তালুকদারদের নামে চিঠিপত্রাদি পাঠালেন এবং তাদেরকে নিজের সাহায্যে উৎসাহিত করলেন। অতএব, বাব, সিন্ধ, খোরাসান ও হুলওয়ানের মধ্যবর্তী এলাকার সকল সর্দার নিজ নিজ সৈন্য নিয়ে তাঁর সাহায্যের জন্য বেরিয়ে পড়ল। য়াজদগারদ এ পঙ্গপ্রাণ সৈন্যবাহিনী নিয়ে নিহাওন্দে ছাউনি ফেললেন। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এ সকল ঘটনা হযরত উমর (রাঃ)-কে জানালেন। হযরত উমর (রাঃ) নেতৃস্তানীয সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করে পরামর্শ করলেন। হযরত উছমান (রাঃ) এর অভিমত ছিল, এ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে হযরত উমর (রাঃ) ইসলামী বাহিনীর নেতৃত্বদান করুন। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) এ মতের বিরোধিতা করলেন এবং খলীফাতুল মুসলিমীনের জন্য কেন্দ্রে অবস্থান করা জরুরী সাব্যস্ত করলেন।

www.e-ilm.weebly.com

হযরত উমর (রাঃ) হযরত আলীর সাথে একমত হলেন এবং বললেন, আমি এ অভিযানে সে ব্যক্তিকে পাঠাচ্ছি যিনি সর্বপ্রথমে তলোয়ারের আগা চুম্বন করবেন। তিনি হলেন নু'মান ইবনে মুকাররিন মুযানী। সবাই হযরত উমরের মত পছন্দ করলেন।

নু'মান ইবনে মুকাররিন (রাঃ) কসকরের রাজস্ব কর্মকর্তা ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রশাসনের চেয়ারের চেয়ে ঘোড়ার জিন অধিক পছন্দ করতেন। তিনি হযরত উমর (রাঃ) কে লিখেছিলেন যে, কসকরে আমার দৃষ্টান্ত এমনই যেমন কোন কামুক প্রেমাষ্পদের কোলে যুদ্ধবাজ নওজোয়ান এবং সে তাকে বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ করে। আল্লাহর দোহাই, আমাকে এখান থেকে সরিয়ে যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে দিন। হযরত উমর (রাঃ) তাকে নিহাওন্দের সেনাধিনায়কের পদে নিযুক্ত করে তার বাসনা পূর্ণ করেন। (আশহার ২ খ. ৩৩৫)

নু'মান ইবনে মুকাররিনের যাত্রা

হযরত উমর (রাঃ) এর নির্দেশনা মোতাবেক নু'মান ইবনে মুকাররিন ত্রিশ হাজার সৈন্যসহ নিহাওন্দ অভিমুখে রওয়ানা হলেন। এখানে পৌঁছে তিনি নিজ বাহিনীকে যুদ্ধনীতি অনুযায়ী বিন্যস্ত করলেন। সম্মুখভাগে নিজ ভাই নুআয়ম ইবনে মুকাররিনকে ডানদলে এবং বামদলে নিজের অপর ভাই সুওয়দ ইবনে মুকাররিনকে, রিজার্ভদলে কা'কা', পশ্চাদ দলে মাজাশী ইবনে মাসউদকে নিযুক্ত করলেন। ইরানীদের পক্ষ থেকে ডান দলে যরদক এবং বামদলে বাহমান নিযুক্ত হল।

অবশেষে মুসলমানরা তাকবীর ধ্বনি দিয়ে রণক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়লেন। দুদিন যাবত দুপক্ষে ভীষণ লড়াই হল। তৃতীয়দিন ইরানীরা মোকাবেলা ছেড়ে নিরাপদ স্থানে অবস্থান নিল। মুসলমানরা লড়াই দীর্ঘ করতে চাইছিলেন না। পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হল কা'কা' নিজ বাহিনী নিয়ে তাদের সংরক্ষিত স্থানে ঢুকে পড়বেন। তারা মোকাবেলায় বেরিয়ে পড়লে তিনি পিছিয়ে এসে ইসলামী বাহিনীর নিকট চলে আসবেন এবং তখন সম্মিলিত বাহিনী তাদের উপর হামলা করবে। তা-ই হল। কা'কা' ইরানী বাহিনীকে নিজের সাথে করে ইসলামী বাহিনীর সামনে নিয়ে এলেন এবং সামনা সামনি লড়াই শুরু হল।

এ লড়াই এত ভয়ানক ছিল যে, লাইলাতুল হারীর ব্যতীত এর কোন নজীর ছিল না। ময়দানে এত রক্ত ছিল যে, ঘোড়ার পা পিছলে যেতে লাগল। নু'মান ইবনে মুকাররিনের ঘোড়ার পা পিছলে গেল এবং তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। নুআয়ম ইবনে মুকাররিন তৎক্ষণাত তাকে একদিকে লুকিয়ে ফেললেন এবং তাঁর টুপি ও জামা পরিধান করে তাঁর ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল, সৈন্যরা যাতে বুঝতে না পারে যে, তাদের নেতা আহত হয়েছেন।

www.e-ilm.weebly.com

নু'মানের শাহাদাত ও বিজয়

লড়াই রাত অবধি অব্যাহত রইল। অন্ধকার ছেয়ে যেতেই ইরানীদের পা সরে গেল এবং তারা পলায়নের পথ ধরল। মুসলমানরা তাদের ধাওয়া করলেন এবং অসংখ্যকে পলায়নরত অবস্থায় হত্যা করলেন। ইরানীরা তাদের দিকে পূজার জন্য অগ্নিকুণ্ডলী জ্বালিয়ে রেখেছিল। দিশেহারা হয়ে পালানোর সময় শত শত ইরানী তাতে পড়ে ভস্ম হয়ে গেল। মোটকথা দেড়লাখ ইরানী সৈন্যের খুব কম সংখ্যক নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়ে যেতে সক্ষম হল।

ইসলামী বাহিনীর সিপাহসালার নু'মান ইবনে মুকাররিনের জখম খুব মারাত্মক ছিল। বিজয়ের পর এক ব্যক্তি তাঁর নিকট গিয়ে দেখেন তিনি শ্বাস ভাঙ্গছেন। তিনি চোখ খুললেন এবং বললেন– লড়াই এর ফল কি হল? সে ব্যক্তি বললেন, মুসলমানরা জয়ী হয়েছে। তিনি বললেন, আল্লাহর হাজার হাজার শুকরিয়া। বিজয়ের খবর উমর (রাঃ)-কে পৌছে দাও। একথা বলেই তিনি জান্নাতে পাড়ি জমালেন।

এ যুদ্ধে প্রচুর গণিমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হয়। হুজায়ফা, যাঁকে নু'মান ইবনে মুকাররিন নিজ স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন, গণিমতের মাল বন্টন করলেন এবং সায়েব ইবনে আকরা'কে একপঞ্চমাংশ ও বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন।

হযরত উমর (রাঃ) মদীনার বাইরেই দূতের অপেক্ষায় ছিলেন। সায়েবকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন– সংবাদ কি? সায়েব বললেন- হে আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহ তা'আলা বিরাট বিজয় দান করেছেন। তবে নু'মান শহীদ হয়েছেন। হযরত উমর (রাঃ) বিজয়ের সইবনেদে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। কিন্তু নু'মানের শাহাদাতে অনেকক্ষণ যাবত কাঁদতে লাগলেন।

(আশহারু মাশাহিরে ইসলাম ২খ. ৩৪৪)

এ যুদ্ধের পর ইরানীদের শক্তি চুরমার হয়ে গেল। এ কারণে আরবরা এর নাম দিয়েছে ফাতহুল ফুতূহ বা বিজয়সমূহের বিজয়। এ ঘটনা মুহররম ১৯ হিজরীতে সংঘটিত হয়।

ইরান অধিকার

পুরো ইরান অধিকার করার ইচ্ছা হযরত উমর (রাঃ) এর ছিলনা। এ যাবত বিজয়সমূহের উদ্দেশ্য ছিল আরব এলাকাসমুহ ভিনদেশী শক্তির নিকট থেকে পুনরুদ্ধার করা এবং তাদের উপর নিজেদের শক্তির এমন প্রভাব বসানো যাতে তারা এ দিকে ফিরতে না পারে। এ উদ্দেশ্য হাসিলের পর হযরত উমর (রাঃ)

www.e-ilm.weebly.com

অধিক শক্তিপরীক্ষায় ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি প্রায়ই বলতেন, আহা! যদি আমাদের ও অনারবদের মাঝে আগুনের পাহাড় থাকত যাতে আমরা তাদের পর্যন্ত যেতে না পারতাম এবং তারা আমাদের পর্যন্ত পৌছুতে না পারত!

কিন্তু ইরানীরা স্থির হয়ে বসে থাকবার ছিলনা। ভবিষ্যতে ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ ও উত্যক্ত করার ধারা চলত। আহওয়াজ ও নিহাওন্দ যুদ্ধ তাদের সে কর্মপদ্ধতিরই ফল ছিল।

হযরত উমর (রাঃ) এখন এ সকল ফিতনার দ্বাররূদ্ধ করে দিতে চাইলেন। তার পদ্ধতি ছিল এই যে, আহনাফ ইবনে কায়সের মতানুসারে এ সকল ফেতনার মস্তক চূর্ণ করে দেয়া অর্থাৎ ইরানী শাহেনশাহী ব্যবস্থা খতম করে দেয়া।

নিহাওন্দ যুদ্ধ থেকে অবসর হয়ে তিনি এ ইচ্ছা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৮ হিজরীর শুরুতে কুফা ও বসরার ছাউনিসমূহ থেকে ইরানের বিভিন্ন প্রদেশ জয়ের জন্য বিভিন্ন সর্দারের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী রওয়ানা হয়ে গেল এবং ২৩ হিজরী পর্যন্ত পাঁচ বছরের স্বল্প সময়ে ইরান সাম্রাজ্যের অধিকাংশ পূর্ব ও পশ্চিম এলাকা ইসলামী পতাকার নীচে এসে গেল। এ সকল বিজয়ের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল।

হামাদান বিজয়

প্রসিদ্ধ ইরানী সর্দার ফিরোজান নিহাওন্দ থেকে হামাদানের দিকে পালিয়ে গিয়েছিল। হুজায়ফা তার পশ্চাদ্ধাবনের জন্য একটি সেনাদল পাঠিয়ে দিলেন। এদল হামাদানের নিকটে তাকে ঘিরে ফেলে এবং হত্যা করে। হামাদানবাসী সন্ধির আবেদন করে। তাদের আবেদন কবুল করে নেয়া হয়। মাহবাসী এ সংবাদ শুনে তারাও সন্ধির আবেদন করল। তাদের আবেদনও কবুল করে নেয়া হল।

হুজায়ফা (রাঃ) নিজ বাহিনী নিয়ে ফিরে আসছিলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল যে, হামাদানে বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে। হুজায়ফা (রাঃ) নুআয়ম ইবনে মুকাররিনকে সেদিকে পাঠিয়ে দিলেন। নুআয়ম হামাদানে পৌছে শহর অবরোধ করলেন। অবরুদ্ধরা অনন্যোপায় হয়ে পুনরায় সন্ধির আবেদন করল। তাদের আবেদন মঞ্জুর করা হল। এখান থেকে নুআয়ম দাজরোদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। সেখানে রোম, দায়লাম, আজারবাইজান ও রই অধিবাসীরা একত্রিত হয়ে মোকাবেলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। দাজরোদে ভীষণ লড়াই হল। অবশেষে কাফিররা পরাজিত হল। নুআয়ম হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট বিজয়ের সুসংবাদ পাঠালেন। হযরত উমর (রাঃ) কাফিরদের প্রস্তুতিতে খুব চিন্তিত ছিলেন।

www.e-ilm.weebly.com

হযরত উমর (রাঃ) নুআয়মকে লিখে পাঠালেন যে, তিনি যেন রই (তেহরানের দক্ষিণদিকে একটি শহর) আক্রমণ করেন। নুআয়ম শহরের নিকটে এলে শহরের শাসনকর্তা সিয়াউশ নিজ সৈন্যদের নিয়ে মোকাবেলায় এল। ভীষণ লড়াই হল। লড়াই যখন চলছিল তখন রই শহরের জনৈক নেতা আবুল ফারখান এসে নুআয়মের সাথে মিলিত হল। আবুল ফারখান নুআয়মকে বলল– আপনি একটি সৈন্যদল আমার নিকট দিন। আমি গোপন পথে শহরে প্রবেশ করব। অতএব, নুআয়ম বাইরে থেকে আক্রমণ করলেন আর আবুল ফারখানের সাথীরা ভিতর থেকে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে তাতে শরীক হল। সিয়াউশ হতাশ হয়ে পালিয়ে গেল এবং রই শহর মুসলমানদের আয়ত্তে চলে এল। নুআয়ম আবুল ফারখানকেই রই এর ওয়ালী নিযুক্ত করলেন।

তবরিস্তান বিজয়

এরপর নুআয়ম নিজ ভাই সুওয়দকে কোমস (খোরাসান ও বিলাদে জাবাল এর মধ্যবর্তী একটি শহর) অভিমুখে পাঠিয়ে দিলেন। কোমসবাসী মোকাবেলার সাহস পেলনা এবং শহরটি বিনা বাঁধায় জয় হয়ে গেল। এখান থেকে সুওয়দ জুরজান অভিমুখে চললেন। জুরজান শাসক সন্ধির আবেদন করল। আবেদন মঞ্জুর হল। এখানে তবরিস্তান শাসকের পক্ষ থেকে সন্ধির আবেদনপত্র পৌছল। তবরিস্তান শাসকের কামনা ছিল, তার নিকট থেকে একসঙ্গে রাজস্ব হিসাবে কিছু অর্থ আদায় করে নেয়া হোক; অতঃপর তার সাথে ও তার দেশবাসীর সাথে কোন সম্পর্ক থাকবে না। এ আবেদন মঞ্জুর করে নেয়া হল এবং নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর সন্ধিপত্র লিখে দেয়া হল ঃ

তবরিস্তান শাসককে এ শর্তে নিরাপত্তা দান করা হচ্ছে যে, তিনি তবরিস্তানবাসীকে আমাদের বিরোধিতা থেকে বিরত রাখবেন, আমাদের বিদ্রোহীদের আশ্রয় দেবেন না, এবং বার্ষিক পাঁচলাখ দেরহাম আদায় করবেন। তবরিস্তান শাসক যতদিন এ শর্ত পুরণ করতে থাকবেন, তার দেশের সাথে আমাদের কোন সম্বন্ধ থাকবে না। অবশ্য আমরা তার দেশে তাঁর অনুমতিক্রমে প্রবেশ করতে পারব। তেমনি তবরিস্তানবাসী আমাদের দেশে আসতে পারবে। তবরিস্তান শাসক যদি আমাদের বিদ্রোহীদের আশ্রয় দান করেন বা আমাদের দুশমনদের সাথে যোগসূত্র কায়েম করেন, তাহলে এ সন্ধিপত্র রহিত মনে করা হবে। (ইতমামুল ওয়াফা পৃ. ১০৯)

www.e-ilm.weebly.com

ইসপাহান বিজয়

হযরত উমর (রাঃ) বসরার আমীর আবদুল্লাহ ইবনে উতবানকে নির্দেশ পাঠালেন যে, তিনি যেন ইসপাহান অভিমুখে রওয়ানা হন এবং আবু মূসা আশআরী (রাঃ) কে তার সাহায্য করতে নির্দেশ দিলেন। আবদুল্লাহ ইসপাহানে এলে সেখানে আসবীজানের সাথে তাঁর মোকাবেলা হল। দুপক্ষে ভীষণ লড়াই হল। অবশেষে মুসলমানরা জয়ী হলেন এবং আসবীজান সন্ধির আবেদন করল। আবেদন কবুল করা হল। অতঃপর আবদুল্লাহ ইসপাহানের রাজধানী জে অভিমুখে এগিয়ে চললেন। ইসপাহানের আমীর ফাজুসকান নিজেই মোকাবেলার জন্য এলো এবং আবদুল্লাহকে মোকাবেলার জন্য আহবান করল। প্রথমে ফাজুসকান আঘাত হানল। আবদুল্লাহ অত্যন্ত সচেতনভাবে তা এড়িয়ে গেলেন। আবদুল্লাহর পালা এলে ফাজুসকান বলল, আমি আপনার সাথে লড়াই করতে চাই না। আমি এ শর্তে সন্ধি করতে চাই যে, যার ইচ্ছা হয় জিযিয়া দিয়ে থাকবে আর যার ইচ্ছা হয় দেশত্যাগ করে চলে যাবে। আবদুল্লাহ এ শর্ত মেনে নিলেন এবং সন্ধিপত্র লিখে দিলেন।

আজারবাইজান * বিজয়

বুকায়র ইবনে আবদুল্লাহ ও উতবা আজারবাইজান অভিমুখে রওয়ানা হলেন। খলীফার দরবার থেকে রই বিজয়ী নুআয়ম ইবনে মুকাররিনকে নির্দেশ দেয়া হল যে, তিনি যেন সিমাক ইবনে খারাশকে পাঠিয়ে তাঁদের সাহায্য করেন বুকায়র জুরমিদানের পাহাড়ে পৌছুলে দাজরোদের পরাজিতরা ইসফান্দিয়ারের নেতৃত্বে তাঁর মোকাবেলা করল। ইসফান্দিয়ার ছিল কাদেসিয়্যায় নিহত রুস্তমের ভাই। মুসলমানরা ইসফান্দিয়ারকে জীবিত গ্রেফতার করল। ইসফান্দিয়ার বুকায়রকে বলল– আপনি শান্তি পছন্দ করেন না যুদ্ধ? বুকায়র জবাব দিলেন– শান্তি পছন্দ করি। ইসফান্দিয়ার বলল, তাহলে আমাকে হত্যা করবেন না। আমি আপনাদের সাথে সন্ধি না করা পর্যন্ত আজারবাইজানীরা সন্ধি করবে না। বুকায়র ইসফান্দিয়ারের কথা মেনে নিলেন। ইতোমধ্যে বুকায়রের নিকট নুআয়মের সাহায্য এসে গেল। তাঁরা আজারবাইজান অভিমুখে এগিয়ে চললেন। ইসফান্দিয়ারের কথায় আজারবাইজানীরা জিযিয়ার শর্তে সন্ধি করে নিল। হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট বিজয়ের সুসংবাদ পাঠানো হল। তিনি আদেশ পাঠালেন উতবা ইবনে ফারকাদ আজারবাইজানের ওয়ালী হোক এবং বুকায়র অগ্রসর হয়ে বাব বাহিনীর সাহায্য করুক।

* আজারবাইজান কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত। পূর্বে এর রাজধানী ছিল মারাগা। পরে তাবরীজ, বর্তমানে বাকু।

www.e-ilm.weebly.com

বাব বিজয়

সুরাকা ইবনে আমর বাব অভিমুখে অগ্রসর হলেন। এ ছিল ইরান, আরমিনিয়া ও রুশ সীমান্ত সংলগ্ন একটি সীমান্তশহর। অগ্রবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন আবদুর রহমান ইবনে আবী রাবীআ। সুরাকার পূর্বেই বুকায়র সেখানে গিয়ে তাবু ফেললেন। বাবের রাজা শাহরবরাজ ছিল একজন ইরানী সর্দার। সে নিজেই ইসলামী সিপাহসালারের নিকট উপস্থিত হল এবং বলল, আমি ইরান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিলাম। আপনারা যখন সে সাম্রাজ্য করায়ত্ত করে নিয়েছেন, তখন আমি আপনাদের আনুগত্যের বাইরে কিভাবে থাকতে পারি? তবে আমার কামনা এই যে, আমার নিকট থেকে কোন জিযিয়া না নেয়া হোক। বরং তার পরিবর্তে সৈন্য সেবা নেয়া হোক।

জিযিয়া মূলতঃ সৈন্যসেবারই বদলা ছিল। ইসলামী সিপাহসালার বাব রাজার এ আবেদন কবুল করে নিলেন এবং হযরত উমর (রাঃ)-কে অবহিত করলেন। হযরত উমর (রাঃ)ও এ শর্ত কবুল করে নিলেন।

বাব বিজয়ের পর সুরাকা নিজ বাহিনী আরমিনিয়ার পাহাড়ী এলাকার দিকে অগ্রসর করলেন। বুকায়র ইবনে আবদুল্লাহ মুকানের দিকে রওয়ানা হলেন, হাবীব ইবনে মাসলামা তিফলিসের (গুর্জিস্তানের রাজধানী বর্তমানে রাশিয়ার অন্তর্গত) দিকে এবং হুজায়ফা জিবালুল্লানের (আর্মেনিয়ার নিকটবর্তী কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী এলাকা, বর্তমানে রাশিয়ার অন্তর্গত) দিকে। বুকায়র মুকান জয় করে ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। এ ঘটনা ছিল ২১ হিজরীর।

এরপর সুরাকার ইন্তেকাল হয়ে গেল। আবদুর রহমান ইবনে আবু রাবীআ তাঁর স্থলাভিষিক্ত নির্বাচিত হলেন। হযরত উমর (রাঃ) এর নির্দেশে আবদুর রহমান বাব থেকে কাস্পিয়ান শহরের দিকে এগুলেন। শাহরবরাজ জিজ্ঞেস করলেন, কোন দিকে উদ্দেশ্য? আবদুর রহমান বললেন, বলঞ্জর (কাস্পিয়ান দেশের রাজধানী) পৌছে তুর্কিদের সাথে মুখোমুখি লড়াই করতে চাই। শাহরবরাজ বলল-, আমরা তো আশীর্বাদ মনে করি যে, তারা আমাদের উপর হামলা না করুক। আবদুর রহমান বললেন, কিন্তু আমি তাদের দেশে প্রবেশ না করে ছাড়ব না। আল্লাহর শপথ, আমার সাথে এমন একটি দল আছে, যারা আমীরের হুকুম পেলে সিকান্দার প্রাচীর পর্যন্ত পৌছে যাবে। শাহররাজ আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল, কোন সে দলটি? আবদুর রহমান জবাব দিলেন, সেদলটিই যারা মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর (সঃ) সাহচর্য লাভ করেছে এবং খালেছ নিয়তে ইসলামে প্রবেশ করেছে। জীবন দান ও আত্মত্যাগের এ উদ্যম তাদের মধ্যে ততদিন যাবত বহাল থাকবে যতদিন অন্য জাতিসমূহ তাদের উপর বিজয়ী হয়ে তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করে না দেবে।

www.e-ilm.weebly.com

আবদুর রহমান বাব থেকে রওয়ানা হয়ে বলঞ্জর পৌছুলেন। বলঞ্জরের তুর্কিরা মুসলমানদের এ সাহস দেখে মনে করল যে, এরা মানুষ নয়, বরং ফেরেশতা।

তুর্কিরা মোটেই বাঁধা দিল না এবং ইসলামী সিপাহ সালারের সাদা ঘোড়া বলঞ্জর থেকে সামনে আরো দুইশত ক্রোশ পৌছে ক্ষান্ত হলেন।

(ইতমাম পৃ. ১৩ এবং বিদায়া ৭খ. ১৩৩)

এ সকল বিজয়ের পর আবদুর রহমান বাবের ওয়ালী নিযুক্ত হয়ে সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন।

খোরাসান বিজয়

ইরানের শাহেনশাহ য়াজদগরদ নিজের নতুন রাজধানী মরভেশাহজাহান এ অবস্থান করছিলেন এবং মুসলমানদের মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আহনাফ ইবনে কায়স ২২ হিজরীতে তার মোকাবেলার জন্য রওয়ানা হলেন। তিনি প্রথমে হিরাত জয় করলেন এবং তারপর মরভে শাহজাহানের দিকে এগুলেন। য়াজদগরদ মরভেশাহজাহান ছেড়ে মরভেরোদ চলে গেলেন এবং চীন, তুর্কিস্তানের বাদশাহ খাকান ও সাগাদের বাদশাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। আহনাফ অগ্রসর হয়ে মরভেশাহজাহান দখল করে নিলেন এবং অতঃপর মরভেরোদ অভিমুখে এগিয়ে চললেন। য়াজদগরদ এখান থেকেও পালিয়ে গেলেন এবং বলখে গিয়ে অবস্থান নিলেন। আহনাফ মরভেরোদও করায়ত্ত করলেন। মরভেরোদ-এ আহনাফের সাহায্যের জন্য কুফা থেকে নতুন উদ্যমী সৈন্য এসে গেল। আহনাফ তাদের নিয়ে বলখে হামলা করলেন। য়াজদগরদ বীরত্বের সাথে লড়াই করলেন। কিন্তু অবশেষে পরাজিত হয়ে জায়হুন নদী আমু দরিয়া পার হয়ে তুর্কিস্তান এলাকায় প্রবেশ করলেন।

য়াজদগরদ ফারগানা পৌছুলে তুর্কিস্তানের বাদশাহ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল এবং তাঁর সাহায্যের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করল। তুর্কিস্তানের বাদশাহের সাথে য়াজদগরদ নদী পার হয়ে পুনরায় ফিরে এলেন। তিনি নিজে মরভেশাহজাহানের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তুর্কিস্তানের বাদশাহ মরভেরোদের দিকে রওয়ানা হল। তুর্কিস্তানের বাদশাহকে মরভেরোদে আহনাফের মোকাবেলায় পরাজিত হতে হল এবং সে নিজ সৈন্যদের নিয়ে তুর্কিস্তানের দিকে ফিরে গেল। য়াজদগরদের নিকট এ সংবাদ পৌছুলে তাঁর সাহস ভেঙ্গে গেল। মনিমুক্তা ও ধনভাণ্ডার যা কিছু সাথে ছিল সব নিয়ে তিনি তুর্কিস্তানের দিকে পালিয়ে গেলেন। তাঁর সাথীরা যখন দেখল যে, সাম্রাজ্য তো গেলই, দেশের সম্পদও তুর্কিস্তান চলে যাচ্ছে। তখন তারা সকল অর্থসম্পত্তি লুট করে নিল। য়াজদগরদ লুণ্ঠিত হৃতসর্বস্ব হয়ে ফরগানার বাদশাহর নিকট পৌছুলেন এবং হযরত উমর (রাঃ) এর যুগের

www.e-ilm.weebly.com

শেষ অবধি সেখানে অবস্থান করলেন। খোরাসানের আমীররা আহনাফ ইবনে কায়সের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করল এবং জিযিয়ার বিনিময়ে সন্ধি করে নিল। খোরাসানবাসীরা ইসলামী প্রশাসনের ছায়াতলে পূর্বের তুলনায় অধিক শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবন যাপন করতে লাগল।

ফাসা ও দারুলজাবরু বিজয়

সারিয়া ইবনে জানীম কিলাবী ফাসা ও দারুলজাবরু শহরসমূহে হামলা করলেন। এখানকার ইরানী বাসিন্দারা নিজেদের প্রতিবেশী কুর্দিদের সাহায্য প্রার্থনা করল। ভীষণ লড়াই হল। লড়াই এর মধ্যে এক সময় সারিয়া দুশমনদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে গেলেন। এ সময় তিনি হযরত উমর (রাঃ) এর আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি বলছেন॥ হে সারিয়া, পাহাড়ের আশ্রয় লও, পাহাড়ের আশ্রয় লও।

সারিয়া নিজ সৈন্যদের পিছিয়ে নিয়ে পাহাড়ের প্রান্তে চলে গেলেন এবং পাহাড় পিছনে রেখে লড়াই করে সফল হলেন।

বিজয়ের পর সারিয়া বিজয় সুসংবাদ ও গণিমতের এক পঞ্চমাংশ দিয়ে একজন দূতকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। মদীনার লোকেরা দূতকে বলল, অমুক দিন অমুক সময় খলীফাতুল মুসলিমীন খুতবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি চীৎকার দিয়ে উঠলেন॥হে সারিয়া, পাহাড়ের আশ্রয় লও, পাহাড়ের আশ্রয় লও।

অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর অগণিত অদৃশ্য সৃষ্টি রয়েছে। হয়ত কেউ এ আওয়াজ সারিয়ার নিকট পৌছে দেবে। তোমরা কি সে আওয়াজ শুনেছিলে? দূত বলল, সে আওয়াজেই তো সারিয়া নিজ বাহিনীকে পিছিয়ে পাহাড়ের প্রান্তে নিয়ে গেলেন এবং জয়লাভ করেন। (বিদায়া নিহায়া ৭ খ. পৃ. ১১৩)

হযরত উমর (রাঃ) সারিয়াকে দারুল জাবরুর ওয়ালী নিযুক্ত করেন, তিনি সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন।

কিরমান বিজয়

সুহায়ল ইবনে আদী কিরমান অভিমুখে রওয়ানা হলেন। হযরত উমর (রাঃ) তাঁর সাহায্যের জন্য আবদুল্লাহ ইবনে উতবানকে পাঠিয়ে দিলেন। কিরমানে ইরানীদের এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর সাথে মোকাবেলা হল। কিরমানের রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হল এবং মুসলমানরা বিজয়ী বেশে শহরে প্রবেশ করলেন।

সিজিস্তান বিজয়

আসেম ইবনে উমর সিজিস্তান (সীস্তান) অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সিজিস্তানবাসীরা এগিয়ে এসে মোকাবেলা করল। কিন্তু পরাজিত হয়ে পালিয়ে

www.e-ilm.weebly.com

গেল। মুসলমানরা সিজিস্তানের রাজধানী যরঞ্জ অবরোধ করলেন। অবরুদ্ধরা নিরূপায় হয়ে এ শর্তে সন্ধির আবেদন করল যে, সকল মেঠো এলাকা তাদের পশুর জন্য নির্ধারিত থাকবে। মুসলমানরা এ শর্ত কবুল করে নিলেন এবং এ শর্তটি এত কঠোরভাবে মেনে চললেন যে, এ দিক দিয়ে যাবার সময় তারা অতিদ্রুত অতিক্রম করে যেতেন, যাতে আবার অঙ্গীকার ভঙ্গ না হয়ে যায়।

মাকরান বিজয়

হাকাম ইবনে উমায়র তাগলাবী মাকরান (সিন্ধু ও বলখনদীর মধ্যবর্তী এলাকা) অভিমুখে রওয়ানা হলেন। কিরমান বিজয়ীদ্বয় সুহায়ল ইবনে আদী এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহও তাঁর সাথে এসে মিলিত হলেন। ইসলামী বাহিনী বিজয়পতাকা ওড়াতে ওড়াতে সিন্ধু নদীর তীর পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। এখানে মাকরানবাসী মোকাবেলার জন্য এল এবং সিন্ধুরাজাও তাদের সাহায্যের জন্য বিরাট এক সৈন্যদল পাঠাল। বেলুচি ও সিন্ধীদের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে মুসলমানদের মোকাবেলা হল এবং তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। মুসলমানরা মাকরান অধিকার করে নিলেন। হাকাম সিহার আবাদীকে বিজয় সুসংবাদ ও গণিমতের এক পঞ্চমাংশ দিয়ে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। হাকাম ভারতের শহরগুলোতে এগুতে চাইলেন। কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) বিজয় বিস্তারের পক্ষে ছিলেন না। তাই তাঁকে অগ্রসর হতে নিষেধ করলেন।

(বিদায়া নিহায়া ৭ খ. ১৩২)

শাম ও ফিলিস্তীনের বিজয়সমূহ

দামেশ্‌ক বিজয়

হযরত উমর (রাঃ) এর খেলাফতের শুরুতে আমরা ইসলামী বাহিনীকে য়ারমূক প্রান্তরে বিজয় ও সাফল্যের পতাকা উত্তোলনরত অবস্থায় রেখে এসেছিলাম। য়ারমূক যুদ্ধ থেকে অবসর হয়ে ইসলামী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) জানতে পারলেন যে, পরাজিত রোমবাহিনী ফাহাল নামক স্থানে গিয়ে থেমেছে। অন্যদিকে রোমের কায়সার একটি বিশাল বাহিনী মুসলমানদের মোকাবেলার জন্য দামেশকে জড়ো করেছেন। তিনি হযরত উমর (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন যে, কোন দিকে এগুবো? হযরত উমর (রাঃ) নির্দেশ দিলেন যে, একটি সৈন্যদল ফাহালের দিকে পাঠিয়ে দিন। তারা পরাজিতদের ব্যাপৃত রাখবে। আর নিজে দামেশকের দিকে অগ্রসর হোন। কেননা এটি শামের দুর্গ ও রাজধানী।

www.e-ilm.weebly.com

হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) একটি সৈন্যদল ফাহালের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। এরা সেখানে পৌঁছে শহর অবরোধ করে রইল। একটি দল হিমস ও দামেশকের মাঝখানে মোতায়েন করলেন, আরেকটি দল দামেশ্‌ক ও ফিলিস্তীনের মাঝখানে মোতায়েন করলেন। যাতে এসকল স্থান থেকে সাহায্য পৌঁছুতে না পারে। অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) দামেশকের দিকে অগ্রসর হলেন। দামেশকে রোমবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিল নিসরাত ইবনে নাসতুস। সে মুসলমানদের আগমনের সংবাদ শুনে শহর বন্ধ করে বসে রইল। ইসলামী বাহিনী দামেশকের চারিদিক থেকে ঘিরে নিল। এক দরজায় ছিলেন হযরত আবু উবায়দা (রাঃ), আরেক দরজায় হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ), তৃতীয় দরজায় খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) এবং চতুর্থ দরজায় য়াযীদ ইবনে আবী সুফিয়ান (রাঃ)। মুসলমানরা সত্তর দিন যাবত শহর অবরোধ করে পড়ে রইলেন। এ সময়ে কখনো কখনো রোমানরা প্রাচীরের উপরে উঠে তীরবাজি করত, মুসলমানরাও তার জবাব দিত। কিন্তু রোমানদের এ সাহস হত না যে, ময়দানে এসে মোকাবেলা করে।

খালেদ (রাঃ) এর পুরুষোচিত সাহসিকতা

হযরত খালেদ (রাঃ) রাতে খুব কম ঘুমুতেন এবং দুশমনদের সংবাদ পুরোপুরি রাখতে চেষ্টা করতেন। একরাতে তিনি শহরে অস্বাভাবিক শোরগোলের শব্দ শুনলেন। গুপ্তচরদের মাধ্যমে অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে, দামেশ্‌ক জেনারেলের ঘরে ছেলে জন্মগ্রহণ করেছে। সেই আনন্দে দুর্গের অভ্যন্তরে নৃত্যগীত উল্লাসের আসর জমেছে এবং রোমানরা শরাব পান করে মাতাল হচ্ছে।

হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) এ সুযোগের তৎক্ষনাত সদ্ব্যবহার করলেন। কতিপয় জানবাজ সাথীকে নিয়ে তিনি পরিখা পার হয়ে প্রাচীরের নীচে পৌঁছে গেলেন। রশির সিড়ি তৈরী করলেন এবং তার মাথায় ফাঁসি লাগিয়ে গম্বুজে ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর সে রশির সিড়ি বেয়ে প্রাচীরে উঠে নামলেন এবং পাহারাদারদের হত্যা করে শহরের দরজা খুলে দিলেন। সাথে সাথে তাকবীর ধ্বনি দিলেন। তাকবীর ধ্বনি শুনেই খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) এর দলের সৈন্যরা দরজা দিয়ে শহরে করলেন। রোমানরা এই আকস্মিক বিপদে হতবুদ্ধি হল। কিছুই তো করতে পারল না। তাই শহরের অপর দরজা খুলে হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত হল এবং সন্ধির আবেদন করল।

হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) খালেদের (রাঃ) কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। ইসলামী যুদ্ধনীতি অনুসারে তিনি তৎক্ষণাত তাদের আবেদন কবুল

www.e-ilm.weebly.com

করে নিলেন এবং তিনি নিজের সেনাদলসহ সন্ধিকারীর বেশে শহরে প্রবেশ করলেন। শহরের মধ্যভাগে উভয় নেতার পরস্পর সাক্ষাত হল। তিনি রোমানদের চালাকি বুঝতে পারলেন। এখন এ বিষয় আলোচিত হল যে, শহর তলোয়ারে অধিকৃত সাব্যস্ত করা হবে না সন্ধির মাধ্যমে বিজিত মনে করা হবে? হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) পুরো শহর সন্ধির মাধ্যমে বিজিত সাব্যস্ত করলেন। তিনি রোমানদের সাথে যেসকল শর্ত ঠিক করেছিলেন, পুরো শহরে সেগুলোই জারী করা হল। শর্ত ছিল এই যে, বিজিতরা স্বর্ণরূপা ও সম্পদের এক পঞ্চমাংশ আদায় করবে, মাথাপিছু এক দীনার এবং প্রতি শত বর্গফুট জমি থেকে এক পাত্র (নির্দিষ্ট) গম আদায় করবে। অতঃপর তাদের জীবন, সম্পদ, সম্পত্তি ও উপাসনালয়সমূহ নিরাপদ থাকবে এবং তাদের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। দামেশ্‌ক বিজয় সংঘটিত হয় রজব ১৪ হিজরীতে।

হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট বিজয়ের সুসংবাদ পাঠালেন। য়াযীদ ইবনে আবী সুফিয়ান (রাঃ)কে দামেশ্‌ক দেখাশুনার জন্য রেখে যাওয়া হল। তিনি সেখানে অবস্থান করে পার্শ্ববর্তী শহরসমূহ সায়দা, আরাকা, জুবাইল ও বৈরূত জয় করেন। য়াযীদ ইবনে আবী সুফিয়ানের ছোটভাই মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) কায়সারিয়া অভিমুখে অগ্রসর হলেন এবং তা জয় করেন।

ফাহাল যুদ্ধ

দামেশ্‌ক বিজয়ের পর হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) ফাহালের দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর সাথে ছিলেন খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ), আমর ইবনে আস (রাঃ), যিরার ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) এবং শুরাহবীল ইবনে হাসানা। রোমানরা শহর হেফাজতের জন্য এই কৌশল অবলম্বন করল যে, শহরের চারিদিকের নদীর বাঁধ কেটে দিল এবং শহরের চতুর্দিকে শুধু পানি আর পানি দেখা যেতে লাগল। ইসলামী বাহিনী শহরের নিকটবর্তী পৌছে শহর অবরোধ করল। একরাতে রোম সর্দার সাকলা নৈশহামলা চালানোর জন্য বের হল। শুরাহবীল ইবনে হাসানা (রাঃ) হযরত উমর(রাঃ) এর নির্দেশনা মোতাবেক রাতে জেগে থাকতেন এবং তাঁর সৈন্যদল যুদ্ধ প্রশিক্ষণ মোতাবেক বিন্যস্ত থাকত। রোমসর্দার সাকলার সাথে শুরাহবীল (রাঃ) এর মোকাবেলা হল। অত্যন্ত ভয়ানক যুদ্ধ হল। সারা রাত ভীষণ লড়াই হল, পরবর্তী দিনও তা অব্যাহত রইল। রাত হতেই রোম সর্দার নিহত হল এবং রোমবাহিনী পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু পালিয়ে কোথায় যাবে? পিছনে পূর্বেই পানি ছেড়ে শহরের রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। আশি হাজার নিহত হল এবং প্রচুর গণিমতের মাল রেখে গেল।

www.e-ilm.weebly.com

মারজেরোম যুদ্ধ

ফাহাল বিজয়ের পর হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) একটি সেনাদল শুরাহবীল (রাঃ) এর নেতৃত্বে বাইসান অভিমুখে পাঠিয়ে দিলেন। আরেকটি দল তিবরিয়া (জর্দানের রাজধানী) অভিমুখে। উভয় স্থান দামেশ্‌কের সন্ধিশর্তে জয় হয়।

অতঃপর হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) সহ হিমস অভিমুখে রওয়ানা হলেন। মরজেরোম পৌঁছুলে রোমানদের দুইটি বাহিনীর সাথে মোকাবেলা হয়। এ দুই বাহিনীকে রোমের কায়সার মুসলমানদের বাঁধা দেবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। একটি বাহিনীর সর্দার ছিল তোজর, অপরটির শানাস। আবু উবায়দা (রাঃ) শানাসের মোকাবেলা করার জন্য কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) তোজরের মোকাবেলায়। সকালে মোকাবেলার সময় হলে জানা গেল যে, তোজর দামেশ্‌কে রওয়ানা হয়ে গিয়েছে, যাতে য়াযীদ ইবনে আবী সুফিয়ান (রাঃ)কে তার অজ্ঞাতসারে ঘিরে ফেলতে পারে। খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) তৎক্ষণাত তার পিছনে রওয়ানা হলেন।

এ দিকে য়াযীদ ইবনে আবী সুফিয়ান (রাঃ)ও তোজরের রওয়ানা হবার কথা জানতে পেরেছিলেন। তিনিও নিজ বাহিনী নিয়ে মোকাবেলার জন্য বের হলেন। দামেশ্‌কের বাইরে দুবাহিনীর মোকাবেলা হয়। লড়াই চলার সময়েই হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) পৌঁছে গেলেন এবং রোম বাহিনীর উপর পিছন দিক থেকে হামলা করলেন। তোজরের সৈন্যদের একটি মানুষও জীবিত রক্ষা পেল না। এদিকে মরজেরোমে হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) এর সাথে শানাসের মোকাবেলা হয়। তিনি তাকে পরাজিত করলেন।

হিমস বিজয়

রোম সম্রাট কায়সার তখন হিমসে অবস্থান করছিলেন। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, তোজর ও শানাস পরাজিত হয়েছে এবং মুসলমানরা এগিয়ে চলেছে, তখন তিনি হিমস ছেড়ে ইনতাকিয়া চলে গেলেন। হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) বা'লাবাক্ক জয় করে হিমস পৌঁছুলেন এবং শহর অবরোধ করলেন। অবরুদ্ধরা কিছুকাল যাবত হিরাক্লিয়াসের সাহায্যের অপেক্ষায় কষ্ট সহ্য করে রইল। তারা যখন এদিক থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন তারা আবু উবায়দা (রাঃ) এর নিকট প্রস্তাব পাঠিয়ে দামেশ্‌কের শর্তে সন্ধি করল। হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) হিমসকে উবাদাহ ইবনে সামিত (রাঃ) এর তত্ত্বাবধানে দিলেন এবং নিজে অগ্রসর হলেন। হামাহ, শীরজ, মা'রাহ এর বাসিন্দারাও দামেশ্‌কের শর্তাবলীতে সন্ধি করে নিল। অতঃপর মুসলমানরা লাজকিয়া

(হাল্যাবের এলাকা) অভিমুখে অগ্রসর হলেন। লাজকিয়াবাসীরা মোকাবেলার জন্য বের হল এবং পরাজিত হয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল। তারপর পুনরায় মুসলমানদের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করল এবং ফিরে আসার অনুমতি চাইল। আবু উবায়দা (রাঃ) অনুমতি দিলেন। মুসলমানরা এখানে একটি মসজিদও নির্মাণ করেন।

কিন্নাসরীন বিজয়

আবু উবায়দা (রাঃ) খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) কে কিন্নাসরীন বিজয়ের জন্য পাঠিয়ে দেন। হাজের নামক স্থানে রোমানদের এক বিখ্যাত সর্দার মাইনাস মুসলমানদের মোকাবেলা করল। খালেদ (রাঃ) তাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলেন। খালেদ (রাঃ) কিন্নাসরীন পৌছুলে কিন্নাসরীনবাসীরা শহর বন্ধ করে বসে রইল। খালেদ (রাঃ) শহর অবরোধ করলেন এবং শহরবাসীদের বলে পাঠালেন যে, শহরবন্দী হয়ে কোন ফল নেই। তোমরা যদি আসমানেও আরোহণ কর, তাহলে হয়ত আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের পর্যন্ত পৌছে দেবেন, নইলে তোমাদেরকে আমাদের নিকট নামিয়ে দেবেন।

কিন্নাসরীনবাসী যখন মুসলমানদের আনুগত্য ব্যতীত কোন উপায় দেখতে পেল না, তখন শহরের দরজা খুলে দিল কিন্নাসরীনবাসীদের সাথেও দামেশ্‌কের শর্তাবলীতে সন্ধি করে নেয়া হল।

হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট খালেদ ইবনে অলীদের (রাঃ) এসকল কীর্তির ইতিবৃত্ত পৌছুলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি বললেন, খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) নিজ কীর্তিতে নিজেকে সিপাহসালার বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ আব বকর (রাঃ)এর প্রতি অসীম রহমত নাযিল করুন। তিনি আমার চেয়ে বেশী ব্যক্তিসনাক্তকারী ছিলেন। তিনি খালেদ (রাঃ)-কে সঠিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আমি খালেদ (রাঃ)-কে সেই মর্যাদা থেকে অপসারিত করেছি। তবে তা তার কোন দুর্বলতার কারণে নয় বরং আমার ভয় হয়েছিল যে, মুসলমানরা তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর ভরসা না করে বসে এবং ইসলামী বিজয়সমূহকে তাঁর যুদ্ধ পারদর্শিতা বলে মনে না করে। অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) এর পদমর্যাদা ও এখতিয়ার বাড়িয়ে দেন।
(আশহারু মাশহীরে ইসলাম ২খ. ২৬০)

বিদায় হে শাম

রোম কায়সার হিরাক্লিয়াস ইনতাকিয়ায় অবস্থানকালেই তাঁর নিকট একের পর এক পরাজয়ের খবর পৌছে। তিনি শাম থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং

www.e-ilm.weebly.com

কুসতুনতুনিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কায়সারের নিয়ম ছিল, তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের হজ্জ সেরে কুসতুনতুনিয়ায় ফিরে যাবার সময় শামদেশের সীমান্ত অতিক্রম করতে করতে এ শব্দগুলো বলতেন ঃ

"হে শাম, মুসাফিরের সালাম কবুল হোক, যার মন তোমাতে ভরেনি এবং যে তোমার প্রতি ফিরে আসবে।"

কিন্তু এবার তিনি শামশাত নামক স্থানে পৌঁছে একটি উঁচু পাহাড়ে আরোহণ করলেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে বললেন ঃ

"হে শাম, বিদায়ীর সালাম কবুল হোক। এ এমন বিরহ যার পর পুনরায় মিলনের আর সম্ভাবনা নেই"।

কায়সার কুতসতুনতুনিয়া পৌঁছুলে সেখানে জনৈক রোমান ব্যক্তি মুসলমানদের কয়েদ থেকে পালিয়ে চলে আসে। কায়সার সে রোমানকে বললেন, আমাকে মুসলমানদের কিছু অবস্থাদি শুনাও। রোমান ব্যক্তি বলল–

হে সম্রাট, তারা দিনে অশ্বারোহী, আর রাতে জাগ্রত উপাসনাকারী। তারা নিজ বিজিতদের মাল মূল্য আদায় না করে ব্যবহার করেনা এবং যে দেশে প্রবেশ করে সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তার কল্যাণ সাথে নিয়ে আসে। কিন্তু যে সম্প্রদায় তাদের মোকাবেলা করে, তারা হাতিয়ার সমর্পণ না করা অবধি তাদেরকে তারা ছাড়েনা।

কায়সার বললেন ঃ "যদি মুসলমানরা এমনই হয়, তাহলে তারা আমার পায়ের নীচের মাটিও জয় করে নেবে।" (বিদায়া নিহায়া ৮খ. ৫৩)

হালাব বিজয়

হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) হালাব অভিমুখে এগিয়ে চললেন। হালাববাসী দুর্গবন্দী হয়ে বসে রইল। ইসলামী বাহিনী শহর অবরোধ করে রাখলো। হালাববাসী যখন দেখল যে, পরিত্রাণের কোন উপায় নেই, তখন তারা হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) এর নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠাল এবং নিজেদের জানমাল সন্তান সন্ততি, গির্জা ও দুর্গের নিরাপত্তা প্রার্থনা করল। হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) তাদের আবেদন কবুল করে নিলেন এবং দামেশকের শর্তাবলীতে সন্ধি করে নিলেন। এখানেও একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

ইনতাকিয়া বিজয়

হালাব বিজয়ের পর হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) ইনতাকিয়া অভিমুখে অগ্রসর হলেন। ইনতাকিয়া ছিল রোমকায়সারের এশীয় রাজধানী এবং ভৌগোলিক

www.e-ilm.weebly.com

অবস্থান, সৈন্যকেন্দ্র ও রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক দিয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কিন্নাসরীন ও অন্যান্য বিজিত এলাকার খৃষ্টানরা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। মুসলমানরা ইনতাকিয়ার নিকটে পৌছুলে খৃষ্টানদের একটি দল শহর থেকে বের হয়ে মোকাবেলা করল এবং পরাজিত হয়ে পুনরায় শহরে ঢুকে পড়ে শহরের দরজা বন্ধ করে দিল। ইসলামী বাহিনী চতুর্দিক থেকে শহর অবরোধ করে ফেলল। কিছুকাল অবরুদ্ধ থাকার পর অবশেষে ইনতাকিয়াবাসী সন্ধির প্রস্তাব পাঠাল এবং আবেদন করল যে, তাদের মধ্যে যারা শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে চায় তাদের যাবার অনুমতি দেয়া হোক এবং যারা রয়ে যেতে চায় তাদের নিকট থেকে দামেশকের শর্তাবলী অনুযায়ী জিযিয়া নেয়া হোক। হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) তাদের আবেদন কবুল করে নিলেন।

ইনতাকিয়া বিজয়ের পর ইনতাকিয়ার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে হযরত উমর (রাঃ) এর নির্দেশে এখানে একটি সেনাছাউনি স্থাপন করা হয়।

অতঃপর হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) মা'রায়ে মিসরাইন অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং তা সন্দির মাধ্যমে জয় করেন। তারপর তিনি আশেপাশের এলাকাসমূহ জয়ের জন্য সৈন্যদলসমূহ প্রেরণ করেন। তোরস, তিলইজাজ, মানীহ ইত্যাদি জয় হয়ে গেল। হযরত আবু উবায়দা নিজে বাস অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং হাবীব ইবনে মাসলামাকে কাসেরীনের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। এসকল স্থানও সন্ধির মাধ্যমে জয় হয়ে যায়। এভাবে ইসলামী বাহিনী শামের পূর্বদিকে ফোরাত সীমানা এবং উত্তরে এশিয়ামাইনর পর্যন্ত জয় করে নেন। এসকল বিজয়ের পর হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) প্রতি পরগণার পরিচালনার জন্য আমেল নিযুক্ত করলেন এবং তা হেফাজতের জন্য সৈন্যদল মোতায়েন করলেন।

হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) নিজে ফিলিস্তীনে ফিরে এলেন। তিনি মায়সারা ইবনে মাসরূক এবং মালেক ইবনে হারিছ আশতারের নেতৃত্বে এশিয়া মাইনরের দিকে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। রোমান ও খৃষ্টান আরবদের একটি দলের সাথে তাঁদের মোকাবেলা হল। এরা শাম থেকে পালিয়ে হিরাক্লিয়াসের সৈন্যবাহিনীর সাথে গিয়ে মিলিত হতে চাচ্ছিল। (হিরাক্লিয়াস তখন শামদেশ ছেড়ে গিয়েছেন) মুসলমানরা তাদের পরাজিত করে ছত্রভংগ করে দিলেন।

হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) আরেকটি সৈন্যদল মারআশ অভিমুখে পাঠিয়ে দিলেন। এবাহিনীর নেতা ছিলেন হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ)। তিনি মারআশ জয় করলেন এবং সেখানকার দুর্গটির প্রতিখণ্ড ইট অপসারিত করলেন যাতে রোমানরা সেখানে আশ্রয় নিয়ে পুনরায় মুসলমানদের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে না পারে।

www.e-ilm.weebly.com

আজনাদাইন যুদ্ধ

শামবিজয়সমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য আমরা ইতিহাসের দিক দিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলাম। এখন আমরা পুনরায় ফিলিস্তীনের অবস্থাদির প্রতি ফিরে আসছি।

মরজেরোম ও বাইসান বিজয়ের পর রোমকায়সার রমলায় নিজে একটি সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করেন, একটি বাহিনী বায়তুল মুকাদ্দাসে সমাবেশ করেন এবং বিরাট একটি বাহিনী নিয়ে আজনাদাইন নামক স্থানে মুসলমানদের সাথে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

জর্দানে অবস্তানরত হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) নিজ বাহিনী নিয়ে আজনাদাইন অভিমুখে অগ্রসর হলেন এবং আলকামা ইবনে কালীম ফিরাসী ও মাসরূক আককীকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে এবং আইয়ূব মালেকীকে রমলার দিকে পাঠিয়ে দিলেন। সকল ঘটনা তিনি হযরত উমর (রাঃ)-কেও অবহিত করলেন।

রোমান সেনাধিনায়ক আরতাবুন চাতুর্য ও বীরত্বে অতি প্রসিদ্ধ ছিল। এদিকে হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)ও তার চেয়ে মোটেই কম ছিলেন না। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, রোমান আরতাবুনের মোকাবেলায় আমাদের আরব আরতাবুন এসেছে। দেখব কে বাজি জিতে নিয়ে যায়।

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) আজনাদাইন পৌছে রোমানদের অবরোধ করলেন। অবরোধ করে তিনি কিছুদিন পড়ে রইলেন। একদিন আমর ইবনে আস (রাঃ) নিজেই দূত হয়ে আরতাবুনের শিবিরে গেলেন এবং সেখানকার সৈন্যদের অবস্থাদি সম্পর্কে অবগতি লাভ করলেন। ফিরে এসে তিনি নিজ বাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। য়ারমূক যুদ্ধের মত ভীষণ লড়াই হল। শেষ পর্যন্ত আরতাবুন পরাজিত হল এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে পালিয়ে গেল। আলকামা ইবনে কালীম ফিরাসী বায়তুল মুকাদ্দাসের চারিদিক ঘিরে রেখেছিলেন। তিনি আরতাবুনকে পথ দিলেন এবং সে শহরে প্রবেশ করল।

আজনাদাইন বিজয়ের পর আমর ইবনে আস (রাঃ) ইজ্জা, সাবত, নাবলস, লাদ, আমাওয়াস জাবারাইন, য়াফা ইত্যাদি স্থান জয় করেন এবং তারপর বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওয়ানা হলেন*।

---

* ইসলামের ইতিহাসের ঐতিহাসিকদের মধ্যে য়ারমূক ও আজনাদাইনের ঘটনাবলীর ক্রমবিন্যাস ও তারিখ নির্ধারণে মতপার্থক্য রয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে য়ারমূক যুদ্ধের ঘটনা দামেশকে বিজয়ের পূর্বে সংঘটিত হয়েছে এবং আজনাদাইনের ঘটনা দামেশক বিজয়ের পর। ইবন জারীর তাবরীর এ -ই মত।

www.e-ilm.weebly.com

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে খাজারীও এই মত গ্রহণ করেছেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে আজনাদাইনের ঘটনা দামেশক বিজয়ের পূর্বে ঘটেছে এবয় য়ারমুক যুদ্ধের ঘটনা দামেশক বিজয়ের পরে। আল্লামা বালাজুরী ফুতুহুল বুলদান-এ এবং ইবনে ওয়াজিহ তারীখে য়াকূবীতে এই মত প্রকাশ করেছেন। আল্লামা শিবলী নু'মানী আলফারূক-এ এ মতের প্রাধান্য দিয়েছেন। এ মতপার্থক্য শুধু আরব ঐতিহাসিকদের মধ্যে নয়, ইংরেজ ও ফরাসী ঐতিহাসিকদের মধ্যেও এ মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, যাদের ইতিহাসের উৎস রোমান বর্ণনা। প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন তাঁর রোমসাম্রাজ্যের ইতিহাস'–এ এবং ফরাসী ঐতিহাসিক নোবেল ডেফারজী তাঁর 'আরব দেশের ইতিহাস'–এ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

বর্তমান যুগের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রফিক বেক মিসরী তাঁর আশহারু মাশাহীরে ইসলাম-এ বিভিন্ন মতপার্থক্য বিস্তারিত উল্লেখ করার পর নিম্নরূপ পর্যালোচনা করেছেন–

"এসব বিভিন্নমুখী বর্ণনা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, শামবিজয়ের ধারাবাহিকতায় তিনটি ঘটনা সংঘটিত হয় যেগুলো কারণ, অবস্থা ও ঘটনাস্থলের দিক দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত। (১) আজনাদাইন প্রথম যা হিজরী ১২ এর শেষে অথবা হিজরী ১৩ এর শুরুতে সংঘটিত হয়। (২) য়ারমূক, যা জুমাদাল উলা হিজরী ১৩ এ সংঘটিত হয়। (৩) আজনাদাইন দ্বিতীয়, যা হিজরী ১৪ বা ১৫ এ সংঘটিত হয়। ইবনে জারীর তাবারী এ তিন ঘটনাই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি আজনাদাইন প্রথম ও য়ারমূকের ঘটনাবলী যে বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, তা থেকে স্পষ্ট হয় না যে, য়ারমূক প্রথমে হয়েছিল না আজনাদাইন প্রথমে, নাকি এদুটো মূলতঃ একই ঘটনা ছিল। অবশ্য এ সকল বর্ণনা থেকে সাব্যস্ত হয় যে, শামবিজয়ের প্রথমদিকে আজনাদাইনে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এতে হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) শরীক ছিলেন না। বরং এ যুদ্ধ রোমানদের ও খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) এর মধ্যে হয়েছিল। এ সময় আবূবকর সিদ্দীক (রাঃ) তাকে মাহান বা বাহানের মোকাবেলার জন্য শামের প্রান্ত এলাকায় পাঠিয়েছিলেন। অথবা খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) এর পরে আসা আমীরদের মধ্যে কারো সাথে সংঘটিত হয়েছিল। খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) ও তাঁর সাথীরা বাহানকে পরাজিত করে মুসলমান আমীরগণ একাধিক বাহিনী নিয়ে শামের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়লে হিরাক্লিয়াস তাঁদের মোকাবেলার জন্য নবউদ্যমী ও বিপুল সংখ্যক সৈন্য পাঠিয়ে দেন। তখন তাঁরা সবাই পিছিয়ে এসে য়ারমূক নামক স্থানে একত্রিত হলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ)-কে ইরাক থেকে শাম প্রেরণ করেন।

হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) এর আগমনে য়ারমূকে প্রসিদ্ধ যুদ্ধ জমে উঠল। এতে রোমানদের শোচনীয় পরাজয় হয়। এ ঘটনার পর মুসলমান আমীরগণ

www.e-ilm.weebly.com

দামেশকের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তা জয় করে নিলেন। অতঃপর হযরত আবু উবায়দা (রা) হিমসের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তা জয় করে নিলেন।

এ সকল বিজয়ের পর হিরাকিয়াস নতুন সৈন্যদের ফিলিস্তীনের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। এরা আজনাদাইন নামক স্থানে একত্রিত হল। এখানে আজনাদাইন দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বর্ণনান্তরে স্বয়ং হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) শাম থেকে ফিরে এসে অংশ নেন এবং প্রসিদ্ধ রোম সর্দার আরতাবুনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে তাড়িয়ে দিলেন।

ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ মূলতঃ এই। বালাজুরী ও য়াকুবী বুঝতে ভুল করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন আজনাদাইনে একটি মাত্র যুদ্ধ হয়েছে এবং আজনাদাইন দ্বিতীয় যুদ্ধকে তাঁরা য়ারমূক যুদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন। অথচ ঐতিহাসিক প্রমাণ এ মিলে যে, য়ারমূকের ঘটনা সেস্থানে সংঘটিত হয়, যেখানে প্রথমবারে হযরত আবুবকর (রাঃ) এর জীবনের শেষকালে ইসলামী আমীরগণ একত্রিত হন এবং খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) তাঁদের সাহায্যের জন্য ইরাক থেকে শাম পৌঁছেন। ইয়াকূত তাঁর মু'জামুল বুলদান-এ লিখেন ঃ

"য়ারমুক একটি প্রান্তর, শামের অন্তর্গত গোর-এর তীরে অবস্থিত। এ নদী প্রথমে জর্দান নদীর সাথে মিলিত হয়ে পরে মৃতসাগরে পতিত হয়। হযরত আবুবকর (রাঃ) এর সময়ে এখানে রোমান ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং এতে খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) ইরাক ছেড়ে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য এসেছিলেন।

অতঃপর য়াকূত য়ারমূকের ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করার পর কা'কা' ইবনে আমরের সে কবিতা উদ্ধৃত করেছেন যাতে তিনি খালেদর (রাঃ) এর সাথে ইরাক থেকে য়ারমূক অভিমুখে রওয়ানা হওয়া, রাস্তায় গাসানীদের সাথে লড়াই এবং বুসরা জয়ের অবস্থাদি পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন।

আজনাদাইন প্রথম যুদ্ধ যে হিজরী ১২ এর শেষ বা হিজরী ১৩ এর প্রথমদিকে সংঘটিত হয়েছিল, তার দলিল কোন কোন ঐতিহাসিকের নিম্নোক্ত বর্ণনা।

হযরত আবুবকর (রাঃ) কে আজনাদাইনে রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জয়ের সংবাদ দেয়া হল। সে ছিল তাঁর জীবনের শেষ দিন। তবে একথা যথাস্থানে প্রমাণিত যে, য়ারমূক যুদ্ধকালেই হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) এর ইন্তেকাল হয়েছিল এবং মুসলমানরা যুদ্ধ চলাকালেই তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ পান।

রইল আজনাদাইন দ্বিতীয় যুদ্ধ। এ ঘটনা হিমস বিজয়ের পর হিজরী ১৫-এ সংঘটিত হয়। তাবারী যেরূপ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং বালাজুরী ও য়াকূবী এর সময় নির্ধারণ ও ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনায় কোন মতপার্থক্য করেন নি। অবশ্য তাঁরা দুজনে এটিকে আজনাদাইন দ্বিতীয় যুদ্ধের স্থানে য়ারমূক যুদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন। (আশহারু মাশাহীরে ইসলাম ২৪০-২৪৪)

এ আলোচনা উদ্ধৃত করার পর আমরা তার সাথে এতটুকু যোগ করতে চাই যে,

www.e-ilm.weebly.com

আল্লামা ইবনে কাছীরও এ প্রসঙ্গে যে সকল বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে এ মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। তবে ইবনে কাছীরের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) এর নির্দেশে হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) যখন ইরাক থেকে শাম (পথে মধ্যবর্তী এলাকা জয় করে) পৌঁছেন, তখন ইসলামী আমীরগণ একত্রিত হন নাই। হযরত খালেদ (রাঃ) হযরত আবু উবায়দা (রাঃ), মারছিদ (রাঃ) এবং শুরাহবীলকে সাথে নিয়ে হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)-এর সাহায্যের জন্য পৌঁছুলেন। তিনি তখন আরজে আরবায় অবরুদ্ধ ছিলেন। এখানে জুমাদাল উলা হিজরী ১৩এ আজনাদাইনের ঘটনা ঘটে। এযুদ্ধে কতিপয় সাহাবী শহীদ হন। অবশেষে রোমানদের সর্দার নিহত হয় এবং তারা পরাজিত হয়। অতঃপর জুমাদাল উলার শুরুতে য়ারমূক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

আল্লামা ইবনে কাছিরের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, আজনাদাইন প্রথম–এ রোমানদের সর্দার ছিল কেকলান, যে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয় এবং আজনাদাইন দ্বিতীয়–এ আরতাবুন। (দ্রষ্টব্য বিদায়া নিহায়া ৭খ. ৪–৭)

এ প্রসঙ্গে এ বিষয়টির প্রতিও ইংগিত দেয়া জরুরী যে, হযরত খালেদ (রাঃ) এর অব্যাহতি প্রদানের সময় নির্ধারণে মতপার্থক্যর উপর ভিত্তি করে হয়েছে। কেননা এ বিষয় সাব্যস্ত যে, হযরত খালেদের অব্যাহতির ঘটনা য়ারমূক যুদ্ধের কালেই সংঘটিত হয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

www.e-ilm.weebly.com

বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বায়তুল মুকাদ্দাস পৌছে নিজ সৈন্যদের শহরের চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন। এ সময়েই কিন্নাসরীন, হালাব ইত্যাদি জয় করে সেরে হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) এবং হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ)ও সেখানে পৌছে গেলেন।

কুদ্সবাসী যখন দেখল যে, সকল বড় বড় ইসলামী নেতা বায়তুল মুকাদ্দাস পৌছে গেছেন এবং কায়সারের পক্ষ থেকে কোন সাহায্য লাভেরও সম্ভাবনা নেই, তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল। আজনাদাইনে পরাজিত হয়ে যে আরতাবুন বায়তুল মুকাদ্দাসে আশ্রয় নিয়েছিল, সেও একরাতে নীরবে মিসরে পালিয়ে গেল। অতএব, তারা দৃঢ় সংকল্প করে নিল যে, তারা হাতিয়ার ফেলে দিবে এবং শহর মুসলমানদের হাতে অর্পণ করবে। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের একটি দুশ্চিন্তা ছিল।

তাদের জানা ছিল যে, মুসলমানরা যেসকল শহর জয় করেছে সেখানকার বাসিন্দাদের জানমালের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেনি। তাদের সম্পত্তি ও উপাসনালয়ও দখল করে নি। কিন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের ব্যাপার ছিল ভিন্ন প্রকৃতির।

বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের নিকটও ঠিক তেমনি পবিত্র বিবেচিত ছিল যেমন খৃষ্টানদের নিকট। পূর্ববর্তী নবীগণের অসংখ্য স্মৃতি এবং স্বয়ং শেষ নবী (সাঃ)-এর মেরাজ রজনীর প্রথম মঞ্জিল ছিল এ-ই মসজিদুল আকসা। এজন্য খৃষ্টানদের আশংকা ছিল যে, পাছে মুসলমানরা এ পবিত্র স্থানের খৃষ্টান তীর্থস্থানগুলো তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে না নেয়। তাই কুদসবাসী ইসলামী নেতাদের নিকট এই প্রস্তাব পেশ করল যে, যদি খলীফাতুল মুসলিমীন স্বয়ং আগমণ করে সন্ধির চুক্তিপত্র লেখেন এবং তাতে নিজে স্বাক্ষর করেন, তাহলে আমরা শহর মুসলমানদের হাতে অর্পণ করতে প্রস্তুত রয়েছি।

ইসলামের খলীফার প্রথম শাম সফর

হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) খৃষ্টানদের এ অভিপ্রায়ের কথা হযরত উমর (রাঃ)-কে অবহিত করেন এবং লিখলেন যে, আপনি যদি আগমন করেন, তাহলে এ যাত্রাটি কোন খুনখারীবী ব্যতিরেকেই নিষ্পন্ন হয়ে যাবে। হযরত আলী (রাঃ)-কে নিজ স্থলাভিষিক্ত করে হযরত উমর (রাঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। জাবিয়া নামক স্থানে পৌছুলে ইসলামী বাহিনীর নেতৃবৃন্দ খলীফাকে অভ্যর্থনা জানালেন। প্রথমে য়াযীদ (রাঃ), অতঃপর হযরত আবু উবায়দা (রাঃ), অতঃপর হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) খলীফার

www.e-ilm.weebly.com

খেদমতে উপস্থিত হলেন। নেতৃবৃন্দ দীবাজ (এক ধরণের রেশমী কাপড়) জামা পরিহিত ছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) নিজ নেতৃবৃন্দের এ অবস্থা দেখে খুব ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি কতিপয় কংকর মাটি থেকে উঠিয়ে তাঁদের প্রতি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, তোমরা দুশো বছর পরেও এরূপ করলে আমি তোমাদের অপসারণ করতাম।

নেতৃবৃন্দ বললেন, আমিরুল মুমিনীন, এ সকল জামা আমরা অস্ত্র থেকে শরীর রক্ষার জন্য ব্যবহার করেছি। হযরত উমর (রাঃ) বললেন- তাহলে আচ্ছা। (আশহারু মাশাহীরে ইসলাম ২খ. ২৫০)

সন্ধির চুক্তিপত্র

এখানে কুদসবাসীদের প্রতিনিধিরা খলীফাতুল মুসলিমীনের খেদমতে উপস্থিত হয়ে সন্ধির আবেদন জানালো। হযরত উমর (রাঃ) সে আবেদন মঞ্জুর করে নিলেন এবং নিজ স্বাক্ষরে নিম্নরূপ চুক্তিপত্র লিখে দিলেন ঃ

আল্লাহর বান্দা উমর, আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে ঈলিয়াবাসী (বায়তুল মুকাদ্দাস) দের এ নিরাপত্তাপত্র দেয়া হচ্ছে। ঈলিয়াবাসীদের জান, মাল, গির্জা, ক্রুশ সব কিছুর নিরাপত্তা দান করা হচ্ছে। অসুস্থ, সুস্থ এবং সকল ধর্মের লোকের জন্য এ নিরাপত্তা প্রযোজ্য হবে। অঙ্গীকার করা হচ্ছে যে, তাদের উপাসনালয়সমূহ দখল করা হবে না, সেগুলো ধ্বংসও করা হবে না, তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না এবং কাউকে এমনিতেও কষ্ট দেয়া হবে না। তবে তাদের সাথে য়াহূদী থাকতে পারবে না। ঈলিয়াবাসীদের জন্য অপরিহার্য যে, তাঁরা জিযিয়া আদায় করতে থাকবেন এবং নিজেদের শহর থেকে যুদ্ধবাজ রোমানদের বের করে দেবেন। যে রোমান ব্যক্তি শহর থেকে বেরিয়ে যাবে, তার জানমালের উপর কোনরূপ আঘাত করা হবে না, যাতে সে নিরাপদে নিজ বাসভূমে পৌছে যেতে পারে। রোমানদের সাথে ঈলিয়াবাসীদের কেউ যেতে চাইলে যেতে পারবে। কিন্তু কোন রোমান ব্যক্তি শান্তিপ্রিয়ভাবে থেকে যেতে চাইলে তারও এসব শর্ত মোতাবেক থাকবার অনুমতি রয়েছে।

এ নিরাপত্তা চুক্তি আল্লাহ, তাঁর রসূল, তাঁর (সঃ) খলীফাগণ ও সকল মুমিন দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করছে। (ইতমামুল অফা, তাবারী থেকে উদ্ধৃত পৃ. ১২৬)

বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ

এ চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর কুদ্সবাসী শহরের দরজা খুলে দিল এবং হযরত উমর (রাঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসে যাবার মনস্থ করলেন।

বায়তুল মুকাদ্দাস সফরের জন্য হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট একটি তুর্কি ঘোড়া পেশ করা হলো। তিনি তাতে আরোহণ করলে ঘোড়াটি ছটফট করতে

লাগলো। তিনি নেমে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন, রে হতভাগা! তুই এ অহংকারী চাল কোথায় শিখলি? তারপর নিজ ঘোড়া আনিয়ে তাতে রওয়ানা হলেন। এ ঘটনার পর তিনি আর কখনও তুর্কি ঘোড়ায় আরোহণ করেননি।

হযরত উমর (রাঃ) রাতের বেলায় বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করলেন। সর্বপ্রথমে মসজিদুল আকসায় উপস্থিত হলেন এবং দাউদী মিহরাব-এ দু রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজ আদায় করলেন। তারপর সকালে সেখানেই জামাআতের সাথে ফজরের নামাজ আদায় করলেন।

তিনি খৃষ্টানদের প্রসিদ্ধ গির্জা কানীসা-ই কামামা পরিদর্শন করলেন। পরিদর্শনকালে নামাজের সময় হয়ে গেল। তাঁর সাথের রোমান জেনারেল বললেন, এখানেই নামাজ পড়ে নিন। কিন্তু তিনি এ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন না এবং বাইরে বেরিয়ে সিড়ির উপর একাকী নামাজ আদায় করে নিলেন। তিনি রোমান জেনারেলকে বললেন, আমি এখানে নামাজ পড়লে আমার পরে মুসলমানরা এ গির্জাটি তোমাদের হাত থেকে কেড়ে নিত এই বলে যে, এখানে আমাদের খলীফা নামাজ পড়েছিলেন। অতঃপর তিনি রোমান জেনারেলের নিকট এমর্মে একটি ফরমান লিখে দিলেন যে, গির্জার সিড়ির উপরও জামাআতের সাথে নামাজ আদায় করা যাবে না এবং আজান দেয়া যাবেনা। (মুহাজারাতে খাজারী ২খ. ৯)

উমর মসজিদ নির্মাণ

হযরত উমর (রাঃ) রোমান জেনারেলকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি একটি মসজিদ তৈরী করতে চাই। এর জন্য কোন স্থানটি উপযুক্ত হবে? তিনি বললেন, সাখরায় তৈরী করুন। এখানে আল্লাহ তাআলা হযরত য়া'কূব (আঃ) এর সাথে কথা বলেছিলেন। খৃষ্টানরা স্থানটিকে য়াহূদীদের বিরোধিতার উত্তেজনায় আবর্জনাস্থল করে রেখেছিল। হযরত উমর (রাঃ) স্থানটি সাফ করতে নির্দেশ দিলেনএবং নিজেও জামার আঁচলে ভরে ভরে মাটি ফেলতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে কা'ব আহবার জোরে তাকবীর বলে উঠলেন। সকল মুসলমান তাঁর সাথে যোগ দিলেন। হযরত উমর (রাঃ) কা'বকে জিজ্ঞেস করলেন, তাকবীর দেবার একি স্থান? কা'ব জবাব দিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি যা করছেন, এখন থেকে পাঁচ শত বছর পূর্বে একজন ইসরাঈলী পয়গম্বর তা জানিয়েছিলেন। আমাদের ধর্মীয় কিতাবসমূহে তা সংরক্ষিত রয়েছে।

আবর্জনা সাফ হয়ে গেলে তিনি কা'বকে জিজ্ঞেস করলেন, মসজিদের মিহরাব কোনদিকে করা হবে? কা'ব বললেন, সাখরার দিকে করুন। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, হে কা'ব তোমার মধ্য থেকে এখনও য়াহুদিত্বের রং গন্ধ দূর

www.e-ilm.weebly.com

হয়নি। তুমি যখন সাখরায় এসে নিজের জুতা খুলে ফেললে, তখনই আমি তোমার এ মনোভাব বুঝতে পেরেছিলাম। কা'ব বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমার উদ্দেশ্য ছিল আমার পা দিয়ে এ স্থান স্পর্শ করে বরকত লাভ করি। সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্য ছিলনা। পরে হযরত উমর (রাঃ) নির্দেশ দিলেন যে, মিহ্‌রাব কিবলার দিকে করা হোক। এ মসজিদ 'উমর মসজিদ' নামে প্রসিদ্ধ ।

(আশহারু মাশাহীরে ইসলাম ২খ. ২৫২)

বায়তুল মুকাদ্দাসেরই শর্তে রমলাও জয় হয়ে যায়। হযরত উমর (রাঃ) ফিলিস্তীন প্রদেশ দুভাগে বিভক্ত করেন। এক অংশের সদর করেন বায়তুল মুকাদ্দাস এবং সেখানকার প্রশাসক নিযুক্ত করেন আলকামা ইবনে মাজরাযকে। দ্বিতীয় অংশের সদর করেন রমলা এবং সেখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করে হযরত উমর (রাঃ) মদীনায় ফিরে গেলেন। এ ঘটনা হিজরী ১৬ সনের।

হিমসে রোম আক্রমণ

মুসলমানদের এ গৌরবময় বিজয়ধারায় রোমানদের সাহস দমে গেল এবং হিরাক্লিয়াসের বিশাল রোম সাম্রাজ্যের পূর্ববাহু ভেঙ্গে গেল। হিরাক্লিয়াস শাম ও ফিলিস্তীন থেকে একেবারে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে জাজীরাবাসীদের পক্ষ থেকে তাঁর নিকট প্রস্তাব এল যে, মুসলমানদের সাথে শেষবারের মত মোকাবেলা করার সাহস করলে আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়ে আপনার সাহায্যের জন্য হাজির হবো।

জাজীরাবাসীদের এ পত্র হিরাক্লিয়াসের নিষ্প্রভ অন্তরে আশার আলো সৃষ্টি করল এবং তিনি বিক্ষিপ্ত রোমশক্তি একত্রিত করে জলপথে বিশাল বাহিনী নিয়ে হিমসের দিকে যাত্রা করলেন। জাজীরাবাসীও ত্রিশ হাজারের বাহিনী নিয়ে কায়সারের সাহায্যের জন্য পৌঁছে গেল।

হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) স্বয়ং হিমসে অবস্থান করছিলেন। তিনি কিন্নাসরীন থেকে হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ)-কে ডেকে পাঠালেন এবং লড়াইয়ের ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) বললেন, আমাদের ময়দানে বেরিয়ে মোকাবেলা করা উচিত। কিন্তু অন্য নেতারা হযরত খালিদ (রাঃ) এর সাথে একমত হলেন না। তাঁরা বললেন, শত্রুবাহিনীর সংখ্যা অনেক বেশী। আমাদের নিকট সাহায্য না আসা পর্যন্ত আমাদের শহরবন্দী হয়ে বসে মোকাবেলা করা উচিত। হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) দ্বিতীয় মতটিকে প্রাধান্য দিলেন এবং শহরবন্দী হয়ে রইলেন। রোমবাহিনী শহর অবরোধ করে নিল।

www.e-ilm.weebly.com

শামের বিভিন্ন শহরে সৈন্য ছাউনি ছিল। কিন্তু এ সময়ে সে সকল স্থান থেকে সৈন্যদের সরানো আশংকামুক্ত ছিলনা। সে কারণে হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) সকল বিষয় হযরত উমর (রাঃ)-কে অবহিত করলেন এবং খেলাফত দরবার থেকে সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

হযরত উমর (রাঃ) কুফায় হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াককাস (রাঃ)-কে নির্দেশ পাঠালেন যে, আবু উবায়দা (রাঃ) এর সাহায্যের জন্য কা'কা' ইবনে আমরকে হিমসে পাঠিয়ে দিন এবং ইয়াজ ইবনে গানামকে অন্যান্য সেনাসর্দারদের সাথে জাজীরবাসীকে শায়েস্তা করতে জাজিরা পাঠিয়ে দিন। তদুপরি হযরত উমর (রাঃ) যথোপযুক্ত একটি বাহিনী নিয়ে স্বয়ং হিমসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। জাজীরাবাসীরা যখন জানতে পারলো যে, ইসলামী বাহিনী খোদ তাদের দেশে প্রবেশ করেছে তখন তারা রোমানদের ছেড়ে নিজেদের ঘর সামলাতে পালাতে শুরু করলো। এদিকে রোম বাহিনী যখন সংবাদ পেল যে, খলীফাতুল মুসলিমীন স্বয়ং নিজ সিপাহসালারের সাহায্যার্থে আসছেন, তখন তাদের সাহস ভেঙ্গে গেল। এসময় হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) ইসলামী বাহিনীর সামনে এক তেজোদীপ্ত বক্তৃতা করলেন এবং তাদেরকে শহর থেকে বের হয়ে হামলা করতে নির্দেশ দিলেন। ইসলামী বাহিনী জোরেশোরে হামলা করল। রোম বাহিনী দিশেহারা হয়ে পালিয়ে গেল এবং তারা আর টিকতে পারল না।

কা'কা' নিজে একশত বাহিনী সহ অগ্রসর হয়ে হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) এর সাথে মিলিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বাহিনী বিজয়ের তিন দিন পরে হিমস পৌঁছে। তেমনি হযরত উমর (রাঃ)ও সারা নামক স্থানে পৌঁছে মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ পেলেন। এ ঘটনা হিজরী ১৭ সনের।

জাজিরা বিজয়

জাজিরা ফোরাত ও দজলার মধ্যবর্তী এলাকার উত্তর অংশকে বলা হয়। এ দু শহর তিকরীত ও মোসেল পূর্বে বিজয় হয়ে গিয়েছিল। এ দু শহরের জয়ের আলোচনা ইরাকের বিজয়সমূহের প্রসঙ্গে করা হয়েছে। হিমসে রোমানদের আক্রমণে জাজিরাবাসী সাহায্য করলে হযরত উমর (রাঃ) এর নির্দেশে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) তাদের শায়েস্তা করতে ইয়ায ইবনে গানামকে পাঠিয়ে দেন। হিমসে রোমানদের পরাজয়ের পর হযরত উমর (রাঃ) ইয়ায ইবনে গানামকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন তার বাহিনীকে জাজিরায় ছড়িয়ে দেন এবং অবিজিত সকল এলাকাও জয় করে নেন। ইয়ায ইবনে গানাম তখন

www.e-ilm.weebly.com

মায়সারা ইবনে মাসরুক, সায়ীদ ইবনে আমের, সাফওয়ান ইবনে মা'কিলকে সাথে নিয়ে জাজিরায় সৈন্য চালিয়ে দিলেন। রিক্কা, রুহা নাসিবীন, হিরান, সিময়াত, সানজার, কারকীসা, সারুজ, জাসার, মানবাজ, আমুদ এবং অন্যান্য শহর সাধারণ মোকাবেলার পর জয় করে নেয়া হলো। ইয়ায ইবনে গানাম বিজয়ের নিশান ওড়াতে ওড়াতে পশ্চিমে শাম মরুভূমি এবং পূর্বে আর্মেনিয়া ও কুর্দিস্তান পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। অতঃপর তিনি দরব অতিক্রম করে তিবলিস পৌঁছুলেন। সেখান থেকে খালাত এবং ওখান থেকে আইনে হামিজা পৌঁছে শ্বাস নিলেন।

জাজিরা বিজয়ের পর জাজিরার আরব খৃষ্টান সর্দারদের প্রতিনিধিদল হযরত উমর (রাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং আবেদন করল যে, আমাদের নিকট থেকে জিযিয়া না নেয়া হোক। কেননা আমরা এটি অপমান মনে করি। সাথে সাথে এ হুমকিও দিল যে, আপনি যদি আমাদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, তাহলে আমরা দেশ ছেড়ে রোমানদের এলাকায় চলে যাবো।

হযরত উমর (রাঃ) বললেন, তোমরা রোমানদের দেশে প্রবেশ করলে আমি রোম কায়সারকে লিখে তোমাদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসব। তবে হযরত আলী (রাঃ) সুপারিশ করে এ সিদ্ধান্ত করে দিলেন যে, তারা জিযিয়ার দ্বিগুণ অর্থ আদায় করবে। কিন্তু তা জিযিয়া নামে আখ্যায়িত হবে না। এ ঘটনা হিজরী ১৭ সনের।

মহামারী প্লেগ

হিজরী ১৭ সনের শেষভাগে ১৮ সনের প্রথম দিকে শাম, ইরাক ও মিসরে প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিল। হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছুলে তিনি স্বয়ং এর বিহিত ব্যবস্থা করার জন্য শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। সারা নামক স্থানে পৌঁছুলে সেনা সর্দারগণ অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত হলেন। সর্দারগণ মহামারীর তীব্রতা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন এবং আরজ করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার এখানে আগমন করা সমীচীন হবে না। তিনি মুহাজির ও আনসারদের সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁদের মতামতে পার্থক্য দেখা গেল। তিনি প্রত্যাবর্তনের রায় প্রাধান্য দিলেন। কিন্তু হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) তাকদীরের ব্যাপারে খুব দৃঢ় ছিলেন। তিনি বলতে লাগলেন, হে উমর, আপনি কি আল্লাহর তাকদীর থেকে পালাচ্ছেন? হযরত উমর (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর তাকদীর থেকে আল্লাহর তাকদীরের প্রতি পালিয়ে যাচ্ছি।

অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবু উবায়দা (রাঃ)-কে পৃথকভাবে নিয়ে এ বিষয়ে আলাপ করলেন। পরের দিন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)ও এসে গেলেন। তিনি বললেন, আমি রসুলুল্লাহ (সঃ) থেকে শুনেছি, যখন তোমরা শুনবে যে, কোন শহরে এ মহামারী চলছে, তখন সেখানে

যাবে না। আর যদি তোমরা কোন শহরে থাক আর সেখানে এ মহামারী ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তার ভয়ে সেখান থেকে পালাবে না। হযরত উমর (রাঃ) এ হাদীছ শুনে নিজ মতের শুদ্ধতায় আল্লাহর শুকুর আদায় করলেন এবং মদীনায় ফিরে এলেন।

মদীনায় পৌঁছে হযরত উমর (রাঃ) মহামারীর ধ্বংসকারিতার কথা জানতে পারলেন। তিনি হযরত আবূ উবায়দা (রাঃ) কে পত্র লিখলেন, আপনার নিকট আমার কিছু কাজ আছে। কিছুদিনের জন্য মদীনায় আসুন। হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) জবাব দিলেন, আমি অন্য মুসলমানদের ছেড়ে একাকী মদীনায় আসতে পারি না। আমার নিকট আমীরুল মুমিনীন–এর যে কাজ রয়েছে তা আমি জানি। আপনি এমন ব্যক্তির জীবন কামনা করছেন, যে জীবিত থাকবে না। আমাকে হুকুম পালন থেকে ক্ষমা করবেন।

অবশেষে হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) রোগাক্রান্ত হলেন। রোগ বেড়ে গেলে তিনি মুসলমানদেরকে নেক কাজের অসিয়ত করলেন, মুআজ ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং উর্ধবন্ধুর সান্নিধ্যে গমন করলেন। (আশহারু মাশাহীরে ইসলাম ৩খ. ইবনে আসাকিরের বরাতে)

আমর ইবনে আস (রাঃ) লোকদের বললেন, এ সেসকল বিপদের অন্তর্গত যা বনি ইসরাঈলের উপর আপতিত হয়েছিল। অতএব এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত। মুআজ (রাঃ) এ কথা শুনে খুতবা দিলেন এবং বললেন, এ বিপদ নয়, বরং আল্লাহর রহমত। পালানোর প্রয়োজন নেই। খুতবার পরে তাবুতে এসে দেখেন পুত্র অসুস্থ। তখন তিনি বললেন–

يا بنى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين

"হে বৎস, অমোঘ বিধি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে, অতএব তুমি কোনরূপ সংশয় করো না।"

পুত্র দৃঢ়চিত্তে জবাব দিলেন–

ستجدنى ان شاء الله من الصابرين

"ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্গত পাবেন।"

কিছুক্ষণের মধ্যে পুত্র ইন্তেকাল করলেন। আর হযরত মুআজ (রাঃ) স্বয়ং আক্রান্ত হলেন এবং অত্যন্ত শান্ত ও স্থিরভাবে স্রষ্টার নিকট নিজ জীবন সমর্পণ করলেন।

হযরত মুআজ (রাঃ) তাঁর পরে হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)-কে নিজ স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। আমর ইবনে আস (রাঃ) সৈন্যদের নিয়ে পাহাড়ের উপর চলে গেলেন এবং সেখানে সৈন্যদের বিভিন্ন স্থানে বিভক্ত করে দিলেন। তখন কোথাও কোথাও এ মহামারী থেকে রেহাই পাওয়া গেল। আমর ইবনে আস (রাঃ) এর এ কর্ম কৌশল হযরত উমর (রাঃ) খুব পছন্দ করলেন। এ মহামারী শামে ইসলামী শক্তির অপরিমেয় ক্ষতি সাধন করে। অর্ধ দুনিয়া জয়ের

www.e-ilm.weebly.com

জন্য যথেষ্ট বিশ হাজার জানবাজ মুজাহিদ এ মহামারীতে আল্লাহর রহমতের কোলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ), হযরত মুআজ ইবনে জাবাল (রাঃ), হযরত য়াযীদ ইবনে আবী সুফিয়ান (রাঃ) প্রমুখ মনীষীও ছিলেন।

মুসলমানরা যদি বিজিত এলাকার জনসাধারণের মন সদাচার ও সুশৃংখলা দ্বারা জয় করে না দিতেন, তাহলে রোমানরা মুসলমানদের এ বিপদে ফায়দা হাসিল করতে পারত।

সর্বশেষ শাম সফর

মহামারীর তীব্রতা শেষ হয়ে গেলে শামের ব্যবস্থাপনা ঠিক করা ও মৃতদের সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করার জন্য হযরত উমর (রাঃ) স্বয়ং শামে রওয়ানা হলেন। তিনি হযরত আলী (রাঃ) এর মদীনায় নিজ ভারপ্রাপ্ত করে যান।

হযরত উমর (রাঃ) ঈলার নিকটবর্তী পৌছে নিজ ঘোড়া ভৃত্যকে দিয়ে নিজে তার উটে আরোহণ করলেন। লোকেরা প্রশ্ন করতে লাগল আমীরুল মুমিনীন কোথায়? বলল, তোমাদের সামনে। এই বেশে তিনি ঈলায় প্রবেশ করেন।

শাম পৌছে সর্বপ্রথম তিনি মৃতদের সম্পত্তি তাদের ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। দেশে ঘুরে ফিরে সেখানকার ব্যবস্থাপনা ঠিকঠাক করলেন। শামের সীমান্তে সৈন্যদল মোতায়েন করলেন এবং য়াযীদ ইবনে আবী সুফিয়ান (রাঃ) এর স্থানে তাঁর ভাই মুআবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান (রাঃ)-কে দামেশকের শাসক নিযুক্ত করলেন।

এখানে হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট আবেদন করা হলো যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল (রাঃ)-কে একদিন আজান দেওয়ান হোক। হযরত বেলাল (রাঃ) আজান দিলেন। সবাই রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সময় স্মরণ করে কেঁদে ফেললেন এবং এত কান্নাকাটি করলেন যে সবার দাড়ি ভিজে গেল।

মহা দুর্ভিক্ষ

পরবর্তী বছর হিজাজে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এ সময়ে হযরত উমর (রাঃ) অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিপন্নদের সাহায্যের ব্যবস্থা করলেন। তিনি বিজিত দেশসমূহ থেকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যপানীয় আনালেন এবং অভাবীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। শামের আমীর খাদ্যবাহী চারশত উট পাঠালেন। এ সময় আমর ইবনে আস (রাঃ) মিসর জয় করেছেন। তিনি খাদ্যশস্যের এতবড় একবহর পাঠালেন যে, সে বহরের এক প্রান্ত মিসরে আর অপর প্রান্ত ছিল মদীনায়।

www.e-ilm.weebly.com

হযরত উমর (রাঃ) শপথ করেছিলেন যে, এ দুর্ভিক্ষ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি ঘি ও মধু (যা খলীফার দস্তরখানে সর্বোত্তমখাদ্য ছিল) ব্যবহার করবেন না।

তিনি জয়তুনের তেল সহকারে রুটি আহার করতে লাগলেন। এতে এক সময় তার পেটে গোলযোগ দেখা দিল। এ অবস্থা দেখে একদিন তাঁর ভৃত্য বাজার থেকে কিছু ঘি ও মধু কিনে আনল এবং নিবেদন করল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি কসমের কাফফারা আদায় করুন এবং এ আহার করুন। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, তা কিভাবে হয়? আমি যদি কষ্ট ভোগ না করি তাহলে অন্যদের কষ্ট কিভাবে অনুভব করব? অতঃপর তিনি সে ঘি ও মধু সদকা করে দিতে নির্দেশ দিলেন। (আশহারু মাশাহীরে ইসলাম ৩৬১-৩৬২)

বস্তুতঃ এ সকল বিপদের বর্ষণ হযরত উমর (রাঃ) এর ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা প্রকাশ করে দেয়। এতে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, হযরত উমর (রাঃ) শুধু একজন শ্রেষ্ঠ বিজয়ীই ছিলেন না। বরং সর্বোত্তম কৌশলী ও ব্যবস্থাপকও ছিলেন।

মিসর বিজয়

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) মিসর জয়ের খুবই আকাংক্ষী ছিলেন। জাহিলিয়াত যুগে তিনি মিসর ভ্রমণ করেছিলেন। এখানকার শ্যামলশোভা ও ধনৈশ্বর্যের দৃশ্য তাঁর চোখে ঘুর্ণিপাক খাচ্ছিল এবং এ জয়ের আগ্রহ তাঁর অন্তরে হিল্লোল সৃষ্টি করছিল।

হিজরী ১৮ সনে মহামারী প্লেগের পরে হযরত উমর (রাঃ) শামে আগমন করেন। তখন তিনি হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট মিসর আক্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করেন।

ইসলামী সৈন্যরা এ সময় শাম, জাজিরা ও পারস্যের দূর দূরান্ত এলাকায় ছড়িয়ে ছিল। তদুপরি মহামারী প্লেগ ইসলামী শক্তির যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করেছিল। সে কারণে হযরত উমর (রাঃ) একটু ইতস্ততঃ করলেন। কিন্তু হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) লাগাতার পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি তাঁকে মিসর আক্রমণের অনুমতি দিলেন এবং চার হাজার সৈন্য তাঁর সাথে দিলেন। তথাপি হযরত উমর (রাঃ) নিজ রায় বদলাবার অধিকার সংরক্ষণ করলেন এবং বললেন যে, মিসরের সীমায় প্রবেশ করার পূর্বে যদি আমার নিষেধাজ্ঞা আপনার নিকট পৌঁছে, তাহলে ইতস্ততঃ না করে ফিরে আসবেন।

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) মিসরের সীমায় প্রবেশ করতে পারেন নি। ইতোমধ্যে তাঁর নিকট হযরত উমরের নিষেধাজ্ঞাপত্র এসে পৌঁছুল। কিন্তু তিনি বিজয়ের এতই আগ্রহী ছিলেন যে, তিনি মিসর সীমায় প্রবেশ না করে সে পত্র খুলে দেখলেন না।

www.e-ilm.weebly.com

মিসর রাজনৈতিক দিক দিয়ে রোম সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। সেখানকার শাসক মুকাওকিস, যিনি কিবতীদের ধর্মীয় ও পার্থিব নেতা ছিলেন, তিনি রোম সম্রাটের করদাতা ছিলেন। মিসরে রোম স্বার্থ রক্ষার জন্য কায়সারের পক্ষ থেকে একজন রোমান অফিসার ও থাকত। সে অফিসারের অধীনে কসরে শামা ও আলেকজান্দ্রিয়ায় বিপুল সংখ্যক রোম সৈন্য থাকত।

প্রাথমিক বিজয়সমূহ

মিসরে রোমানদের সাথে মুসলমানদের প্রথম মোকাবেলা হয় ফরমা নামক স্থানে। এক মাস যাবত সেখানে লড়াই অব্যাহত রইল। অবশেষে রোমানদের পরাজয় হলো এবং মুসলমানরা কাওয়াসের অভিমুখে অগ্রসর হলেন। এখানে সাধারণ মোকাবেলার পর জয় হয়ে গেল। অতঃপর মুসলমানরা বিলবিস পৌঁছে তা অবরোধ করলেন। বিলবিসে মুকাওকিসের কন্যা আরমানূসা অবস্থান করছিল। মুকাওকিস তাকে হিরাক্লিয়াসপুত্র কস্তুনতিনের সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন এবং সে অত্যন্ত জাকজমকের সাথে কায়সারিয়া যাচ্ছিল। মুসলমানরা বিলবিস জয় করলে আরমানূসাও বন্দী হলো। কিন্তু আমর ইবনে আস (রাঃ) আরমানূসাকে তার যাবতীয় উপহার সামগ্রীসহ নিরাপত্তার সাথে মুকাওকিসের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। মুকাওকিসের অন্তরে হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)-এর এ মহানুভবসুলভ কর্মপদ্ধতিতে অত্যন্ত প্রভাব সৃষ্টি হলো।

(আশাহারু মাশাহীরে ইসলাম, ওয়াকিদীর বরাতে ৩খ. ৫৭৮)

কসরেশামা বিজয়

বিলবিস থেকে মুসলমানরা বাবিলিওনের দিকে অগ্রসর হলেন। এ ছিল প্রাচীন মিসর (ফুসতাত) এর অবস্থান স্থলে নীলনদের পূর্বতীরে এক সুদৃঢ় দুর্গ। এরই আরেক নাম ছিল কসরে শামা। তারই সোজাসুজি নীলনদের পশ্চিম তীরে মিসরের প্রাচীন রাজধানী মনফ অবস্থিত ছিল। কসরে শামায় রোমসিপাহসালার উআয়রিজ নিজ সৈন্যদের নিয়ে অবস্থান করত এবং মনফ ছিল মিসররাজ মুকাওকিসের অবস্থান স্থল।

মুসলমানরা দীর্ঘকাল বাবিলিওন অবরোধ করে রাখলেন। কিন্তু জয়ের কোন উপায় পরিলক্ষিত হলো না। অবশেষে হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট সাহায্যের জন্য লিখলেন। হযরত উমর (রাঃ) বারো হাজার সৈন্য তাঁর সাহায্যের জন্য পাঠালেন। এ বাহিনীর সর্দারদের মধ্যে হযরত জুবায়র ইবনে আওওয়াম (রাঃ), মিকদাদ ইবনে আমর (রাঃ), উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) এবং মাসলামা ইবনে মাখলাদ (রাঃ) এর ন্যায় জানবাজও শামিল ছিলেন। হযরত উমরের ভাষায় এ চারজনের প্রত্যেকে এক হাজারের সমান

www.e-ilm.weebly.com

ছিলেন। এ সাহায্য পৌছুলে মুসলমানদের মনোবল বেড়ে গেল। হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) কামান স্থাপন করে দুর্গের উপর পাথর বর্ষণ শুরু করলেন। হযরত জুবায়র (রাঃ) অত্যন্ত সাহসী মানুষ ছিলেন। তিনি সিড়ি লাগিয়ে দুর্গের প্রাচীরের উপর আরোহণ করলেন এবং জোরে তাকবীর ধ্বনি দিলেন। অন্য মুসলমানরাও তারপরে প্রাচীরে আরোহণ করলেন এবং সবাই একত্রিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিলেন। রোমানরা দুর্গের শীর্ষ থেকে তাকবীর ধ্বনি শুনে দিশেহারা হয়ে গেল। তারা পূর্ব থেকে দুর্গের পশ্চাৎ ভাগে নীলনদে নৌকার ব্যবস্থা করে রেখেছিল। এ সকল নৌকায় বসে বসে তারা জাজীরায়ে রওযার দিকে পালিয়ে গেল।

বাবিলিওন (কসরে শামা) বিজয়ের পর মুকাওকিসের সিংহাসনভবন মানফ মুসলমানদের তলোয়ারের নাগালে এসে গেল। মুকাওকিস মুসলমানদের মোকাবেলায় রোমানদের পরাজয় স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তদুপরি নিজ কন্যা ফেরতদানের কারণে এমনিতেই তিনি মুসলমানদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি নিজ সর্দারদের সাথে পরামর্শ করে আমর ইবনে আস (রাঃ) -এর নিকট সন্ধির জন্য দূত প্রেরণ করলেন। আমর ইবনে আস (রাঃ) মুকাওকিসের দূতদেরকে দুদিন যাবত রেখে দিলেন যেন তারা মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে অবগতি লাভ করতে পারে। অতঃপর যথাযথ জবাব দিয়ে তাদেরকে বিদায় দিলেন। মুকাওকিসের দূতেরা তাঁর নিকট ফিরে এলে তিনি তাদের নিকট মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা জবাব দিলো-

হে বাদশাহ, মুসলমানরা এমন জাতি যাদের নিকট জীবনের চেয়ে মৃত্যু প্রিয়। যাদের নিকট অহংকারের চেয়ে বিনয় প্রিয়। তাদের কেউ পৃথিবী ও পার্থিব বস্তুর লোভী নয়। তারা মাটিতে বসতে লজ্জাবোধ করে না এবং দস্তরখান ব্যতীত আহার করে নেয়। তাদের নেতাও তাদেরই মত। কোন ব্যাপারে তাদের চেয়ে স্বতন্ত্র নয়। উচু নীচু ও মনিব ভৃত্যের কোন ভেদাভেদ তাদের মধ্যে নেই। নামাজের সময় হলে তারা সবাই উযু করে এক কাতারে বিনয় ও নম্রতার সাথে আল্লাহর ইবনেদতে মগ্ন হয়ে যায়।

মুকাওকিস মুসলমানদের এ গুণাবলীর কথা শুনে নিজ কওমকে বললেন, হে কওম! এ লোকেরা পাহাড়ের সাথেও যদি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তাহলে তাকেও নিজ স্থান থেকে সরিয়ে দেবে। এতেই কল্যাণ রয়েছে যে, তারা আমাদের উপর আক্রমণ করার পূর্বে আমরা তাদের সাথে সন্ধি করে নিই।

অতঃপর মুকাওকিস স্বয়ং ইসলামী সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাত প্রার্থনা করলেন। মুসলমান ও কিবতিদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত শর্তে সন্ধি হয়ে গেল ঃ

www.e-ilm.weebly.com

প্রতি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের পক্ষ থেকে প্রতি বছর দু দীনার আদায় করতে হবে। স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধরা এ হুকুমের বাইরে থাকবে। ইসলামী বাহিনী যুদ্ধকালে যে এলাকা অতিক্রম করবে, কিবতীরা তাদের সাহায্য ও তাঁদের রসদের ব্যবস্থা করবে। কিবতীদের জমি ও সহায়সম্পত্তির সাথে মুসলমানদের কোনরূপ সম্পর্ক থাকবে না। মিসরের রোমানদের এ অধিকার থাকবে যে, তারা কিবতীদের শর্তে মিসরে থেকে যেতে পারে বা নিজ দিশে ফিরে যেতে পারে।

(আশহারু মাশাহীরে ইসলাম ৩খ. ৫৮২-৫৮২ মাকরীজির বরাতে)

রোম কায়সারের নিকট মুকাওকিসের এ সন্ধির খবর পৌঁছুলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি মুকাওকিসের নিকট বার্তা পাঠালেন যে, তিনি যেন অবিলম্বে এ সন্ধি বাতিল করে দেন এবং রোম অফিসারদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলমানদের মোকাবেলা করেন। কিন্তু কায়সারের এ নির্দেশ পালন করতে মুকাওকিস অস্বীকার করলেন।

বস্তুতঃ খৃষ্টান ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মোতাবেক মিসরের কিবতীরা পূর্বাঞ্চলীয় গির্জার অত্যাচারে জর্জরিত ছিল এবং তারা রোম কায়সারের কর্তৃত্ব পছন্দ করত না। এদিকে তারা মুসলমানদের উন্নত চরিত্র প্রত্যক্ষ করেছিল এবং তাদের এও জানা ছিল যে, তাঁরা বিজিত এলাকায় জনসাধারণের ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন না। তাদের এও জানা ছিল যে, শাম ও ইরানের যুদ্ধক্ষেত্রে তারা কায়সার ও কিসরার শক্তিশয্যা নিজেদের তলোয়ারের আগা দিয়ে গুটিয়ে দিয়েছেন এবং মিসরে রোমশক্তি তাদের মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারেনি। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই তাদের একটিই সিদ্ধান্ত হতে পারত আর তা ছিল এই যে, তারা রোম কায়সারের গোলামীর রশি নিজেদের গলা থেকে নিক্ষেপ করে ফেলে মুসলমানদের প্রতি সন্ধির হস্ত প্রসারিত করবে। তারা তা-ই করল।

অন্যান্য বিজয়

অতঃপর আমর ইবনে আস (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী (রাঃ), খারিজা ইবনে হুযাফা আদাভী (রাঃ) উমায়র ইবনে ওয়াহাব জুমাহী এবং উকবা ইবনে আমির জুহানীকে বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দিলেন। এ সকল এলাকায় রোম সৈন্যরা কোথাও কোথাও মুসলমানদের মোকাবেলা করল। কিন্তু কিবতীরা সন্ধির শর্ত মোতাবেক মুসলমানদের পূর্ণ সাহায্য করল। ফলে আইনশামস, ফাইউম, উশমূনীন, আখীম, বিশরোদাত, কুরাসাঈদ, তানীস, দিময়াত, তূনা, দামীরা, শাতা ও কবলিয়া, বানা, বুসীর এবং আরো অনেক স্থান ছোট খাট মোকাবেলার পর মুসলমানদের আয়ত্তে চলে আসে।

www.e-ilm.weebly.com

আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়

আমরা আগেই বলেছি যে, আলেকজান্দ্রিয়া ছিল মিসরে রোম শক্তির কেন্দ্র এবং যেহেতু এটি সাগরতীরে অবস্থিত ছিল, এ জন্য সাগর পথে এখানে সহজে রোমানদের সাহায্য পৌছুতে পারত। কায়সার মুসলমানদের অগ্রসর হবার খবর শুনে বিশাল এক বাহিনী মুসলমানদের মোকাবেলার জন্য আলেকজান্দ্রিয়ায় নামিয়ে দিলেন।

আমর ইবনে আস (রাঃ)ও ইসলামী বাহিনী নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে অগ্রসর হলেন এবং শহর অবরোধ করলেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় রোমানদের কয়েকটি শক্তিশালী দুর্গ ছিল। রোমানরা সেগুলোতে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করতে লাগল এবং সমুদ্রপথে তাদের রসদপত্র পৌছুতে লাগল। এ কারণে অনেক দিন যাবত মুসলমানদের সাফল্য হলো না।

যথেষ্ট অপেক্ষা করেও হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট বিজয়ের সংবাদ না পৌছায় তিনি বললেন, মনে হয় মুসলমানরা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নতের উপর আমল করতে শৈথিল্য করছে। নইলে হকের মোকাবেলায় বাতিলের এতদিন টিকে থাকবার কোন কারণ বুঝা যায় না। অতঃপর তিনি আমর ইবনে আস (রাঃ) কে এক পত্র লিখলেন। এতে তিনি তাদেরকে বিজয়ে এত বিলম্বের জন্য ভর্ৎসনা করলেন এবং লিখলেন আমার আশংকা হয় মুসলমানরা নিজেদের আমল আখলাক কিতাব ও সুন্নাহর নির্দেশিত নমুনার উপর বহাল রাখেনি। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, সব মুসলমান একত্রিত করে তাদেরকে এ ভুল সম্পর্কে সতর্ক করবেন এবং তাদেরকে অস্ত্র চালনা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও নেকনিয়তের প্রতি উৎসাহ দেবেন এবং জুবায়র (রাঃ), মিকদাদ (রাঃ), মাসলামা (রাঃ) ও উবাদা (রাঃ) কে সামনে রেখে শত্রুদের সাথে এক সিদ্ধান্তমূলক সংঘর্ষ করবেন।

হযরত উমর (রাঃ) এর এ নির্দেশনামা পৌছলে হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) তা মুসলমানদের সমাবেশে পাঠ করে শোনালেন এবং তাঁর নির্দেশ পালন করলেন। অবশেষে ছয়মাস অবরোধের পর আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় হয়।

আমর ইবনে আস (রাঃ) আলেকজান্দ্রিয়ার নিরাপত্তার জন্য একদল সৈন্য মোতায়েন করলেন এবং নিজে কসরে শামায় ফিরে এলেন।

বিজয় দূত মদীনায়

আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) মুআবিয়া ইবনে খাদীজকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। মুআবিয়া তাঁর ঘোড়া দ্রুত চালিয়ে দুপুরের সময়ে মদীনায় প্রবেশ করলেন। তিনি মনে করলেন– দুপুরের সময় আমীরুল মুমিনীন হয়ত বিশ্রাম নিচ্ছেন। এ সময় তাঁকে কষ্ট দেয়া সমীচীন

www.e-ilm.weebly.com

নয়। এই ভেবে তিনি মসজিদে নববীতে এসে বসে রইলেন। ঘটনাক্রমে হযরত উমর (রাঃ) এর এক বাঁদী এদিকে এসেছিল। সে জানতে পারল যে, আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের খবর নিয়ে এসেছে। সে দৌড়ে গিয়ে হযরত উমর (রাঃ) কে সংবাদ দিল। হযরত উমর (রাঃ) তৎক্ষণাত তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের সংবাদাদি শুনলেন এবং আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতার সিজদা আদায় করলেন।

নিয়ম মোতাবেক হযরত উমর (রাঃ) ঘোষণা করালেন 'নামাজের জন্য একত্রিত হোন।' সকল মদীনাবাসী মসজিদে নববীতে স্রোতের ন্যায় চলে এল এবং মুআবিয়া (রাঃ) এর মুখেই আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের খবরাদি শুনল। হযর উমর (রাঃ) মুআবিয়াকে সাথে করে বাড়ীতে নিয়ে এলেন এবং বাঁদীকে খাবার আনতে বললেন। বাঁদী রুটি ও জয়তুন তেল এনে সামনে রাখল। খেতে খেতে হযরত উমর (রাঃ) মুআবিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মসজিদে গিয়ে বসেছিলে কেন? মুআবিয়া বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আমি ভেবেছিলাম দুপুরের সময় আপনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। হযরত উমর বললেন, আফসোস, তোমার এই ধারণা? আমি দিনের বেলা ঘুমাবো, তাহলে খেলাফতের দায়িত্ব সামলাবে কে?

ফুসতাত প্রতিষ্ঠা

আমর ইবনে আস (রাঃ) কসরে শামা ফিরে এসে হযরত উমরের পরামর্শক্রমে নীলনদের পূর্বতীরে মনফ–এর বিপরীত শহরের ভিত্তিস্থাপন করেন। এ শহরের নাম রাখা হয় ফুসতাত। আরবী শব্দ ফুসতাত অর্থ তাঁবু। এ স্থানেই কসরে শামা অবরোধের সময়ে আমর ইবনে আস (রাঃ) এর তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল। মুআবিয়া ইবনে খাদীজ, শারীক ইবনে সুমাই, আমর ইবনে মাখরাম এবং হাওয়াইল ইবনে নাশিরাকে শহরের নকশা প্রস্তুত করতে ও মহল্লাসমূহ ভাগ করতে নির্দেশ দেয়া হয়। প্রতি গোত্রের জন্য পৃথক পৃথক মহল্লা বসতি করা হয়।

হযরত উমর (রাঃ) এর নির্দেশ মোতাবেক শহরের কেন্দ্রস্থলে এক বিশালায়তন জামে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এ মসজিদটি ছিল পঞ্চাশ গজ দীর্ঘ ও পঞ্চাশ গজ চওড়া। মসজিদের দরজা ছিল তিনটি। এর মধ্যে একটি ছিল প্রশাসনিক ভবনের সোজাসুজি।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর সময়ে এ মসজিদ অপ্রতুল সাব্যস্ত হলে এতে সম্প্রসারণ করা হয়। মেঝে পাকা করা হলো এবং ছাদে কারুকার্য করা হলো। আজান দেওয়ার জন্য চারটি আজান ঘর নির্মাণ করা হলো। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের সময়ে এতে আরো সম্প্রসারণ করা হয়। এ মসজিদ আমর ইবনে আস (রাঃ) এর সাথে বিজড়িত হয়ে জামে-ই-আমর নামে আখ্যায়িত হয়। মিসরে এখনও রমজানের শেষ জুমআর নামাজ এ মসজিদেই আদায় করা হয়।

www.e-ilm.weebly.com

ফুসতাত মিসরে ইসলামী হুকুমতের প্রধানকেন্দ্র রূপে সাব্যস্ত হয় এবং এর শান শওকত অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। ফাতেমী বংশের সময়ে এ শহরের নিকটে কায়রোর ভিত্তি স্থাপন করলে এ শহরের পূর্ব গৌরব আর অবশিষ্ট রইল না।

নীল বধূ

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) যখন মিসর জয় করেন, তখন সেখানে প্রাচীন কাল থেকে একটি প্রথা চলে আসছিল। প্রতি বছর বূনার (কিবতী মাস) বারো তারিখে কিবতীরা একটি কুমারী মেয়েকে বধু সাজিয়ে নীলনদে ফেলে দিত এবং এদিনটিকে উৎসবের দিন হিসেবে আনন্দে কাটাত। অন্যান্য পৌত্তলিক জাতির মত তারাও নীলনদকে দেবতা জ্ঞান করত। তাদের ধারণা ছিল নীলনদকে কুমারীর অর্ঘ দান না করলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন এবং পানি দেবেন না।

আমর ইবনে আস (রাঃ) এর নিকট কিবতীদের এক প্রতিনিধিদল এল এবং এ প্রথা পালনের অনুমতি চাইল। আমার ইবনে আস (রাঃ) এ অন্যায় হত্যা বৈধ মনে করলেন না এবং কিবতীদের বলে দিলেন যে, 'ইসলাম এ সকল কুসংস্কার রহিত করে দিয়েছে।'

ঘটনাক্রমে সে বছর নীলনদ পানি দিল না। মিসরবাসীর চাষাবাদে ব্যাঘাত সৃষ্টি হলো। এমনকি যাদের সবকিছু চাষাবাদের উপর নির্ভর করত, এমন কোন কোন গোত্র দেশত্যাগের ইচ্ছা করল। আমর ইবনে আস (রাঃ) সকল ঘটনা হযরত উমর (রাঃ) কে লিখে জানালেন এবং তাঁর পরামর্শ প্রার্থনা করলেন। হযরত উমর (রাঃ) আমর (রাঃ) কে জবাব দিলেন যে, আপনি কিবতীদের যা বলেছেন পুরোপুরি সঠিক বলেছেন। আমি আপনার নিকট একটি পত্র পাঠাচ্ছি। এটি নীলনদে ফেলে দেবেন। হযরত উমর (রাঃ) এর পত্রের বিষয়বস্তু ছিল ঃ

"আল্লাহর বান্দা ও মুসলমানদের আমীরের পক্ষ থেকে মিসরের নীলের নামে- অতঃপর, হে নীল, তুমি যদি নিজ ক্ষমতায় প্রবাহিত হও তাহলে আর প্রবাহিত হয়ো না। কিন্তু তোমার প্রবাহের উৎস যদি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর হাতে হয়, তাহলে আমরা আল্লাহর নিকট দুআ করি তিনি যেন তোমাকে প্রবাহিত করে দেন।"

হযরত উমর (রাঃ) এর নির্দেশ মোতাবেক এ পত্র নীলনদে ফেলে দেয়া হয়। আল্লাহর এমন মেহেরবাণী হলো যে, সে বছর নীলনদে এ পরিমাণ পানি এলো যে, ইতিপূর্বে কখনও আসে নি।

(আশহারু মাশাহীরে ইসলাম, ৩খ. ৬০৯; বিদায়া নিহায়া ৭খ. ১০০)

www.e-ilm.weebly.com

[পরিতাপের বিষয় এ পৌত্তলিক প্রথা সামান্য পরিবর্তিত আকারে মিসরে পুনরায় প্রচলিত হয়েছে। আল্লামা রফিক বেক-এর বর্ণনা মোতাবেক উপসাগর বিজয় দিবস' নামে প্রতিবছর এক উৎসব পালন করা হয়। সেদিন মাটির তৈরী একটি পুতুল যাকে নীলবধু বলা হয়, নীলনদে বিসর্জন দেয়া হয় এবং খুব আনন্দ উৎসব করা হয়। অধিক পরিতাপের বিষয় যে, তাওহীদ স্বীকারকারীরা এতে শরীক হয়ে কুফরীর পতাকা উত্তোলন করে।]

বারকা বিজয়

মিসর বিজয়সমূহ ও ব্যবস্থাপনা থেকে অবসর হয়ে আমর ইবনে আস (রাঃ) বারকা অভিমুখে অগ্রসর হলেন। বারকা মিসর ও ত্রিপোলীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। এর প্রাচীন নাম ইনাবলুস। বেনগাজী এরই প্রসিদ্ধ বন্দর। বারকাবাসী জিযিয়ার শর্তে সন্ধি করে নিল। অতঃপর আমর ইবনে আস (রাঃ) ত্রিপোলীর দিকে অগ্রসর হলেন। এখানে মোকাবেলা হলো এবং অবশেষে মুসলমানরা বিজয়ী হলেন।

ত্রিপোলী করায়ত্ত করে আমর ইবনে আস (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) কে পত্র লিখলেন–

"আমরা ত্রিপোলী পৌঁছে গিয়েছি। ত্রিপোলী ও আফ্রিকার (তিউনিস) মাঝে নয় দিনের পথ। আমীরুল মুমিনীন অনুমতি দিলে সেটিও জয় করে নেয়া হবে।"

হযরত উমর (রাঃ) আমর ইবনে আস (রাঃ) কে অগ্রসর হবার অনুমতি দিলেন না। তিনি উকবা ইবনে নাফে' ফিহ্‌রীকে বারকার শাসক নিযুক্ত করে মিসরে ফিরে এলেন। এ ঘটনা হিজরী ২৩ সনের। (আশহারু মাশাহীরে ইসলাম ২খ. ৩৪৮)

হযরত উমর (রাঃ) এর শাহাদাত

মদীনায় মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) এর এক ইরানী গোলাম ছিল। নাম আবু লু'লু। একদিন সে হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট এসে বলল, আমার মনিব আমার উপর অনেক বেশী মাশুল আরোপ করে রেখেছে। আপনি তা কমিয়ে দিন। হযরত উমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন– কত মাশুল? আবু লু'লু বলল, প্রতিদিন দু দেরহাম। হযরত উমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কাজ কর? সে বলল, আমি ছুতার মিস্ত্রী, ভাস্কর ও কর্মকার। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, তাহলে এ তোমার জন্য অতিরিক্ত মাশুল নয়। গোলামটি এ জবাব শুনে খুব অসন্তুষ্ট হলো এবং এই বলে চলে গেল যে, আচ্ছা বুঝে নিব। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, আমাকে এক গোলামে হুমকি দিল! এই বলে তিনি নীরব রইলেন।

পরের দিন ভোরে হযরত উমর (রাঃ) নামাজের জন্য মসজিদে আগমন করলেন। আবু লু'লু পূর্ব থেকেই বিষাক্ত ছুরি লুকিয়ে রেখে ওত পেতে দাঁড়িয়েছিল। যেইমাত্র তিনি তাকবীর বললেন, অমনি সে তাঁর কাঁধ ও নাভীতে

www.e-ilm.weebly.com

ছয়টি আঘাত করল। আশপাশের লোকেরা তাকে ধরার জন্য ছুটে এলো। সে তাদেরও আহত করল। কিন্তু যখন দেখল যে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই তখন নিজেকেও ছুরি মেরে আত্মহত্যা করল।

আহত হবার পর হযরত উমর (রাঃ) আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) কে নামাজ পড়াবার নির্দেশ দিলেন। তিনি দ্রুত নামাজ পুরো করলেন। হযরত উমর (রাঃ) এ সময় মাটিতে পড়ে রইলেন। নামাজ সেরে হযরত উমর (রাঃ) কে তাঁর বাড়িতে আনা হলো। তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলেন– বল তো আমার হত্যাকারী কে? জবাব দেয়া হলো– আবু লু'লু। তিনি বললেন, আল্লাহর শুকুর। আমার রক্তে কোন মুসলমানের হাত রঞ্জিত হয়নি।

হযরত উমর (রাঃ) এর চিকিৎসার জন্য জনৈক আনসারী চিকিৎসককে ডেকে আনা হলো। তিনি তাঁকে শক্তির জন্য দুধ পান করালেন। সে দুধ তক্ষুণি জখমের পথে বেরিয়ে এলো। এ অবস্থা দেখে চিকিৎসক বললেন, আমীরুল মুমিনীন, নিজ উত্তরসূরী নির্বাচন করুন (অর্থাৎ শেষ সময় নিকটবর্তী)। এ কথা শুনে পাশে দাঁড়ানো ব্যক্তিরা কাঁদতে লাগল। তিনি বললেন, যে কাঁদছে সে আমার নিকট থেকে চলে যাক। তোমরা শোননি রসুলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন– মৃতের আত্মীয় স্বজনের কান্নার কারণে মৃতকে আজাব দেয়া হয়? (মানাকিব আন আবদিল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ))

হযরত উমর (রাঃ) যখন দেখলেন যে, দুনিয়া থেকে বিদায় হবার সময় নিকটবর্তী, তখন নিজ পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বললেন পুত্র, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) এর নিকট যাও এবং তাঁকে বলো– উমর সালাম বলেছে। দেখো, আমীরুল মুমিনীন বলবে না। কেননা আমি এখন আমীরুল মুমিনীন নই। অতঃপর আরজ করবে যে, উমর চায় আপনার কামরার মধ্যে তার দু সম্মানিত বন্ধুর পাশে তাকে স্থান দেয়া হোক।"

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) পৌছুলেন। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বসে কাঁদছিলেন। তিনি হযরত উমর (রাঃ) এর বার্তা পৌছে দিলেন। তিনি বললেন, 'আমি এ স্থান আমার নিজের জন্য সংরক্ষিত রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি তাঁকে আমার নিজের উপর প্রাধান্য দিচ্ছি।'

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) ফিরে এলে হযরত উমর (রাঃ) লোকদের বললেন, আমাকে বসাও। তাঁকে ভর দিয়ে বসানো হলো। তারপর তিনি পুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, বল কি উত্তর এনেছো। আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আপনার আকাংক্ষা পূর্ণ হয়েছে। হযরত উমর (রাঃ) বললেন– আল হামদুলিল্লাহ, আমার সবচেয়ে বড় আকাংক্ষা এ-ই ছিল। অতঃপর পুত্রকে বললেন, দেখো, যখন

www.e-ilm.weebly.com

আমার জানাজা নিয়ে আয়েশা (রাঃ) এর কামরায় পৌঁছুবে, তখন পুনরায় সালাম পেশ করবে এবং বলবে, উমর অনুমতি প্রার্থনা করছে। যদি অনুমতি দেন তাহলে সেখানে দাফন করবে। নতুবা সাধারণ গোরস্তানে মাটিতে সমর্পণ করে দেবে।

হযরত উমর (রাঃ) এর উদ্দেশ্য ছিল, হযরত আয়েশা (রাঃ) এর সম্মতি সন্তুষ্ট চিত্তে হওয়া দরকার। কোন প্রভাব, কৃত্রিমতা ও সৌজন্যের কোন অনুপ্রবেশ তাতে না হোক। (উসদুল গাবা)

হযরত উমর (রাঃ) মৃত্যুর প্রাক্কালে আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে লাগলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) আরজ করলেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনার সুসংবাদ। রসূলুল্লাহ (সঃ) দুনিয়া থেকে প্রস্থানের সময় আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। এখন আপনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছেন, আপনার প্রতি সকল মুসলমান সন্তুষ্ট রয়েছে। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ, তোমরা আমাকে প্রতারণায় ফেলতে চাইছো। আল্লাহর শপথ, আমি সম্মুখের ঘাঁটিসমূহের সংকটে এতই শংকাবোধ করছি যে, যদি সারা দুনিয়ার অর্থভাণ্ডার আমার নিকট থাকে আর আমি তা পণ দিয়ে জীবন বাঁচাতে পারি, তাহলে আমি এ সওদা খুব সস্তা মনে করব। (ইকদুল ফারীদ)

অন্তিমকালে তিনি পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) কে বললেন– পুত্র, আমার কপাল মাটিতে লাগিয়ে দাও। আবদুল্লাহ এ নির্দেশ পালন করলেন। তিনি মাটিতে মাথা রেখে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ আমাকে নিজ ক্ষমায় আবৃত করে নাও। তা না হলে পরিতাপ আমার প্রতি এবং পরিতাপ আমার মায়ের প্রতি, যার উদরে আমি সৃষ্টি হয়েছি। অতঃপর স্রষ্টার নিকট নিজ প্রাণ সঁপে দিলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলায়হে রাজেউন।

আহত হবার তৃতীয় দিনে ২৭শে জিলহজ্জ হিজরী ২৩ বুধবার রাতে হযরত উমর (রাঃ) এর ওফাত হয় এবং পরের দিন সকালে দাফন হয়। তাঁর বয়স তাঁর দু সম্মানিত বন্ধুর ন্যায় ৬৩ বছর হয়। তাঁর খেলাফতকাল দশ বছর ছয় মাস চার দিন।

হযরত উমর (রাঃ) এর সন্তানাদি

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত উমর বনুজুমাহ বংশের জয়নব বিনতে মাজউনকে বিবাহ করেন। তার গর্ভে আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান জ্যেষ্ঠ ও উম্মুল মুমিনীন হাফসা জন্মগ্রহণ করেন। এ স্ত্রী মুসলমান হয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি মুলায়কা বিনতে জারওল খুজায়িয়া ও কারীবা বিনতে আবী উমাইয়া মাখজুমিয়াকেও বিবাহ করেন। ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে তাদের দুজনকে তিনি তালাক প্রদান করেন। মুলায়কার গর্ভে উবায়দুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন।

www.e-ilm.weebly.com

অতঃপর মদীনায় উম্মে হাকীম বিনতে হারিছ ইবনে হিশাম মাখজুমিয়াকে বিবাহ করেন। তার গর্ভে ফাতেমা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জামীলা বিনতে কায়স আনসারিয়াকেও বিবাহ করেন। তার গর্ভে আসেম জন্মগ্রহণ করেন। তাকেও তিনি তালাক দিয়েছিলেন। তিনি উম্মে কুলছুম বিনতে আলীকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে আবদুর রহমান কনিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর আতেকা বিনতে জায়দকে বিবাহ করেন। তাঁর যে সকল পুত্রের মাধ্যমে বংশ পরম্পরা চলে, তাঁরা হলেন আবদুল্লাহ, উবায়দুল্লাহ ও আসেম।

হযরত উমর (রাঃ) এর আঞ্চলিক প্রশাসকগণ

২৩ হিজরীতে হযরত উমরের ইন্তেকালের সময় তাঁর পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত প্রশাসকবৃন্দ নিযুক্ত ছিলেন–

মক্কা ঃ নাফে ইবনে আবুল হারিছ খুজাঈ

তায়েফ ঃ সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ছাকাফী

কূফা ঃ মুগীরা ইবনে শু'বা

বসরা ঃ আবু মুসা আশআরী

মিসর ঃ আমর ইবনে আস

দামেশক ঃ মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান

হিমস ঃ উমায়র ইবনে সাদ

বাহরাইন ঃ উছমান ইবনে আবী আস।

তাঁর লেখক ছিলেন যায়দ ইবনে ছাবিত ও মুআইকীব। বায়তুল মালের তত্ত্বাবধায়ক আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম এবং তাঁর দারোয়ান ছিলেন তাঁর গোলাম য়ারকা।

www.e-ilm.weebly.com

উছমান গনী (রাঃ) এর যুগ

উমর ফারুক (রাঃ) এর অসিয়ত

হযরত উমর (রাঃ) এর জীবনের যখন আর কোন আশা রইল না, তখন কোন কোন সাহাবা তাঁকে বললেন যে, আপনি কাউকে পরবর্তী খলীফারূপে নাম ঘোষণা করে গেলে ভাল হয়। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, আমি যদি কাউকে পরবর্তী খলীফারূপে নাম ঘোষণা করে যাই তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। কেননা হযরত আবূ বকর (রাঃ) এরূপ করেছিলেন। আর যদি কারো নাম ঘোষণা না করে যাই, তাহলে তাতেও কোন ক্ষতি নেই। কেননা রসুলুল্লাহ (সঃ) এরূপ করেছিলেন। অতঃপর বললেন, আজ আবূ উবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ) জীবিত থাকলে আমি তাঁকে আমার উত্তরসূরী প্রস্তাব করতাম। কেননা আমি রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট শুনেছি আবু উবায়দা এ উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি। অথবা আবূ হুযায়ফার গোলাম সালেম জীবিত থাকলে এ দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করতাম। কেননা আমি রসুলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট শুনেছি– সালেম আল্লাহ প্রেমের পতঙ্গ।

কেউ কেউ বললেন- নিজ পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) কে খলীফা করুন। তিনি দ্বীনদারী, ইলম, মাহাত্ম্য ও ইসলাম প্রাচীনতার দিক দিয়ে যথোপযুক্ত হবেন। তিনি জবাব দিলেন, খাত্তাব পরিবারের একজনই মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উম্মতের দায়িত্বের হিসাব দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। উমর যদি সে হিসেবে সমান সমান হয়ে মুক্তি পায়, তাহলে সে এটিকেই আশীর্বাদ বলে মনে করবে।'

সাহাবায়ে কেরাম এ সময় তো নীরব হয়ে গেলেন। কিন্তু অন্য সময় আবার এ বিষয়টি আলোচিত হলো। তিনি বললেন, সারাজীবন যে বোঝা আমার উপর রইল, আমি মৃত্যুর পরও তার দায়িত্ব কবূল করে নিতে চাইনা। এ ছয় ব্যক্তি, যাঁদের জান্নাতী হবার সংবাদ রসুলুল্লাহ (সঃ) দিয়েছেন– আলী, উছমান, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, যুবায়র ইবনে আওওয়াম ও তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রাযিআল্লাহু আনহুম– আমি তাঁদেরকে ক্ষমতা দিচ্ছি তাঁরা একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে আমীর নির্বাচন করবেন।

অতঃপর তিনি মিকদাদ ইবনে আসওয়াদকে ডেকে বললেন, আমার দাফন সম্পন্ন হলে এ ছয় ব্যক্তিকে একস্থানে একত্রিত করবে এবং বলবে যে, নিজেদের মধ্য থেকে তিনদিনের মধ্যে কাউকে আমীর নির্বাচন করবেন। যদি সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত না হয়, তাহলে যাঁর প্রতি অধিকাংশের রায় থাকবে, তিনি আমীর নির্বাচিত হবেন। যদি দুদিকেই রায় সমান হয়, তাহলে

www.e-ilm.weebly.com

আবুদুল্লাহ ইবনে উমারকে বিচারক করতে হবে। কিন্তু তার নিজের খলীফা হবার অধিকার থাকবে না। যদি আবদুল্লাহকে বিচারক করা পছন্দ না করে তাহলে যেদিকে আবদুর রহমান থাকবেন সে রায় গ্রহণযোগ্য হবে। যে ব্যক্তি এ দলের সিদ্ধান্তে দ্বিমত পোষণ করবে এবং উম্মতের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করতে চাইবে, তার গর্দান উড়িয়ে দেবে।

খলীফা নির্বাচন

হযরত উমর (রাঃ) এর অসিয়ত মোতাবেক মিকদাদ এ "পরামর্শ দল"কে মিসওয়ার ইবনে মাখরামার বাড়ীতে একত্রিত করলেন। হযরত তালহা (রাঃ) যেহেতু পূর্ব থেকেই বাইরে গিয়ে ছিলেন, তাই তিনি শরীক ছিলেন না। হযরত উমর (রাঃ) ও তা-ই বলেছিলেন যে, তিনি তিন দিনের মধ্যে এলে পরামর্শে শরীক হবেন, নইলে আচ্ছা।

কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা হতে থাকল। অতঃপর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বললেন, যিনি খেলাফত থেকে মুক্ত হতে চান, তাঁর এ অধিকার থাকবে যে তিনি কাউকে খলীফা নির্বাচন করবেন। বলুন কে এজন্য প্রস্তুত রয়েছেন? এ প্রশ্নের জবাবে যখন সবাই নীরব রইলেন, তখন আবদুর রহমান (রাঃ) বললেন, আমি নিজে এজন্য প্রস্তুত রয়েছি। হযরত আলী (রাঃ) ব্যতীত সকলে বললেন, আমরা আমাদের নির্বাচনাধিকার আপনাকে ন্যস্ত করলাম। আপনি যাকে ইচ্ছা খলীফা ঘোষণা করুন। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি বলেন? হযরত আলী (রাঃ) উত্তর দিলেন, আপনি যদি অঙ্গীকার করেন যে, ন্যায় বিচার করবেন, কোন আত্মীয়ের পক্ষপাতিত্ব করবেন না এবং উম্মতের কল্যাণাকাংখা লক্ষ্য রাখবেন, তাহলে আমিও আপনার ফয়সালায় রাজী রয়েছি। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) উত্তর দিলেন আমি আপনার নিকট অঙ্গীকার করছি যে, আমি কোন আত্মীয়কে আত্মীয়তার কারণে প্রাধান্য দেব না এবং মুসলমানদের কল্যাণের বিষয় সর্বদা লক্ষ্য রাখব।

এ সিদ্ধান্তের পর খলীফা নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) এর কাঁধে এসে পড়ল। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) নিজের এ গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) এর ওফাতের কারণে সকল নেতৃস্থানীয় সাহাবা সেনাধ্যক্ষগণ ও আঞ্চলিক শাসকবৃন্দ মদীনায় সমবেত ছিলেন। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) রাতের আঁধারে চাদর মুড়ি দিয়ে এককে জনের নিকট যেতেন এবং তার স্বাধীন মতামত নিতেন। শুধুমাত্র বনু হাশিম হযরত আলী (রাঃ) এর পক্ষাবলম্বী ছিলেন। অবশিষ্ট সকলের একই রায় ছিল এই যে, হযরত উছমান (রাঃ) কে খলীফা করা হোক।

www.e-ilm.weebly.com

হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে প্রশ্ন করলেন, "এ পদ যদি আপনার হাসিল না হয়, তাহলে আপনি এজন্য কাকে সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত মনে করেন?" হযরত আলী (রাঃ) বললেন, উছমান (রাঃ)কে। হযরত উছমান (রাঃ) কেও একই প্রশ্ন করা হলো। তিনি হযরত আলী (রাঃ) এর নাম বললেন।

অবশেষে সেই তৃতীয় রাতটি এসে গেল যে রাত প্রভাত হয়ে গেলে হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)কে নিজ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হবে। এ রাতে তিনি এক এক করে চার শূরা সদস্যের সাথে দীর্ঘক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা করলেন। অবশেষে মুয়াজ্জিনের আজান তাঁকে আলাপ সমাপ্ত করিয়ে দিল।

ফজরের নামাজের পর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) মসজিদে নববীতে আগমন করলেন। পুরো মসজিদ নতুন খলীফার নাম ঘোষণা শোনার জন্য ভিড়ে ভরা ছিল।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) প্রথমে দীর্ঘক্ষণ দুআ করলেন। অতঃপর বললেন, লোকসকল, আমি খেলাফতের বিষয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছি এবং মানুষের সাথে সাক্ষাত করে তাদের মতামত জেনে নিয়েছি। আমি আশা করি যে, আমার সিদ্ধান্তের সাথে কারো দ্বিমত থাকবে না। অতঃপর হযরত উছমান (রাঃ)কে ডেকে বললেন, অঙ্গীকার করুণ যে, আল্লাহর কিতাব, তাঁর রাসূলের সুন্নত এবং দু মুরব্বীর (আবূ বকর ও উমর) আদর্শ অনুযায়ী কার্য করবেন। হযরত উছমান (রাঃ) বললেন, আমি নিজ জ্ঞান ও শক্তি অনুযায়ী এমনটিই করব। এ অঙ্গীকার নেবার পর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হযরত উছমান (রাঃ) এর হাতে বায়আত করলেন।

হযরত আবদুর রহমান(রাঃ) বায়আত করতেই লোকেরা চারিদিক থেকে হযরত উছমান (রাঃ) এর প্রতি ভেঙ্গে পড়ল এবং বায়আত করতে লাগলো। হযরত আলী (রাঃ) ও তৎক্ষণাৎ বা কিছুক্ষণ পরে বায়আত করলেন। এ ঘটনা ২৯ শে জিলহজ্জ হিজরী ২৩ সনের।

হযরত তালহা (রাঃ) উছমান (রাঃ) এর বায়তের পরে উপস্থিত হলেন। হযরত উছমান (রাঃ) তাকে বললেন– আপনার ইচ্ছা, চাইলে এ বায়আত বজায় রাখতে পারেন বা ভেঙ্গে দিতে পারেন। হযরত তালহা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন সকলে কি উছমানের বায়আত করেছে? লোকেরা উত্তর দিল হ্যাঁ। হযরত তালহা (রাঃ) তখন বললেন, সকলের ফয়সালার সাথে আমারও ঐকমত্য রয়েছে।

(ইবনে জারীর তাবারী সংক্ষিপ্ত ও বিদায়া নিহায়া।

www.e-ilm.weebly.com

খেলাফতপূর্ব অবস্থা

নাম উছমান, উপনাম আবূ বকর, উপাধী যুন নূরাইন। পিতার নাম আফফান এবং মাতার নাম আরওয়া। তাঁর বংশপরম্পরা নিম্নরূপ ঃ

উছমান পিতা আফফান পিতা আবুল আস পিতা উমাইয়া পিতা আবদে শামস পিতা আবদে মানাফ পিতা কুসায়্যি। এরূপে তাঁর বংশ পরম্পরা পঞ্চম পুরুষে আবদে মানাফে গিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে মিলিত হয়। তাছাড়া তাঁর নানী বায়যা উম্মে হাকীম পিতা আবদুল মুত্তালিব রাসুলে আকরাম (সঃ) এর ফু ফু। রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর দু কন্যা পরপর তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সে কারণে তিনি যুন নূরাইন উপাধীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

হযরত উছমান (রাঃ) এর পরিবার ইসলামপূর্ব যুগে অত্যন্ত সম্মানিত বলে গণ্য ছিল। কুরাইশদের জাতীয় পতাকা উকাব এ পরিবারেরই আয়ত্তে থাকত। তাঁর প্রপিতামহ উমাইয়া ইবনে আবদে শামস কুরাইশের বিশিষ্ট নেতা ও সর্দার ছিলেন। কুরাইশের কোন পরিবার যদি বনু হাশিমের সমকক্ষ দাবী করতে পারত তাহলে তা বনু উমাইয়াই ছিল।

হযরত উছমান গনি (রাঃ) হস্তী ঘটনার ষষ্ঠ বছরে জন্মগ্রহণ করেন। বড় হয়ে তিনি কাপড়ের ব্যবসা অবলম্বন করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর এ পেশায় খুবই বরকত দান করেন। তিনি প্রচুর অর্থ উর্পাজন করেন এবং আল্লাহর রাহে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তাঁর মাহাত্ম্য ও বদান্যতা এবং সচ্চরিত্রের কারণে কুরাইশদের মধ্যে তাঁকে সম্মান ও ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখা হত। স্ত্রীলোকেরা শিশুদের এই গান গেয়ে ঘুম পাড়াতো ঃ

আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে এমনই ভালবাসি যেমন কুরাইশরা ভালবাসে উছমানকে। (ইবনে আসাকির)

ইসলাম গ্রহণ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেই ইসলামের প্রসারকে নিজ জীবনের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেন। সর্বপ্রথমে তিনি নিজের অকৃত্রিম বন্ধুদের এ সৌভাগ্য কবুল করতে আহ্বান জানালেন। তার এ বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন হযরত উছমান, হযরত যুবায়র ও হযরত তালহা। তিনজনে একই সাথে এ সত্যের আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং প্রাথমিক দলে গণ্য হলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বনু হাশিম পরিবার ও বনু উমাইয়া পরিবার পার্থিব মর্যাদার দিক দিয়ে একে অপরের প্রতিদ্বন্ধি ছিল রাসূলে আকরাম (সঃ) এর দাওয়াতী সাফল্যে বনু হাশিমের প্রতিপত্তিতে পৌনঃপুনিক মাত্রা সংযোজিত হতে

www.e-ilm.weebly.com

থাকে। তথাপি হযরত উছমান (রাঃ) এর সম্মুখে যখন দ্বীন ইসলাম পেশ করা হলো, তখন তিনি অবনত শিরে তা কবুল করে নিলেন। পার্থিব স্বার্থ তার এ সংকল্পে কোনরূপ দ্বিধা সৃষ্টি করতে পারেনি।

ইসলাম গ্রহণের পর রসূলে আকরাম (সঃ)তাঁকে দুহিতাদানে ধন্য করেন এবং মহানবী (সঃ) এর মেঝো কন্যা হযরত রুকাইয়া (রাঃ) এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়।

হাবশায় হিজরত

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত উছমান (রাঃ)ও অন্য নির্যাতিত মুসলমানদের ন্যায় কাফির কুরাইশদের অত্যাচারের শিকার হন। তাঁর চাচা হাকাম ইবনে আবীল আস' ইবনে উমাইয়া তাঁর হাত পা বেঁধে বন্দী করে এবং বলে যে, তুমি নতুন ধর্ম ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না।

হযরত উছমান (রাঃ) এসব অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে অবশেষে রসুলুল্লাহ (সঃ) এর নির্দেশ মোতাবেক নিজ স্ত্রীকে সাথে নিয়ে হাবশা যাত্রা করেন। হযরত উছমান (রাঃ) ছিলেন দ্বীনরক্ষার্থে নিজ ঘরবাড়ী ও আত্মীয়স্বজন ছেড়ে চলে যাওয়া ব্যক্তিদের প্রথম। রসূলে আকরাম (সঃ) ইরশাদ করেন ঃ

"আল্লাহ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের রক্ষক হোন। লূত (আঃ) এর পরে উছমানই (রাঃ) প্রথম ব্যক্তি যিনি সস্ত্রীক আল্লাহর পথে হিজরত করলেন"।

অতঃপর মদীনায় হিজরতের ধারা শুরু হলে তিনিও নিজ পরিবার পরিজনসহ হিজরত করেন।

জিহাদে অংশগ্রহণ

ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গকারী অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের ন্যায় তিনিও সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করে জীবনের কোরবানী পেশ করেন। অবশ্য বদর যুদ্ধে তিনি নিজ স্ত্রী হযরত রুকাইয়া (রাঃ) এর গুরুতর অসুস্থতার কারণে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মদীনায় অবস্থান করে তিনি যেন হযরত রুকাইয়া (রাঃ) এর শুশ্রূষা করেন। এ সময়েই হযরত রুকাইয়া (রাঃ) এর ইন্তেকাল হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উছমান (রাঃ)কে বদরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গণ্য করেন। তিনি গণীমতের মাল থেকে তাঁকেও হিস্যা প্রদান করেন এবং আখেরাতের ছওয়াব সম্পর্কেও সুসংবাদ প্রদান করেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) সন্তান থেকে বঞ্চিত হওয়ায় হযরত উছমান (রাঃ) এর বড়ই মনঃকষ্ট ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে অস্বাভাবিক

www.e-ilm.weebly.com

মনঃক্ষুন্ন দেখে নিজের অপর কন্যা উম্মে কুলছুম (রাঃ)কে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। এ গর্ব আর কারো অর্জিত হয়নি। এ কারণেই তিনি 'যুন নূরাইন' উপাধীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে মহানবী (সঃ) সাহাবায়ে কেরামসহ কা'বাশরীফ জেয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। হুদায়বিয়া পৌঁছে তিনি জানতে পারেন যে, কাফের কুরাইশরা তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। মহানবী (সঃ) হযরত উছমান (রাঃ) কে কাফেরদের সাথে আলাপ আলোচনার জন্য দূত করে পাঠালেন। কাফেররা তাঁকে আটক করে রাখে এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়ে যায় যে, তাঁকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। এ সইবনেদে মুসলমানদের মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। রসূলে আকরাম (সঃ) একটি গাছের নীচে বসে সাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে জীবন উৎসর্গ করার বায়আত গ্রহণ করলেন। এ সময় তিনি (সঃ) নিজের হাত অপর হাতের উপর রেখে হযরত উছমান (রাঃ) এর পক্ষ থেকে বায়আত গ্রহণ করেন এবং নিজ হাতকে হযরত উছমান (রাঃ) এর স্থলবর্তী বলে গণ্য করেন।

৯ম হিজরীতে মদীনায় এ সংবাদ প্রসিদ্ধ হয়ে গেল যে, রোমকায়সার আরব আক্রমন করবেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদের জিহাদের প্রস্তুতিগ্রহণের নির্দেশ দিলেন এবং যুদ্ধ সামগ্রীর জন্য চাঁদার আবেদন করলেন। হযরত উছমান (রাঃ) এ আবেদনে এমন সাড়া দিলেন যে, নবুওয়াত যুগের ইতিহাসে তার কোন নজীর পাওয়া যায় না। তিনি এক হাজার উঁট ও পঞ্চাশটি ঘোড়া পেশ করেন এবং এক হাজার দীনারের এক থলে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কোলে এনে ফেলে দেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) এ দীনার গুলো উল্টে পাল্টে দেখছিলেন আর বলছিলেন–

আজ থেকে উছমান (রাঃ) এর কোন কর্ম তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (তিরমিযী আনাস (রাঃ) থেকে)

দান ও বদান্যতা

হযরত উছমান (রাঃ) এর দান ও বদান্যতার বৃষ্টি সর্বসময়ে জাতীয় ক্ষেত্রকে সিঞ্চন করেছে। রাসুলে আকরাম (সঃ) যখন মদীনায় এলেন, তখন পানির সাংঘাতিক সমস্যা ছিল। এক মাত্র রূমা কুঁয়ার পানি পানের যোগ্য ছিল। কিন্তু এর মালিক ছিল জনৈক য়াহুদী। সে মুসলমানদের পানি দিতে চাইতো না। রসুলে আকরাম (সঃ) বললেন, এমন কেউ আছে কি যে রূমা কুয়াটি কিনে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেবে এবং এর বিনিময়ে জান্নাতের ঝর্ণার মালিক হবে? হযরত উছমান (রাঃ) বিশ হাজার দিরহামে সেটি কিনে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেন।

www.e-ilm.weebly.com

তেমনি মসজিদে নববী সম্প্রসারণের প্রয়োজন অনুভূত হলে রসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন, কেউ আছে কি যে আমাদের মসজিদটি সম্প্রসারিত করে দেবে?

হযরত উছমান (রাঃ) পাঁচটি খুঁটি পরিমাণ জমি কিনে নিলেন এবং মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ সম্পন্ন হয়। (ইবনে আবদিল বারর)

হযরত উছমান (রাঃ) এর এ দানশীলতার কারণে মুসলমানদের অন্তরে তাঁর প্রতি ভালবাসার সৃষ্টি হয়েছিল এবং সবার নিকটে তিনি প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

হযরত উছমান (রাঃ) রসুলুল্লাহ (সঃ) এর বিশেষ বন্ধু এবং অহী লেখক ছিলেন। তিনি মহানবী (সঃ) এর সে দশজন অকৃত্রিম বন্ধুদের অন্তগর্ত ছিলেন, যাঁদেরকে তিনি (সঃ) জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। তিনি সে ছয় ব্যক্তির অন্তর্গত ছিলেন, যাঁদেরকে হযরত উমর (রাঃ) 'পরামর্শ পরিষদ' রূপে প্রস্তাব করে যান এবং বলেন যে, রসুলুল্লাহ (সঃ) তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন। মহানবী (সঃ) বিভিন্ন সময়ে তাঁকে মদীনাতে নিজের ভারপ্রাপ্ত করে যান। মহানবী (সঃ) এর ইন্তেকালের পর তিনি হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) এর বিশেষ পরামর্শদাতা এবং খেলাফতের কাজ কর্মে খলীফার দক্ষিণহস্ত ছিলেন।

খেলাফতকালের ঘটনাবলী

খলীফারূপে প্রথম খুতবা

বায়আত সম্পন্ন হলে হযরত উছমান (রাঃ) খুতবা দানের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। কিন্তু নিজের নতুন দায়িত্ববোধে তিনি এতই প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি কাঁপতে লাগলেন। তিনি শুধুমাত্র এতটুকু বললেন ঃ

'লোকসকল কোন বাহনে আরেহণ করা সহজ কাজ নয়। আজকের পরে বক্তৃতা করার আরো অনেক সময় রয়েছে। জীবিত থাকলে অন্য কোনদিন খুতবা দান করবো। আপনাদের তো জানাই আছে যে, আমি বক্তৃতা মাঠের অশ্বারোহী নই।" (তাবাকাত-ই-ইবনে সা'দ ও ইকদুল ফরীদ)

হযরত উছমান (রাঃ) সর্বপ্রথম প্রাদেশিক গভর্ণর সেনানায়ক ও রাজস্ব কর্মকর্তাদের নামে ফরমান জারী করলেন। এ সকল ফরমানে এ মর্মে উপদেশ দেয়া হয় যে, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার কখনই যেন এড়িয়ে যাওয়া না হয়। আয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে আমানতদারী ও দিয়ানতকারীর সাথে কর্মসম্পাদন করতে হবে। মুসলমান ও যিম্মীদের মধ্যে কোন পার্থক্য ঠিক করা হবে না। শত্রুর সাথে

মোকাবেলার সময়ও বিশ্বাসঘাতকা করা যাবে না। এতদ্ব্যতীত এ-ও বলা হয় যে, ইসলামী সর্দারগণ রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কের পর্যায়ে। তাঁরা প্রজাদের মনিব ও প্রভু নন।

প্রথম মোকদ্দমা

মূলত ঃ হযরত উমর (রাঃ) এর শাহাদাত ছিল এক চক্রান্তের ফল। এ চক্রান্তে আবু লু'লু ব্যতীত জাফীনা ও হুরমুজানও জড়িত ছিল। আবূ লু'লু ছিল নিহাওন্দের অধিবাসী পারসিক গোলাম আর জাফীনা হীরার অধিবাসী খৃষ্টান। হযরত উমর (রাঃ) এর খেলাফতকালে গৌরবময় বিজয় এবং পারস্য ও খৃষ্টান রাজ্যসমূহের দৃষ্টান্তমূলক ধ্বংসের কারণে তাদের অন্তরে হিংসা ও ক্ষোভের আগুন জ্বলছিল। নিহাওন্দ বিজয়ের পর সেখানকার কয়েদীরা এসে পৌছলে আবূ লু'লু এক একটি শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল আর কেঁদে কেঁদে বলছিল–'উমর আমার কলিজা খেয়ে ফেলেছে।

যে ভোরে হযরত উমর (রাঃ) শহীদ হন সে রাতে আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রাঃ) দেখলেন যে, আবূ লু'লু, জাফীনা ও হুরমুজান পরস্পর কানাঘুষা করছে। তারা তাঁকে দেখে ঘাবড়ে গেল এবং পৃথক হয়ে গেল। তাদের ভীতির সময়ে তাদের মধ্যে কারো কাপড়ের মধ্যে থেকে খঞ্জর বের হয়ে পড়ে গেল। এর দুদিকে ধার আর মাঝখানে হাতল ছিল।

উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) এ ঘটনা শুনে যে খঞ্জরে হযরত উমর (রাঃ) শহীদ হয়েছিলেন সেটি চেয়ে নিয়ে দেখলেন। খঞ্জরটি অবিকল তেমনই ছিল যেমনটি আবদুর রহমান বর্ণনা করেছিলেন। উবায়দুল্লাহ রাগে নিজ উত্তেজনা আয়ত্তে রাখতে পারলেন না এবং জাফীনা ও হুরমুজানকে হত্যা করে ফেললেন।

এঘটনার দায়ে উবায়দুল্লাহকে বন্দী করে আনা হল এবং হযরত উছমান (রাঃ) খলীফা হবার পর সর্বপ্রথম এ মোকদ্দমা এসে পড়ল।

হযরত উছমান (রাঃ) নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামের নিকট জানতে চাইলেন এ বিষয়ে আপনাদের কি মত? হযরত আলী (রাঃ) বললেন, শুধুমাত্র আবদুর রহমানের সাক্ষ্যে জাফীনা ও হুরমুজানের অপরাধ প্রমাণিত হয় না। অতএব দণ্ড হিসেবে আবদুল্লাহকে হত্যা করা উচিত। কিন্তু কোন কোন সাহাবী বললেন, কাল উমর (রাঃ) শহীদ হলেন আর আজ তাঁর পুত্রকে হত্যা করা হবে? তা হতে পারে না।

হযরত উছমান (রাঃ) হুরমুজান ও জাফীনার রক্তপণ নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দিয়ে এ বিষয়টি নিস্পন্ন করেন, কারণ নিহতদের কোন ওয়ারিশ ছিল না এবং তাদের ব্যাপারে খলীফার পূর্ণ এখতিয়ার ছিল।

হযরত উছমান (রাঃ) এর এ ফয়সালা খুব প্রশংসিত হল।

www.e-ilm.weebly.com

বিজয়সমূহ

আজারবাইজান ও আরমেনিয়া

হযরত উমর (রাঃ) এর শেষসময়ে কূফার শাসক ছিলেন মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ)। হযরত উমর (রাঃ) অসিয়ত করেছিলেন যে, ইরান বিজয়ী সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)কেই পুনরায় কূফার শাসক করা হোক। হযরত উছমান (রাঃ) খেলাফতের দায়িত্ব হাতে নিয়েই এ নির্দেশ পালন করেন। কিন্তু দু'বছর পরেই হিজরী ২৬ সনে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) অপসারিত হন।

বিষয়টি ছিল এই যে, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) কোন প্রয়োজনে রাজস্ব কর্মকতা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর নিকট থেকে কিছু অর্থ ঋণ নিয়েছিলেন। কিন্তু তা সময়মত আদায় করতে পারেন নি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বিষয়টি খেলাফত দরবার পর্যন্ত পৌছে দিলেন। যেহেতু একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার জন্য এ কর্মপদ্ধতি উপযুক্ত ছিল না তাই হযরত উছমান (রাঃ) তাকে অপসারিত করেন এবং তাঁর স্থানে অলীদ ইবনে উকবাকে কূফার শাসক নিযুক্ত করেন।

রায়, আজারবাইজান ও আরমেনিয়া রাজ্যগুলো কূফার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এখান থেকেই সে সকল রাজ্যের রক্ষার ও প্রতিরোধের জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠানো হত।

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এর সময়ে আজারবাইজানের শাসক ছিলেন উকবা ইবনে ফারকাদ। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এর অপসারণের সাথে তাঁকেও অপসারণ করা হয়। আজারবাইজানবাসীরা তাঁর যাবার পরপরই বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করল। অলীদ ইবনে উকবা সেনা অভিযান পরিচালনা করেন এবং আজারবাইজানবাসীরা পুনরায় আনুগত্য স্বীকার করে নেয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত উমর (রাঃ) এর খেলাফতকালে আবদুর রহমান ইবনে রাবীআ বাহিলী ও হাবীব ইবনে মাসলামা ফিহরীসহ সুরাকা ইবনে আমর আরমেনিয়া ও কোকাজ এলাকায় আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন। আবদুর রহমান ইবনে রাবীআ পূর্ব আরমেনিয়া জয় করে কাস্পিয়ান সাগরের তীর দিয়ে বাবে পৌছেন। বাব জয় করে সুরাকা ইসলামী সর্দারগণকে আরমেনিয়ার অন্যান্য শহর জয় করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। হাবীব ইবনে মাসলামা গুর্জিস্থান এলাকায় অগ্রসর হলেন এবং এর রাজধানী তিফলিস জয় করে নেন। এ সময়েই সুরাকার ইন্তেকাল হয় এবং আবদুর রহমান ইবনে রাবীআ তাঁর স্থলাভিষিক্ত নির্বাচিত হন।

আবদুর রহমান বাবকে রাজধানী করে সকল ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করলেন। অতঃপর জয়ের উদ্দেশ্যে তিনি আরো অগ্রসর হলেন। এভাবে তিনি দরবন্দ

www.e-ilm.weebly.com

পৌছুলেন। তারপর তিনি দরবন্দ গিরিপথ অতিক্রম করে উত্তরের নীচু এলাকায় পৌছুলেন এবং বলঞ্জর থেকে দুশো মাইল এগিয়ে থামলেন।

আবদুর রহমান বাবে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি সেখান থেকে সময়ে সময়ে কাস্পিয়ান শহরগুলোতে আক্রমণ পরিচালনা করতে লাগলেন। সেখানেই তিনি কাস্পিয়ান শাসকের সাথে মোকাবিলা করতে করতে তুর্কিনদ বা বলঞ্জর নদ তীরে শহীদ হয়ে যান।

ইবনে জামানাতা বাহিলী, আবদুর রহমান ও তুর্কিস্তান বিজয়ী কুতইবনে ইবনে মুসলিমের বীরত্ব ও জীবনোৎসর্গের জন্য নিম্নোক্ত ভাষায় গর্ব প্রকাশ করেন "আমাদের পরিবারের দুজন মুজাহিদের কবর আমাদের গর্বের কারণ, একটি কবর বলঞ্জরে, আরেকটি চীনে।

তিনি চীনের সর্বত্র বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছেন আর তাঁর কবরকে তুর্কিস্তানের প্রত্যন্ত এলাকায় রহমতের বৃষ্টি সিক্ত করে।"

আবদুর রহমানের শাহাদাতের পর মুসলমানরা কাস্পিয়ান শহরগুলোতে আর টিকতে পারলেন না এবং পুরো আরমেনিয়া তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

হিজরী ২৬ সনে হযরত উছমান (রাঃ) সালমান ইবনে রাবীআ (আবদুর রহমান ইবনে রাবীআর ভাই) ও হাবীব ইবনে মাসলামাকে দ্বিতীয়বার সে সকল এলাকা জয় করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এ দুজন বীর আরমেনিয়া ও কোকাজের সকল এলাকা পুনরায় ইসলামী পতাকার নীচে আনতে সক্ষম হন।

(আশহারুল মাশাহীর ৪খ. ৭০৩)

উম্মে আবদুল্লাহর বীরত্ব

হাবীব ইবনে মাসলামা যখন আরমেনিয়া এলাকাসমূহে বীরত্বের স্বাক্ষর স্থাপন করছিলেন, তখন তাঁর স্ত্রী উম্মে আবদুল্লাহ কালবিয়া তাঁর সাথে ছিলেন। একদিন হাবীব জানতে পেলেন যে, আরমেনিয়াকিসের জেনারেল মোরিয়ান বিপুল সাজসরঞ্জামসহ তাঁর মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। হাবীবের সৈন্যসংখ্যা ছিল স্পল্প। সেজন্য তিনি মোরিয়ানের উপর রাতে আক্রমণ করতে ইচ্ছা করলেন। উম্মে আবদুল্লাহ স্বামীকে অস্ত্রসজ্জিত হতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন–কোন দিক উদ্দেশ্য? হাবীব জবাব দিলেন, মোরিয়ানের তাবু অথবা জানানতুল ফেরদাউস।"

হাবীব মোরিয়ানের সৈন্যদের ব্যাপকভাবে হত্যা করতে করতে মোরিয়ানের তাঁবুর নিকট পৌছে দেখেন যে, তার স্ত্রী পূর্বেই অস্ত্রালংকারে সজ্জিতা হয়ে তাঁর সাহয্যের জন্য সেখানে উপস্থিত রয়েছেন। (ফুতুহুল বুলদান, বালাজুরী) পৃ–২০০)

আরমেনিয়া পুনরায় বিজয়ের পর সালমান ইবনে রাবীআ সেখানকার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলেন এবং বাবে অবস্থান গ্রহণ করলেন।

www.e-ilm.weebly.com

আনাতুলিয়া ও সাইপ্রাস

হযরত উছমানের সময়ে পুরো শামদেশ হযরত মুআবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ানের অধীনে ছিল। শামের সীমান্ত যেহেতু রোম দেশের সাথে মিলিত ছিল, সে কারণে রোমানদের সাথে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর প্রায়ই খণ্ড যুদ্ধ হত। হিজরী ২৫ বা ২৬ সনে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) আনাতুলিয়া আক্রমণ করেন এবং আসূরিয়া শহর জয় করে নেন। তিনি শাম থেকে আসুরিয়া পর্যন্ত সকল দুর্গ দখল করে নিয়ে সেখানে শাম ও জাজিরার মুসলমানদের বসতি স্থাপন করেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) আরো অগ্রসর হতে চাইছিলেন। কিন্ত স্থলপথে তাঁর অগ্রসর হওয়ার সুযোগ হল না।

এখন তিনি আনাতুলিয়া উপকূলীয় এলাকাসমূহ এবং রোমসাগরের দ্বীপগুলোর উপর সমূদ্রপথে আক্রমণ করতে চাইলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) নৌ যুদ্ধের খুবই আগ্রহী ছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) এর খেলাফতকালে তিনি তাঁর এ ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেন। কিন্ত হযরত উমর (রাঃ) ঠিক সে পরিমাণে বিরোধী ছিলেন। তিনি হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন। এখন হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) তাঁর এ ইচ্ছার কথা হযরত উছমান (রাঃ) এর নিকট প্রকাশ করেন। হযরত উছমান এই শর্তে তাঁকে অনুমতি দিলেন যে, যারা স্বেচ্ছায় এ আক্রমণে অংশগ্রহণ করতে চায়, শুধু তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কাউকে বাধ্য করা যাবে না।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) জাহাজের একটি বহর নিজে প্রস্তুত করেন এবং আরেকটি বহর নিয়ে মিসরের গভর্ণর আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ অগ্রসর হলেন। এ উভয় বহর আবদুল্লাহ ইবনে কায়স হারিছীর পথ নির্দেশনায় ভূমধ্যসাগরের প্রসিদ্ধ দ্বীপ সাইপ্রাসে গিয়ে নোংগর করে। সাইপ্রাসবাসী প্রচণ্ড মোকাবেলা করল। কিন্ত অবশেষে অস্ত্র ফেলে দিল এবং নিম্নোক্ত শর্তে সন্ধি করে নিলঃ

(১) সাইপ্রাসবাসী মুসলমানদের প্রতিবছর সাত হাজার দীনার আদায় করবে এবং ঠিক সে পরিমাণ রোমানদেরও আদায় করতে থাকবে।

(২) সাইপ্রাসবাসীদের হেফাযত করা মুসলমানদের জন্য জরুরী হবে না।

(৩) সাইপ্রাসবাসী শত্রুদের গতিবিধি সম্পর্কে মুসলমানদের অবহিত করবে এবং মুসলমানরা নিজ শত্রুদের আক্রমণের সময় সাইপ্রাসকে ব্যবহার করতে পারবে।

এভাবে মিসর ও শামের হেফাজতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান সাইপ্রাস দ্বীপ মুসলমানদের আয়ত্তে এসে গেল এবং ভুমধ্যসাগরে ইসলামী সৈন্যদের নৌঘাটি রূপে নির্ধারিত হলো। এ ঘটনা হিজরী ২৮ সনের। (মুহাজারাতে খাজারী ২খ. ৪৪)

www.e-ilm.weebly.com

মিসর ও পশ্চিম দেশ *

হযরত উছমান (রাঃ) এর খেলাফত কালে মিসরের গভর্ণর ছিলেন মিসরবিজয়ী আমর ইবনে আস (রাঃ)। হযরত উছমান (রাঃ) তাকে মিসরের রাজস্ব বাড়াতে বললে আমর ইবনে আস (রাঃ) জবাব দিলেন, উটনী এর চেয়ে বেশী দুধ দিতে পারে না। হযরত ইছমান (রাঃ) তাঁকে অব্যাহিত দিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহকে গভর্ণর করেন।

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) এর অব্যাহতির কথা শুনে হিজরী ২৫ সনে রোমানদের প্ররোচেণায় আলেকজান্দিয়াবাসী বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। মিসরবাসীর পরামর্শক্রমে হযরত উছমান (রাঃ) এ বিদ্রোহ দমনের জন্য পুনরায় হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) কে নিযুক্ত করলেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে এ কাজ সম্পাদন করেন। রোমানদের শোচনীয় পরাজয় হল। আমর ইবনে আস (রাঃ) তাদের বহরের অনেক জাহাজ আয়ত্ত করে নিলেন এবং আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলেন।

এ বছরই আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহকে ত্রিপোলী অভিযানে পাঠানো হয়। তিনি ত্রিপোলীর অনেক রোম নিয়ন্ত্রণাধীন শহর দখল করে নেন এবং পঁচিশ লাখ দীনারের শর্তে সন্ধি হয়ে যায়।

এ সময়ে মিসরের প্রশাসনে আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ ও আমর ইবনে আস (রাঃ) দুইজনেরই হাত রইলো। হযরত উছমান (রাঃ) চাইছিলেন আমর ইবনে আস (রাঃ) সেনাধ্যক্ষ থাকুন এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ থাকুন অর্থ ও রাজস্ব কর্মকর্তা। কিন্তু আমর ইবনে আস (রাঃ) তা মেনে নিলেন না। মিসরের সম্পূর্ণ প্রশাসন আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ-এর হাতে এসে যায়। এ ঘটনা হিজরী ২৬ এ।

আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ তাঁর শাসনকালে মিসরের রাজস্ব পাঠলেন ৪০ লাখ। এ ছিল পুর্ববর্তী বছরের দ্বিগুণ। আমর ইবনে আস (রাঃ)কে উদ্দেশ্য করে, হযরত উছমান (রাঃ) বললেন, দেখলেন? শেষ পর্যন্ত উটনী দুধ দিল।

টীকা- *পশ্চিম দেশ বলতে ইসলামী ঐতিহাসিকগণ উত্তর পশ্চিম আফ্রিকা বুঝিয়ে থাকেন। এর চতুর্সীমা হলো ঃ পূর্বে মিসর ও লোহিত সাগর, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তরে ভূমধ্যসাগর ও জিব্রালটার প্রণালী এবং দক্ষিণে সাহারা। ইসলামী বিজয়ের প্রাক্কালে পশ্চিম দেশ তিনটি বৃহত্তর ভাগে বিভক্ত ছিল। (১) নিকট পশ্চিম ঃ এতে ত্রিপোলী ও তিউনিস শামিল ছিল। এর রাজধানী ছিল কারাভান। (২) মধ্যপশ্চিম ঃ এ ছিল আলজিয়াস এবং এর রাজধানী ছিল তিলমিসান। (৩) দূর পশ্চিম ঃ এ বলতে মরক্কো বুঝানো হতো। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন শক্তি এগুলো শাসন করতো। বর্তমানে সবগুলো দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে।

www.e-ilm.weebly.com

আমর ইবনে আস (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, দিল, কিন্তু বাচ্চা উপোস রয়ে গেল।'

২৬ হিজরীতে মিসর রাজ্যের পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করার পর হযরত উছমান (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহকে পশ্চিম দেশে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিলেন, এ অভিযানে তাঁকে সাহায্য করার জন্য মদীনা থেকে একটি সেনাদল পাঠানো হয়। এতে ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে উমর (রাঃ), ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ), ইবনে জাফর (রাঃ), হাসান (রাঃ), হুসাইন (রাঃ), ইবনে যুবায়র (রাঃ) প্রমুখ শরীক ছিলেন। বারকা থেকে উকবা ইবনে নাফেও নিজ বাহিনী নিয়ে তাঁর সাথে যোগ দিলে। আবদুল্লাহ গোটা ত্রিপোলীতে তাঁর সৈন্যদের ছড়িয়ে দিলেন এবং আফ্রিকা (তিউনিস) অভিমুখে অগ্রসর হলেন।

য়াকূবা শহরের সন্নিকটবর্তী উত্তর আফ্রিকার রোমান গভর্ণর জারজের এক লাখ বিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মোকাবেলায় এল। উভয় পক্ষের বীরেরা সাহসিকতার সাথে বীরত্ব প্রদর্শন করতে লাগলো। জারজের তাঁর সৈন্যদের মধ্যে ঘোষণা করে দিল যে, কেউ ইবনে আবী সারাহের শির এনে দিতে পারলে তাকে এক লাখ দীনার পুরস্কার দেয়া হবে এবং শাহজাদীকে তার সাথে বিবাহ দেয়া হবে। আবদুর রহমান ইবনে যুবায়েরের পরামর্শে আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ ঘোষণা করে দিলেন- যে ব্যক্তি জারজেরের শির এনে দিতে পারবে তাকে এক লাখ দীনার পুরস্কার দেয়া হবে এবং জারজেরের কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দেয়া হবে। জারজেরের দেশের শাসনভারও তাকে অর্পণ করা হবে।

অবশেষে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র জারজেরকে হত্যা করলেন এবং ইসলামী বাহিনী বিজয় লাভ করলো। এ বিজয়ের পর ইসলামী বাহিনীর বীরেরা নিজেদের ঘোড়ার খুরে পশ্চিম দেশকে পদদলিত করলেন এবং ফেজ ও মরক্কোর উপকূলবর্তী শহরসমূহে ইসলামী পতাকা স্থাপন করলেন।

(আশহারুল মাশহীর ৪খ. ৭১৫-৭১৬)

এ সকল বিজয়ের পর আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ মিসর ফিরে এলেন এবং আফ্রিকায় সেখানকার সর্দারদের মধ্যে থেকে একজন শাসক নিযুক্ত করেন। সিদ্ধান্ত হলো যে, আফ্রিকাবাসী রোম কায়সারকে যে কর আদায় করতো এখন তা মুসলমানদেরকে আদায় করবে।

৩১ হিজরীতে রোম কায়সার কসতানতিন ইবনে হিরাক্লিয়াস আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণের জন্য পাঁচ শত জাহাজের এক বিশাল নৌবহর পাঠালো। এ বহর রওয়ানা হবার কথা মুসলমানরা জানতে পেরে শাম থেকে মুআবিয়া (রাঃ) এবং মিসর থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ নিজ নিজ বহর নিয়ে মোকাবেলার জন্য অগ্রসর হলেন। সাগর বক্ষে ইসলামী বহর রোমবহরের গতিরোধ করে

www.e-ilm.weebly.com

দাঁড়ালো। অতঃপর সিদ্ধান্ত হলো যে, উভয়পক্ষের জাহাজগুলো একত্রিত করে বেঁধে দেয়া হবে এবং তারপর মোকাবেলা হবে। এভাবে আরবরা প্রথম বারের মত সমুদ্রতরঙ্গের উপর তলোয়ার পরিচালনার আত্মহারা দৃশ্যের অবতারণা করে। মুসলমান বীরগণ দুশমনের রক্তে সাগরবক্ষ রঞ্জিত করেন। অসংখ্য রোমান সৈন্য নিহত হলো এবং অনেকে পালিয়ে সিসিলি দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করলো। স্বয়ং কায়সারও জখমে জর্জরিত হয়ে সিসিলি পৌছে এবং সেখানে সিসিলিবাসীর হাতে নিহত হয়। (ইবনে আছীর ৩খ. ৪৫)

পারস্য, খোরাসান ও তবরিস্তান

পারস্য, খোরাসান ও সিন্ধুসীমান্তবর্তী এলাকাসমূহ বসরা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। হযরত উমর (রাঃ) এর সময়ে বসরার প্রশাসক ছিলেন হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)। ২৬ হিজরীতে বসরার কিছুসংখ্যক বিশৃংখলাপ্রিয় ব্যক্তি তাঁর নামে অভিযোগ করে। হযরত উছমান (রাঃ) তাঁকে অপসারণ করে তাঁর স্থানে আবদুল্লাহ ইবনে আমেরকে নিযুক্ত করেন।

এ বছরই পারস্যবাসী বিদ্রোহ করলো এবং তাদের আমীর উবায়দুল্লাহ ইবনে মা'মারকে হত্যা করে ফেললো। ইবনে আমের স্বয়ং সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন। ইসতাখরে ভয়ানক লড়াই হলো। আবদুল্লাহ ইবনে আমের কামানের সাহায্যে প্রস্তর বর্ষণ করে বিদ্রোহীদের নিস্পেষিত করলেন এবং তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলেন।

৩০ হিজরীতে কূফার আমীর সাঈদ ইবনে আস এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তবরিস্তান অভিমুখে রওয়ানা হন। এ বাহিনীতে হযরত হাসান, হুসাইন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমার, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র এবং হুযায়ফা ইবনে য়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহুম অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ওদিকে তাঁর পৌছুনোর পূর্বেই সাঈদ ইবনে আস জুরজান ও তবরিস্তান জয় করে নেন।

এ সকল বিজয়ের পরেও জুরজান ও তবরিস্তানের লোকেরা সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ ছড়াতো। অবশেষে সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিকের সময়ে য়াযীদ ইবনে মুহাল্লাব এখানে পূর্ণ শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেন।

৩১ হিজরীতে খোরাসানের বিদ্রোহের খবর পাওয়া গেল। বসরা থেকে ইবনে আমের এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের মোকাবেলার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। অগ্রবাহিনীতে ছিলেন আহনাফ ইবনে কায়স। তাবসাইন নামে দুটি মজবুত দুর্গ তিনি জয় করেন। এ দুটিকে খোরসানের প্রবেশ দ্বার গণ্য করা হতো। অতঃপর তিনি নিশাপুর, তূস ও হিরাত জয় করেন।

www.e-ilm.weebly.com

ইবনে আমের আহনাফ ইবনে কায়সকে তাখারিস্তান অভিমুখে রওয়ানা করে দিলেন। তিনি মরভরোদ অভিমুখে অগ্রসর হলেন। সেখান পূর্বতুকির্স্তানের রাজা বিশাল বাহিনী নিয়ে মোকাবেলা করলো। কিন্তু আহনাফ ইবনে কায়স তাকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি তাখারিস্তানের রাজধানী বলখ জয় করেন। বলখ জয়ের পর আহনাফ খাওয়ারিজমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্ত তা জয় করতে সক্ষম হলেন না। তিনি ফিরে এলেন।

য়াজদগারদ হত্যা

পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইরান সম্রাট য়াজদগরদ তুর্কিস্তান এলাকায় চলে গিয়েছিলেন। যদিও তাঁর সেনাশক্তি টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। তথাপি নিজ হৃতরাজ্য পুরুদ্ধারের বাসনা তাঁর অন্তরে ঘুরপাক খেতো। এ বাসনা পূরণের জন্য তিনি এ কৌশল চিন্তা করলেন যে, সীমান্তবর্তী ইসলামী এলাকায় বিদ্রোহে উস্কানী দিতে লাগলেন। হযরত উছমান (রাঃ) এর সময়ে অধিকাংশ বিদ্রোহ তাঁরই ইংগিতে হয়।

শেষবারের মত ভাগ্য পরীক্ষার জন্য তিনি চীন ও তুর্কিস্তানের কতিপয় সর্দারের সহযোগিতায় সীস্তান আক্রমণ করলেন। ইসলামী বাহিনী তাঁকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে কোন আশ্রয়স্থলের সন্ধান করছিলেন। এ সময়ে তুর্কিস্থানে জনৈক সর্দার নিযাক খান তাঁকে নিজ এলাকায় আগমনের আহবান দিল। কিন্তু নিযাক খানের উদ্দেশ্যে ছিল যে কোন প্রকারে য়াজদগরকে বন্দী করে মুসলমানদের হাতে সোর্পদ করবে এবং নিজ বন্ধুত্বের প্রমাণ দিবে। য়াজদগরদও যেকোন রূপে তার ইচ্ছার কথা জেনে ফেললেন। তিনি সেখান থেকে পালিয়ে মরভরোদে প্রবাহমান মারগাব নদীর তীরবর্তী জনৈক যাঁতাওয়ালার নিকট আশ্রয় নিলেন। কিন্ত যাঁতাওয়ালা তাঁর মূল্যবান পোশাক ও মনিমাণিক্যের লোভে তাঁকে হত্যা করে ফেলল এবং তাঁর লাশ মারগার নদীতে ভাসিয়ে দিল। এ ঘটনা হিজরী ৩১ সনের।

এভাবে সাসানী রাজত্বের যে পতাকা তিনশত উনত্রিশ বছর যাবত পারস্যে অতি শান শওকতের সাথে উড্ডীন ছিল তা চিরদিনের জন্য নমিত হয়ে গেল।

www.e-ilm.weebly.com

অভ্যন্তরীণ কলহ্ ঃ কারণ ও ফলাফল

একটি সমীক্ষা

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক রাতের ঘটনা, মহানবী (সঃ) (স্বপ্ন দেখে) ঘাবড়ে গিয়ে জেগে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ

আশ্চর্য! আল্লাহ্ আমার উম্মতের প্রতি কী ভাণ্ডার অবতীর্ণ করলেন আর কী ফিতনা অবতীর্ণ করলেন।

অবশেষে সে সময় এসে উপনীত হলো যখন পৃথিবী নিজ কমনীয়তা ও কলহসজ্জা নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করলো এবং এ মহামারী তাদের জাতীয় ঐক্যের ধারা বিক্ষিপ্ত করে দিলো।

(১) হযরত উমর (রাঃ) এর যুগ ছিল ইসলামী বিজয়ের কাল। ইসলামী মুজাহিদগণ পারস্য, শাম ও মিসরের ময়দানসমূহে নিজেদের তলোয়ারের নৈপূণ্য প্রদর্শনে লিপ্ত ছিলেন। পার্থিব রূপসম্ভার নিয়ে ক্রীড়ামত্ত হবার তাদের ফরসুত ছিল না। তদুপরি হযরত উমর (রাঃ) এর শাসননীতি ও তাঁর কর্মনিদর্শন তাঁদেরকে দুনিয়াকে পদতলে দলিত করার অধিকার দিতো, কিন্ত তা বুকে লাগানোর অনুমতি ছিল না। ইসলামী সৈন্যদের শামের সুদৃশ্য ও স্বর্গসদৃশ শহরগুলোর নিকটে অবস্থান করাও নিষেধ ছিল এবং ইসলামী নেতাদের অনারব শান শওকত পরিহার করতে কঠোর তাগিদ ছিল।

হযরত উছমান (রাঃ) এর সময়ে যখন রণক্ষেত্রের ব্যস্ততা কিছুটা কমে গেল, বড় বড় শত্রু পরাজিত হলো, তখন বিজিত রাজ্যসমূহের সম্পদ থেকে মুসলমানদের উপকৃত হবার সুযোগ মিললো। লোকদের নবাবী জীবনপদ্ধতির প্রতি আগ্রহ জন্মালো। খড়ের ঘরগুলো সুউচ্চ অট্টালিকায় রূপান্তরিত হতে লাগলো এবং আহার্য পোশাকে কৃত্রিমতা পালিত হতে লাগলো। স্বয়ং হযরত উছমান (রাঃ) যেহেতু ধনাঢ্যের পুত্র ধনাঢ্য ছিলেন, সেহেতু তিনি জাতির এ নয়া চেতনার উন্মেষ প্রতিরোধ করতে পারলেন না।

(২) হযরত উছমান (রাঃ) এর সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে ইসলামী শক্তির সেনা কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় বসরা, কূফা, শাম ও মিসর। এ সকল স্থানে কুরাইশ ও হিজাযী মানুষ খুব কম ছিল। আরবদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলো বনু বকর, আবদুল কায়স, রাবীআ, আযদ, কিনদা, তাইম, কাযাআ প্রভৃতি গোত্রের লোকদের বসতি। এরা মহানবী (সাঃ) থেকে প্রত্যক্ষভাবে প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারে নি এবং আল্লাহ মনোনীত খেলাফত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে

www.e-ilm.weebly.com

পারেনি। এছাড়া অনেক অনারব কওমের ব্যক্তিও ছিল যারা বিজয়ীদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও দেশীয় স্বাতন্ত্র্যের চিত্র তাদের মন মস্তিষ্ক থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। তাদের কামনা ছিল পৃথিবীর যে ভাণ্ডার মুসলমানদের জন্য উগরে বেরোচ্ছিল তা থেকে তারা পূর্ণ রূপে উপকৃত হবে। নেতৃত্ব ও প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণরশি তাদের হাতে থাকবে। আর যদি তাদের হাতে না থাকে তাহলে কমপক্ষে এমন ব্যক্তির হাতে থাকবে যিনি তাদের হাতে থাকবেন।

(৩) হযরত উমর (রাঃ) এর সময় তিনি নেতৃস্থানীয় কুরাইশ ব্যক্তিবর্গকে মদীনা থেকে বাইরে যাবার অনুমতি দিতেন না। তিনি বলতেন ইসলামী উম্মাহর জন্য আমি এটি নিতান্ত ক্ষতিকর মনে করি যে, নেতৃস্থানীয় কুরাইশব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবেন। কুরাইশ মুহাজিরদের মধ্য থেকে কেউ জেহাদে অংশগ্রহণ করতে চাইলে তিনি তা মঞ্জুর করতেন না এবং বলতেন আপনাদের জন্য রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সময়কার জিহাদে অংশগ্রহণই যথেষ্ট। আপনাদের জিহাদে অংশগ্রহণের চেয়ে অধিক উপকারী হবে এই যে, দুনিয়া আপনাদের না দেখুক, আপনারাও দুনিয়া দেখবেন না।

হযরত উমর (রাঃ) এর এ সাবধানতার ফল ছিল এই যে, মুসলিম মিল্লাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ একাত্ম একবাক্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোনরূপ মতপার্থক্য ছিল না। হযরত উছমান (রাঃ) এর সময়ে এ সকল ব্যক্তি বিভিন্ন দেশ ও শহরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন। তাবারী লিখেন, হযরত উছমান (রাঃ) এর খেলাফতের প্রথম বছরেই নেতৃস্থানীয় কুরাইশগণ বিভিন্ন শহরে বড় বড় সম্পত্তি করে নেন। যেহেতু তাদের অবস্থা ছিল রাজ পরিবারের সদস্যদের মত এবং তাঁদের প্রতিটি সদস্য কোন সময়ে খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারতেন, সে কারণে স্বার্থপর ও মর্যাদালোভী লোকেরা তাঁদের চারিদিকে সমবেত হতে লাগলো। অতি শীঘ্র কুরাইশ নেতাদের প্রত্যেকের জন্য মতলববাজদের একটি করে দল সংগঠিত হয়ে গেল এবং প্রতিদল নিজ নেতার খেলাফত ও রাজত্ব কামনা করতে লাগলো। এ সকল আকাংখা কখনো কখনো মুখেও আসতে লাগলো এবং শ্রোতাদের কানেও ভাল শোনাতে লাগলো।

ফল দাঁড়ালো এই যে, মুসলিম মিল্লাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হতে লাগলো। তাছাড়া দারুল খেলাফত মদীনাও পূর্বের ন্যায় ইসলামী শক্তি ও প্রভাবের কেন্দ্র রইলো না।

(৪) প্রাগৈসলামী যুগে কুরাইশদের মধ্যে বনু হাশিম ও বনূ উমাইয়া পরিবারকে পার্থিব মর্যাদা ও সম্মানের দিক দিয়ে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বি মনে করা হতো। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর অমীয় শিক্ষা ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে এ মানসিকতা প্রায় নির্মূল করে দিয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময়ে মক্কার নেতা আবূ সুফিয়ানের অস্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব এ কল্যাণকামিতার ভিত্তিতে করা হয়েছিল। হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) হাশিমী ছিলেন না উমাভীও ছিলেন না। সেকারণে পারিবারিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগ্রত হবার কোন সুযোগ পায়নি।

হযরত উছমান (রাঃ) উমাভী ছিলেন। আর তাঁর বিপরীতে অপর সর্বোত্তম প্রার্থী হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন হাশিমী পরিবারের। এ কারণে প্রথমতঃ খলীফা নির্বাচনের সময় এ সুপ্ত আবেগ জেগে উঠবার সুযোগ মিললো। অতঃপর হযরত উছমান (রাঃ) যখন নিজ পরিবারের লোকদের সাথে সদাচরণ করতে লাগলেন এবং তাদেরকে তাঁর নির্ভরযোগ্য হবার কারণে বিজিত দেশগুলোর কতিপয় দেশে সুবাদারীতে অধিষ্ঠিত করলেন, তখন হাশেমী পরিবারগুলো এটি তাদের জন্য অধিকারহরণ বলে ধারণা করলো এবং পারিবারিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার এ সুপ্ত আবেগ পূর্ণরূপে জাগ্রত হলো।

এসব হেতুকারণের উপর ভিত্তি করে যখন ভূমি উত্তমরূপে প্রস্তুত হয়ে গেলো, তখন একদল ইসলামবিরোধী (যারা ইসলামের প্রভাবের সামনে নত হয়ে দৃশ্যতঃ ইসলামের গণ্ডীরেখার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল) নিজেদের ধূর্ত নেতা আবদুল্লাহ ইবনে সাবার নেতৃত্বে মিল্লাতের ভূমিতে মতানৈক্য ও বিভেদের বীজ বপন করে দেয়। হযরত উছমান (রাঃ) স্বভাবগতভাবে অত্যন্ত কোমল মেজাজ, মহৎ ও দয়ালু ছিলেন। তাঁর এ মানসিকতার কারণে একদিকে তাঁর নিকটজনেরা পদমর্যাদার ক্ষেত্রে অযথার্থ ফায়েদা হাসিলের সুযোগ খুঁজতে থাকে। অন্যদিকে তাঁর বিরোধীরা তাদের কলহসৃষ্টিতে কোনরূপ বাঁধা দেখলো না। এভাবে মতানৈক্য ও বিভেদের বীজের বৃক্ষে ফুলফল দানের উপযুক্ত পরিবেশ অর্জিত হলো। অবশেষে হযরত উছমান (রাঃ) এর শাহাদাতের আকৃতিতে সে যাক্কুম বৃক্ষ সৃষ্টি হলো যা ইসলামী মিল্লাতের সুরুচি নষ্ট করে দিল। এ মর্মান্তিক শিরোনামের বিশ্লেষণ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

www.e-ilm.weebly.com

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ছিল য়ামানের বাসিন্দা অত্যন্ত চালাক ও ধূর্ত জনৈক য়াহুদী। সে উছমান (রাঃ) এর সময়ে মদীনাতে এসে মুসলমানদের সাথে মিশে যায়। এখানে কিছুদিন অবস্থান করে সে মুসলমানদের অভ্যন্তরীন দুর্বলতাসমূহ সম্পর্কে অবগতি লাভ করে। অতঃপর মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টির জন্য একটি গোপন দল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এ দলের দাওয়াত ও প্রচারের ভিত্তি রাখা হয় রসূলপ্রেম ও আহলে বায়তের প্রতি অনুরাগ। যেমন ঃ

(১) আশ্চর্য, মুসলমানেরা হযরত ঈসা (আঃ) এর পুনরায় পৃথিবীতে আগমনের কথা বলে। কিন্তু মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পুনরাগমনের কথা মানে না।

(২) প্রতি পয়গম্বরের একজন করে ভারপ্রাপ্ত থাকেন। মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ভারপ্রাপ্ত হযরত আলী (রাঃ)। যেহেতু মুহাম্মাদ (সঃ) শেষনবী, অতএব, আলী (রাঃ) শেষ ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

(৩) বড় অন্যায়ের কথা, মুসলমানেরা নিজেদের নবীর অসিয়তের কোন পরওয়া করলো না এবং তাঁর ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও খেলাফত অন্যদের অর্পণ করা হয়েছে। অতএব, অন্যায্যদের অপসারণ করে ন্যায্যব্যক্তিকে (হযরত আলী) এ অধিকার প্রদান করা জরুরী। (বিদায়া নিহায়া ৭খ. ১৬৭)

এ গোপন দলের শাখা প্রতিষ্ঠার জন্য ইবনে সাবা প্রদেশসমূহের কেন্দ্রীয় শহরগুলোতে চক্কর দিল। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদের বেছে নিয়ে তাদেরকে কাজের কৌশল জানিয়ে দিল এবং নিজে মিসরে এসে অবস্থান গ্রহণ করলো। মিসরকেই সে তার কেন্দ্র রূপে সাব্যস্ত করলো।

কাজের জন্য যে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হলো তা ছিলো ঃ

(১) দৃশ্যতঃ মুত্তাকী ও পরহেজগার হয়ে সাধারণ লোকদের উপর নিজের প্রভাব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে;

(২) সমকালীন খলীফার (হযরত উছমান) বিরুদ্ধে অপবাদ রটাতে হবে এবং অভিযোগ আরোপ করতে হবে;

(৩) প্রশাসনের আমেলগণকে অস্থির করে তুলতে হবে। তাদেরকে অযোগ্য, দিয়ানতহীন ও জালেম সাব্যস্ত করে প্রদেশসমূহে কলহ ছাড়তে হবে;

(৪) এক শহর থেকে অন্য শহরে আমেলদের কল্পিত জুলুমের বিষয়ে পত্রাদি প্রেরণ করতে হবে। মদীনা মুনাওওয়ারা থেকে হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামের নামে জাল চিঠি পাঠাতে হবে। এসকল পত্রে এ তৎপরতার সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতার কথা প্রকাশ করতে হবে।

www.e-ilm.weebly.com

বিভিন্ন প্রদেশে এ পরিকল্পনা অনুযায়ী কিভাবে কাজ করা হয়, তা বিস্তারিত বর্ণনার জন্য আমরা প্রতিটি স্থানের অবস্থাদি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করছি ঃ

বসরা

হযরত উছমান (রাঃ) এর খেলাফতকালের শুরুতে বসরার ওয়ালী ছিলেন হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)। একবার তিনি আল্লাহর রাহে পদব্রজে গিয়ে জিহাদ করার ফযিলত বর্ণনা করেন। অতঃপর কুর্দিদের বিদ্রোহের কারণে তিনি এক জিহাদে বের হলেন। এসময় তিনি একটি তুর্কি ঘোড়ায় আরোহণ করেন। স্পষ্ট আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) এর উদ্দেশ্য এ ছিল না যে, যাদের কাছে বাহন আছে তারা তা ব্যবহার করবে না। বরং উদ্দেশ্য ছিল–যাদের বাহনের ব্যবস্থা না হয়, তারা অধিক ছওয়াব লাভের আশায় এ নেক কাজে বঞ্চিত না থাকুক। কিন্তু কলহপ্রিয় লোকেরা এটিকে একটি অজুহাত হিসেবে অবলম্বন করলো। একটি প্রতিনিধিদল অভিযোগ নিয়ে মদীনায় পৌঁছুলো এবং বললো, আমরা এমন ওয়ালী পছন্দ করি না, যাঁর কথা ও কাজে মিল থাকবে না। হযরত উছমান (রাঃ) তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করে তাঁর স্থানে আবদুল্লাহ ইবনে আমেরকে নিযুক্ত করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আমের একজন বীর কৌশলী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হলো যে, তিনি স্বল্প বয়স্ক এবং হযরত উছমান (রাঃ) এর আত্মীয়। আমীরুল মুমিনীন তাকে পাঠিয়ে গোত্রপালন করেছেন।

তাঁর সময়ে হাকীম ইবনে জাবালা এই কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করলো যে, ইসলামী সেনাবাহিনী যখন জেহাদে ব্যস্ত থাকতো, তখন সে তার দলবল নিয়ে যিম্মীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো এবং তাদের সম্পদাদি লুট করে নিত। সুযোগ পেলে মুসলমানদের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতেও সে দ্বিধা করতো না। বসরাবাসী তার অত্যাচারে অতীষ্ট হয়ে পড়লো। আবদুল্লাহ ইবনে আমের তাকে তার দলবলসহ বসরায় নজরবন্দী করে দিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা বসরায় এলে সে হাকীম ইবনে জাবালাকেই এখানকার সাবাঈ দলের নেতা নিযুক্ত করলো। হাকীম তার তৎপরতার গতি এ দলের উদ্দেশ্যসমূহ পূরণের প্রতি ফিরিয়ে দিলো।

কূফা

কূফা ফিতনাসরঞ্জামের দিক দিয়ে বসরার চেয়ে অগ্রগামী ছিল। এখানকার কলহপ্রিয় লোকদের নেতা ছিল আশতার নাখঈ, জুনদুব, ইবনে যিল হায়কা, সা'সাআঃ, আমর ইবনে হুমুক প্রমুখ।

হযরত উমর (রাঃ) এর অসিয়ত মোতাবেক হযরত উছমান (রাঃ) হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)-কে এখানকার ওয়ালী নিযুক্ত করেছিলেন।

www.e-ilm.weebly.com

হযরত সা'দ (রাঃ) যে কোন প্রয়োজনে রাজস্ব কর্মকর্তা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর নিকট থেকে কিছু অর্থ করজ নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সে করজ সময়মত আদায় করতে পারেন নি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) খুব কড়া তাগাদা দিলেন। কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে বিষয়টি অনেকদূর গড়িয়ে গেল এবং হযরত উছমান (রাঃ) পর্যন্ত অভিযোগ পৌঁছে গেল। হযরত উছমান (রাঃ) সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) কে অব্যাহতি প্রদান করে তাঁর স্থানে অলীদ ইবনে উকবাকে নিযুক্ত করলেন।

অলীদ ইবনে উকবার সময়ে কূফার কতিপয় যুবক এক ব্যক্তির ঘরে সিঁদ কেটে চুরি করে এবং গৃহকর্তাকে হত্যা করে। যুবকদেরকে ঘটনার সময়েই বন্দী করা হয় এবং দণ্ডস্বরূপ তাদের হত্যা করা হয়। এ সকল নিহতের আত্মীয় স্বজনেরা অলীদ ইবনে উকবা থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের কৌশল চিন্তা করতে লাগলো।

অলীদ রাতে একটি সভা অনুষ্ঠান করতেন। এ সভায় আবূ যায়দ তাঈ নামে জনৈক নও মুসলিম খৃষ্টান অংশগ্রহণ করতো। আবূ যায়দ সম্পর্কে প্রসিদ্ধি ছিল যে, সে মদ্যপান করে। অলীদের বিরুদ্ধবাদীরা রটনা করলো যে, তিনিও আবূ যায়দের সাথে মদ্যপানে শরীক হয়ে থাকেন। বিরুদ্ধবাদীরা এখানেই ক্ষান্ত থাকলো না। তাদের একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় রওয়ানা হলো। এ দলে অধিকাংশ ব্যক্তি এমন ছিল যাদেরকে অলীদ প্রশাসনিক স্বার্থে তাদের পদ থেকে অব্যাহতি দান করেছিলেন। এ প্রতিনিধিদল খলীফার দরবারে এসে অলীদের বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগ করলো। দুব্যক্তি সাক্ষ্য দিলো যে, আমরা অলীদকে মদ্যবমি করতে দেখেছি। হযরত উছমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) এর ফতোয়া অনুযায়ী অলীদকে কূফা থেকে ডেকে নিয়ে তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করলেন এবং তাঁকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দান করলেন।

অলীদ ইবনে উকবার পরে কূফায় নতুন ওয়ালী নিযুক্ত হন সাঈদ ইবনে আস। তিনিও রাতে একটি সভা অনুষ্ঠান করতেন। এতে সবার প্রবেশাধিকার থাকতো। এক রাতে সে সভায় এক ব্যক্তি বললো, 'তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ অতি দানশীল ব্যক্তি।' সাঈদ ইবনে আস বললেন, যার নিকট নেশাস্তিজের ন্যায় স্বর্ণোৎপাদক এলাকা থাকে, তার দানশীল হওয়াই উচিত। আমার জায়গীরে এমন এলাকা থাকলে তোমরা আমার দানশীলতার বহর দেখতে পেতে।' এক যুবক বললো, ফোরাত তীরের এলাকা যা কিসরা পরিবারের জায়গীর ছিল, তা আপনি নিয়ে নিন।' এ কথা শুনে আশতার নাখঈ, উমায়র ইবনে যাবী প্রমুখ বলে উঠলো, 'হতভাগা, তুমি আমাদের জায়গীর আমীরকে দিয়ে দিতে চাও।' এই বলে তারা সে যুবকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাকে খুব মারধর করলো।

www.e-ilm.weebly.com

সাঈদ ইবনে আস তাদের এ ধৃষ্টতায় খুব মর্মাহত হলেন এবং রাতের সভার সমাপ্তি ঘোষণা করে দরজায় দারোয়ান বসিয়ে দিলেন।

এখন এ লোকদের আর কোন কাজ রইলো না। তারা যেখানেই যেতো, সেখানেই সাঈদ ইবনে আসের দুর্নাম করতো। কূফার শান্তিপ্রিয় লোকেরা তাদের তৎপরতায় অতীষ্ট হয়ে হযরত উছমান (রাঃ) এর নিকট আবেদন করে পাঠালো যে, এসব ফিৎনাবাজ থেকে আমাদের মুক্তি দিন। হযরত উছমান (রাঃ) সাঈদ ইবনে আসকে লিখে পাঠালেন যে, তাদেরকে শাম দেশে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর নিকট পাঠিয়ে দিন।

এ দল শাম দেশে পৌঁছুলে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাদের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করলেন এবং উপদেশদানের মাধ্যমে তাদের সংশোধনের চেষ্টা করলেন কিন্তু তাদের মস্তিস্কে ফিতনা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। তারা মুআবিয়া (রাঃ) এর কথা শুনলো না। বরং তাঁর সাথে অশোভনীয় কথাবার্তা বললো। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) অপারগ হয়ে হযরত উছমান (রাঃ)-কে লিখে পাঠালেন যে, এদের সংশোধন করা আমার ক্ষমতার বাইরে। হযরত উছমান (রাঃ) নির্দেশ দিলেন যে, তাদেরকে আবদুর রহমান ইবনে খালেদের নিকট হিমসে পাঠিয়ে দিন। আবদুর রহমান তাদেরকে কঠোরভাবে শাসন করলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে তাদের স্বভাব ঠিক করে দিলেন। তারা নিজ ক্রিয়াকলাপ থেকে তওবা করলো এবং অনুশোচনা প্রকাশ করলো। আবদুর রহমান এ সম্পর্কে হযরত উছমান (রাঃ)-কে অবহিত করলেন। হযরত উছমান (রাঃ) আদেশ পাঠালেন যে, যদি তারা সংশোধিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তাদেরকে তাদের বাসভূমি কূফায় পাঠিয়ে দাও। কূফায় এসে তারা পুনরায় পূর্ব তৎপরতায় লিপ্ত হলো।

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা কূফায় এলে তার নির্বাচনী দৃষ্টি কলহপ্রিয় দলটির প্রতিই নিবদ্ধ হলো। সে তাদেরকেই তার এজেন্ট নিযুক্ত করলো।

শাম

হযরত উমর (রাঃ) এর সময় থেকে শামের ওয়ালী ছিলেন হযরত মুআবিয়া (রাঃ)। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) একজন দুরদর্শী কৌশলী ও প্রশাসনিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এ ধরনের ফেতনা এখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার সুযোগ দিলেন না। কিন্তু এখানে আরেকটি বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হলো। এ থেকে ফেতনাবাজদের গোপন দলটি খুব ফায়দা হাসিল করলো।

হযরত আবূ যর গিফারী (রাঃ) একজন দুনিয়াত্যাগী আবেদ সাহাবী ছিলেন। দুনিয়া ও পার্থিব সম্পত্তির প্রতি তাঁর ঘৃণা ছিল। গনীমতের এক পঞ্চমাংশ সম্পর্কে

www.e-ilm.weebly.com

তাঁর মত ছিল– এ অভাবী মুসলমানদের প্রাপ্য। আমীরের তা বায়তুল মালে জমিয়ে রাখবার অনুমতি নেই। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর চিন্তা ছিল রাজ্যের ক্রমবর্ধমান নাগরিক প্রয়োজনাদি মেটাবার লক্ষ্যে তা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যয়ের জন্য জমিয়ে রাখা। তিনি তা মুসলমানদের সম্পত্তি না বলে আল্লাহর সম্পত্তি বলতেন এবং আল্লাহর প্রতিনিধি আমীরের জন্য তাতে হস্তক্ষেপের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে বলে মনে করতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা শামে এসে হযরত আবূ যর (রাঃ)-কে বললো, দেখলেন? মুআবিয়া বায়তুল মালের ভাণ্ডারকে আল্লাহর সম্পত্তি বলছেন। অর্থাৎ মুসলমানদের তাতে কোন প্রাপ্য স্বীকৃত নয়। হযরত আবূ যর (রাঃ)-এর অন্তরে কথাটি দাগ কাটলো। তিনি সোজা হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর নিকট গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি মুসলমানদের সম্পত্তিকে আল্লাহর সম্পত্তি বলেন কেন? হযরত মুআবিয়া (রাঃ) অত্যন্ত নরম সুরে জবাব দিলেন, হে আবূ যর, আমরা সবাই আল্লাহর বান্দা। আমাদের সম্পত্তি তাঁরই সম্পত্তি।' হযরত আবূ যর (রাঃ) বললেন, না। আপনার এরূপ বলা উচিত নয়।' হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বললেন, আমি তো বলতে পারি না যে, আল্লাহর সম্পত্তি নয়। তবে, ঠিক আছে, ভবিষ্যতে মুসলমানদের সম্পত্তি বলবো।'

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা হযরত আবূ দারদা (রাঃ) এর নিকটও গেল এবং তাঁকেও প্ররোচিত করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তিনি তার চালে ধরা পড়লেন না। তিনি বললেন, আমার নিকট তো তোমাকে য়াহূদী মনে হচ্ছে। অতঃপর সে উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) এর নিকট গেল এবং এমনই কথাবার্তা বললো। তিনি তাকে ধরে নিয়ে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত করলেন এবং বললেন, এ ব্যক্তিই আবূ যর (রাঃ) এর প্ররোচিত করে আপনার নিকটে পাঠিয়েছে।

এরপর হযরত আবূ যর (রাঃ) এ মত প্রচার করতে লাগলেন যে, ধনীদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ জমিয়ে রাখার অধিকার নেই। দলীল হিসেবে তিনি এ আয়াত পেশ করতেন ঃ

'যারা স্বর্ণ রূপা গচ্ছিত করে রাখে, আর তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন। যেদিন সেগুলোতে আগুনের উত্তাপ দান করা হবে অতঃপর তা দিয়ে তাদের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে; এ তা-ই যা তোমরা নিজেদের জন্য গচ্ছিত করে রেখেছিলে, অতএব, তোমরা নিজেদের গচ্ছিতের স্বাদ গ্রহণ করো।' (তাওবা ৩৫)

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর দৃষ্টিকোণ ছিল এই যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার অর্থ যাকাত আদায় করা। যে সম্পদের যাকাত আদায় করা হয়, তা সঞ্চিত করে রাখা নিষেধ নয়।

www.e-ilm.weebly.com

হযরত আবূ যর (রাঃ) এর এ আন্দোলনের ফলে দরিদ্র্যরা ধনীদের বিরুদ্ধে জোট বাঁধলো এবং মুসলমানদের মধ্যে ধনাঢ্যতা ও দারিদ্র্যের প্রশ্নে এক নতুন বিতর্ক শুরু হলো।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) সকল বৃত্তান্ত হযরত উছমান (রাঃ)-কে অবহিত করলেন। সেখান থেকে নির্দেশ এলো যে, হযরত আবূ যর (রাঃ)-কে পূর্ণ সম্মানের সাথে মদীনায় পৌঁছে দিন। মদীনায় এসে হযরত আবূ যর (রাঃ) এখানেও সেই একই মতামত প্রচার করতে লাগলেন। হযরত উছমান (রাঃ) তাঁকে ডেকে বুঝিয়ে বললেন– হে আবূ যর, আল্লাহর ও রসূলের যে প্রাপ্য বান্দার নিকট রয়েছে আমি তা তাদের নিকট দাবী করবো এবং আমার নিকট তাদের যে প্রাপ্য রয়েছে তা আমি আদায় করবো। কিন্তু আমি কাউকে দুনিয়া বর্জনে বাধ্য করতে পারি না।' হযরত আবূ যর (রাঃ) বললেন, তাহলে আপনি আমাকে মদীনার বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দিন। কেননা রসূলে আকরাম (সঃ) বলেছিলেন, হে আবূ যর, মদীনার বসতি যখন সালাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, তখন তুমি এখান থেকে বিদায় নেবে।' হযরত উছমান (রাঃ) রাবাযা নামক স্থানে তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করলেন। সেখানে তাঁর জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করালেন এবং তাঁর জীবিকার জন্য কিছুসংখ্যক উট ও গোলাম তাঁকে অর্পণ করলেন।

(আশহার, তাবারীর উদ্ধৃতিতে ৪খ. ৭৩৪ এবং খাজারী ২খ. ৫৬)

মিসর

মিসরের ওয়ালী ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী সারাহ্। আমর ইবনে আস (রাঃ) এর পরিবর্তে মিসরবাসীরা তাঁকে পছন্দ করতো না। তদুপরি আফ্রিকা আক্রমণ ও কুসতুনতুনিয়ার কায়সারের সাথে মোকাবেলায় লিপ্ত থাকার কারণে, অভ্যন্তরীন পরিস্থিতির প্রতি নজর দেবার কোন সুযোগ তাঁর ছিল না।

এ ছাড়া হযরত উছমান (রাঃ) এর বিরোধী দুজন প্রভাবশালী সাহাবী মিসরে ছিলেন। এঁরা ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে আবী হুযায়ফা (রাঃ) ও মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর (রাঃ)। মুহাম্মদ ইবনে আবী হুযায়ফা (রাঃ) য়াতীম ছিলেন। পরিবারের অন্যান্য য়াতীমের মত তাঁরও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন হযরত উছমান (রাঃ)। বড় হয়ে তিনি হযরত উছমান (রাঃ) এর নিকট কোন স্থানের ওয়ালী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। হযরত উছমান (রাঃ) তাঁকে সে পদের জন্য উপযুক্ত মনে করেন নি। তাই সে দাবীপূরণে অস্বীকার করেন। অতঃপর তিনি হযরত উছমান (রাঃ) এর অনুমতি নিয়ে মিসরে চলে আসেন।

www.e-ilm.weebly.com

মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। তাঁর মাতা হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তির কিছু পাওনা ছিল। হযরত উছমান (রাঃ) তাঁর প্রতি কোনরূপ অনুগ্রহ করেন নি এবং সে পাওনা আদায় করিয়ে দিয়েছিলেন। এতে তিনি হযরত উছমান (রাঃ) এর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন।

এমত পরিস্থিতির কারণে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মিসরকে তার তৎপরতার কেন্দ্ররূপে ব্যবহারের জন্য সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত মনে করলো।

আবদুল্লাহ ইবনে সাবার ধারণা সঠিক প্রমাণিত হলো। এখানে শীঘ্র তার অনুসারীদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে হয়ে গেলো এবং সে হযরত উছমান (রাঃ) এর ব্যক্তিগত বিরোধীদের সাহায্য নিয়ে নিজ উদ্দেশ্য পূরণে পুরোপুরি প্রচেষ্টা শুরু করে দিলো। মিসরে আবদুল্লাহ ইবনে সাবার সাফল্য এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, ৩১ হিজরীতে যখন রোম কায়সার এক বিশাল নৌবহর নিয়ে মিসরের উপকূলে আক্রমণ চালিয়েছিল এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ ইসলামী বহরের অধিনায়ক হিসেবে মোকাবেলার জন্য বেরিয়ে পড়লেন, তখন এ সকল বিরোধী এ সময়েও তাদের তৎপরতা বন্ধ রাখেনি। এ নৌ অভিযানে মুহাম্মাদ ইবনে আবী হুযায়ফা (রাঃ) ও মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকর (রাঃ) প্রকাশ্যভাবে মুজাহিদগণকে সমকালীন খলীফা ও মিসরআমীরের বিরুদ্ধে উস্কানী দেন এবং তাঁদের দোষত্রুটি বর্ণনা করেন। অবশেষে বাধ্য হয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ তাদেরকে কিবতীদের পৃথক জাহাজে অরোহণ করিয়ে দিলেন। (বিদায়া নিহায়া ৭খ)

মিসর থেকে একটি 'পরিকল্পিত ব্যবস্থার' অধীনে বসরা, কূফা, শাম ও মদীনায় আঞ্চলিক শাসকদের অত্যাচার ও জনসাধারণের দুঃখকষ্টের বর্ণনা দিয়ে পত্রাদি পাঠানো হতো। তাছাড়া এসকল শহরের একস্থান থেকে অন্যস্থানেও এ ধরণের পত্রাদি পাঠানো হতো। যেখানে এ পত্র পৌছুতো, সেখানকার সাবাঈ এজেন্টরা তা খুব প্রচার করতো এবং জনসাধারণকে বর্তমান খলীফা ও তাঁর আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতো। ফল দাঁড়ালো এই যে, প্রতি স্থানের লোকেরা মনে করতো যে, কেবল আমরাই শান্তিতে আছি। আর সমগ্র ইসলামী জগত বনূ উমাইয়ার অত্যাচারে অতীষ্ট।

আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের পরামর্শ বৈঠক

মদীনা মুনাওরায় যখন এ ধরনের পত্র প্রচুর সংখ্যায় আসতে লাগলো, তখন এখানেও হযরত উছমান (রাঃ) ও তাঁর আঞ্চলিক শাসকদের সমালোচনা হতে লাগলো। স্পষ্টতঃ এখানে এমন একটি প্রভাবশালী মহল বিদ্যমান ছিল খলীফা

www.e-ilm.weebly.com

নির্বাচনে হযরত উছমান (রাঃ) এর ব্যাপারে যাঁদের দ্বিমত সাথে বিরোধ ছিল। অবশ্য এ দ্বিমত মতপার্থক্য পর্যন্ত সীমিত ছিল। বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীরা এ মহলটিকে নিজেদের হাতে নেয়ার চেষ্টা করলো এবং খেলাফতের সবুজ বাগান তাঁদেরকে দেখালো। কিন্তু এ আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মহল ফিতনা সৃষ্টিকারীদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে সম্মত হলো না। তবে তাদের প্রচেষ্টার এ ফল হলো যে, এ মহলটির মনে ধারণা জন্মালো যে, প্রদেশসমূহে হযরত উছমান (রাঃ) এর শাসনকর্তাগণের পক্ষ থেকে অশান্তি বিরাজ করছে এবং তাঁদের পক্ষ থেকেও পরিস্থিতি শোধরানোর দাবী হতে লাগলো।

৩৪ হিজরীতে হযরত উছমান (রাঃ) পরিস্থিতি শোধরানোর চেষ্টা করলেন এবং ইসলামী রাজ্যসমূহের প্রশাসকদের এক পরামর্শ বৈঠক অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত করলেন। তিনি সকল প্রদেশের ওয়ালীকে আদেশ পাঠালেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে আমের, আবদুল্লাহ ইবনে সাদ এবং সাঈদ ইবনে আস সমবেত হলেন। আমর ইবনে আস (রাঃ)কেও তাঁদের সাথে পরামর্শে শরীক করে নেয়া হলো। হযরত উছমান (রাঃ) তাদেরকে এ ফিতনার মূলের উপর আলোকপাত করতে বললেন। সকল প্রশাসক এক বাক্যে জবাব দিলেন, 'এ পুরো ফিতনা কতিপয় দুষ্কৃতিকারীর ষড়যন্ত্রের ফল এবং এর উদ্দেশ্য প্রশাসন ও প্রশাসকদের দুর্নাম রটানো ব্যতীত আর কিছু নয়।' হযরত উছমান (রাঃ) বললেন, তাহলে এ ফিতনা বন্ধ করার উপায় কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি নিম্নরূপ মত প্রকাশ করলেন ঃ

সাঈদ ইবনে আস বললেন, 'যে সকল দুষ্কৃতিকারীর হাতে এ ফিতনার নিয়ন্ত্রণরশি, তাদেরকে হত্যা করা হোক।'

আবদুল্লাহ ইবনে সাদ বললেন, 'বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীরা অর্থ সম্পদের প্রত্যাশী। স্বর্ণরূপার বড়ি দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে দিলে ভালো হয়।'

আবদুল্লাহ ইবনে আমের বললেন, 'এরা সবাই বেকারত্বে নিমজ্জিত। কোন দেশের উপর সেনা অভিযান চালিয়ে দিলে এসকল কাহিনী সমাপ্ত হয়ে যাবে।'

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বললেন, 'প্রতি প্রদেশের প্রশাসক নিজ প্রদেশের শান্তি শৃংখলার দায়িত্ব গ্রহণ করুন। নিজ প্রদেশকে সকল প্রকারের বিশৃংখলা থেকে মুক্ত রাখবার দায়িত্ব আমার।'

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি লোকদের সাথে অযথা নমনীয়তা প্রদর্শন করেন। হযরত উমর (রাঃ) আদর্শ অনুসরণ করুন। নমনীয়তার স্থানে নমনীয় আচরণ করুন এবং কঠোরতার ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করুন।'

www.e-ilm.weebly.com

মোটকথা পরামর্শ বৈঠকের গরিষ্ঠ মত ছিল–বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের সাথে কটোর আচরণ করা হোক। কিন্তু হযরত উছমান (রাঃ) এ মত অনুসারে কার্য করতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন ঃ

আপনারা যা কিছু বললেন, আমি শুনলাম। আমার আশংকা হয় এ সেই ফিতনা কি না যা রসূলুল্লাহ (সঃ) জানিয়ে গিয়েছেন। যদি সে ফিতনাই হয়, তাহলে তা সৃষ্টি হয়েই থাকবে। আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করবো নমীয়তা ও শিথিলতার সাথে এর দ্বার খুলতে বাঁধা প্রদান করার।

আমি নিজ কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করবো যে, আমি লোকদের সাথে সদাচরণ করতে ক্রটি করিনি এবং আগামীকাল আল্লাহর দরবারে নিজের উপর অভিযোগ উত্থাপিত হতে দেবো না। আমার বিশ্বাস এ ফিতনার চক্র ঘূর্ণায়মান থাকবে। তথাপি উছমানের সৌভাগ্য হবে যদি সে মরে গেলেও তাতে নাড়া না দেয়।'

অতঃপর হযরত উছমান (রাঃ) সকল আঞ্চলিক প্রশাসককে বিদায় করে দিলেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আমার নিকট মদীনা মুনাওওরার লোকদের পরিস্থিতি তেমন নিশ্চিন্ত হবার মত মনে হচ্ছে না। আপনি আমার সাথে শামে চলুন।'

হযরত উছমান (রাঃ) বললেন, 'আমার শির কাটা গেলেও আমি মদীনা ছাড়তে পারি না। আমি মহানবী (সঃ) এর প্রতিবেশিত্ব কোন মূল্যে বিক্রি করতে পারি না।' হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বললেন, 'তাহলে আমাকে অনুমতি দিন আমি আপনার নিরাপত্তার জন্য শাম থেকে একটি সেনাদল এখানে পাঠিয়ে দেবো।' হযরত উছমান (রাঃ) বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর প্রতিবেশীদের কষ্ট দিতেও আমার সম্মতি নেই।' (মুহাজারাতে খাযারী ২খ. ৫৮)

তদন্ত দল

কতিপয় সাহাবী হযরত উছমান (রাঃ)-কে পরামর্শ দিলেন যে, প্রদেশসমূহে তদন্ত দল পাঠানো হোক। তারা সঠিক পরিস্থিতি অবগত হবে। সেমতে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে কূফায়, উসামা ইবনে জায়দ (রাঃ)-কে বসরায় আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-কে শামে এবং আম্মার ইবনে য়াসের (রাঃ)-কে মিসরে পাঠানো হলো। তাঁরা সকলে ফিরে এসে জানালেন যে, পরিস্থিতি পূর্ব নিয়ম মোতাবেক রয়েছে। কোন অশান্তি বা বিশৃংখলা নেই। কিন্তু আম্মার ইবনে য়াসের (রাঃ) ফিরে এলেন না। মিসরের ওয়ালী জানালেন যে, তিনি বিরুদ্ধবাদীদের দলে মিশে গিয়েছেন যাদের মূল হোতা আবদুল্লাহ ইবনে সাবা।

www.e-ilm.weebly.com

দুষ্কৃতিকারীদের পরামর্শ

প্রস্তাব ছিল এই যে, পরামর্শ বৈঠকে অংশ গ্রহণের জন্য প্রদেশসমূহের ওয়ালীগণ যখন নিজ নিজ প্রদেশ থেকে চলে যাবেন তখন গণ বিদ্রোহ করা হোক। কিন্তু এ প্রস্তাব কার্যকরী করা গেলো না। অবশ্য আশতার নাখঈ কূফার দুষ্কৃতিকারীদের একটি দল নিয়ে কূফা থেকে বের হলো এবং কূফার ওয়ালী সাঈদ ইবনে আসকে শহরে প্রবেশে বাঁধা দান করলো। হযরত উছমান (রাঃ) কূফাবাসীদের কামনা অনুযায়ী হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)-কে সেখানকার ওয়ালী নিযুক্ত করলেন। ওয়ালীগণ নিজ নিজ প্রদেশে ফিরে এলে তখন আর বিদ্রোহের সুযোগ রইলো না। এখন তারা পরস্পর চিঠিপত্রাদির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করলো যে, প্রতি প্রদেশ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিপ্লবপ্রিয় ব্যক্তি মদীনায় পৌঁছবে। সেখানকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পরবর্তী কর্মসূচী প্রণয়ন করবে। প্রকাশ করা হবে যে, আমরা খলীফার নিকট নিজেদের অভিযোগ পেশ করতে এবং পরিস্থিতি শোধরানোর আবেদন করতে যাচ্ছি।

এ কর্মসূচী মোতাবেক কূফা, বসরা ও মিসর থেকে তিনটি প্রতিনিধিদল রওয়ানা হলো এবং মদীনার নিকটবর্তী স্থানে গিয়ে একত্রিত হলো। হযরত উছমান (রাঃ) তাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে তাদের নিকট এমন দুজন ব্যক্তি পাঠালেন, যাদেরকে বিশৃংখলাপ্রিয়রা নিজেদের সমর্থক মনে করতো। প্রতিনিধিরা তাদেরকে বললো, আমাদের উদ্দেশ্য হলো, আমরা খলীফার নিকট নিজেদের কল্পিত অভিযোগসমূহ পেশ করবো এবং সেগুলোর সমাধান চাইবো। স্পষ্টতঃই যেহেতু সেগুলোর কোন ভিত্তি নেই, অতএব খলীফা সেগুলো শোধরাবেন কি করে? তখন আমরা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে প্রচার করবো যে, আমরা খলীফার নিকট পরিস্থিতি শোধরানোর আবেদন করেছিলাম। কিন্তু তিনি তাতে সম্মত হলেন না। অতঃপর আগামী হজ্জের সময়ে আমরা বিরাট একটি দল নিয়ে হজ্জের নাম করে মদীনায় আসবো এবং খলীফাকে জোর করে অপসারণ করবো অথবা তাকে হত্যা করে ফেলবো।

প্রতিনিধিদলগুলো মদীনায় পৌঁছুলে কেউ কেউ হযরত উছমান (রাঃ)-কে পরামর্শ দিলেন যে, তাদেরকে হত্যা করে ফিতনার মূলোৎপাটন করে দিন। কিন্তু হযরত উছমান (রাঃ) বললেন, আমি মাত্র দু অবস্থায় কাউকে হত্যা করতে পারি, তাদের উপর শরীয়ত সম্মত দণ্ড সাব্যস্ত হলে বা মুরতাদ হয়ে গেলে। এ সকল লোকের আমার সম্পর্কে কিছু ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে। আমি সেগুলো নিরসনের চেষ্টা এবং তাদের অন্যায়সমূহ ক্ষমা করে তাদেরকে সুপথে আনবার চেষ্টা করবো।'

অতঃপর তিনি প্রতিনিধিদলের সদস্য ও মুহাজির আনসারদের সমবেত করে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। এতে তিনি বিরোধী দুষ্কৃতিকারীদের প্রতিটি অভিযোগের সপ্রমাণ উত্তর দেন।

www.e-ilm.weebly.com

হযরত উছমান (রাঃ) এর বক্তৃতা

হযরত উছমান (রাঃ) হামদ ও না'তের পর বলেনঃ

(১) বলা হচ্ছে আমি মিনায় দু'রাকাআতের পরিবর্তে চার রাকাআত নামাজ আদায় করেছি। প্রকৃত বিষয় এই যে, মক্কায় আমার পরিবার পরিজন ছিল এবং আমি সেখানে পৌঁছে ইকামতের (অবস্থানের) নিয়্যত করেছিলাম। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট শুনেছি কেউ কোথাও ইকামতের নিয়্যত করলে সেখানে সে মুকীমের মত পুরো নামাজ আদায় করবে।

(২) বলা হচ্ছে আমি সংরক্ষিত চারণভূমি রেখেছি। আল্লাহর শপথ, আমি সে চারণভূমিগুলোই সংরক্ষিত রেখেছি যেগুলো আমার পূর্বে সংরক্ষিত করা হয়েছিল। এ চারণভূমিগুলো সদকার পশুর জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। তথাপি কাউকে সেখান থেকে উপকার লাভে বাধা প্রদান করা হয় না। হ্যাঁ, কেবলমাত্র তাকে বাধা প্রদান করা হয় যে উৎকোচ দিয়ে নিজ প্রাপ্যের চেয়ে অধিক ফায়দা হাসিল করতে চায়। সেসকল চারণভূমি থেকে আমার ফায়দা হাসিল করার বিষয়টি এই যে, আমার নিকট মাত্র দুটি উট আছে। এ দুটো আমি হজ্জের সফরে ব্যবহার করে থাকি। এছাড়া আমার আর কোন পশু নেই। অথচ আপনারা জানেন যে, খলীফা হবার পূর্বে গোটা আরবে আমার চেয়ে অধিক পশু আর কারো ছিল না।

(৩) বলা হচ্ছে কুরআন কয়েকটি কপির আকারে ছিল। আমি একটিমাত্র রেখে আর সবগুলো ধ্বংস করে দিয়েছি। অথচ কুরআন একটি মাত্র কিতাব যা একই সত্ত্বার নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। নির্ভরযোগ্য সাহাবাদের একটি দল উপস্থিত রয়েছেন যাঁরা এ কুরআন রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নির্দেশনা মোতাবেক লিপিবদ্ধ করেছিলেন। আমি তাঁদেরই লিপিবদ্ধ কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছি।

(৪) বলা হচ্ছে আমি হাকাম ইবনে আবুল আসকে মদীনা মুনাওওরায় ডেকে এনেছি অথচ রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে তায়েফে দেশান্তর করেছিলেন। বিষয়টি হলো– রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে তায়েফে দেশান্তর করেছিলেন আবার রসূলুল্লাহ (সঃ) ই আমার সুপারিশে তাকে মদীনায় আসার অনুমতি দিয়েছিলেন। আমি আমার সময়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর অনুমতি বাস্তবায়ন করেছি মাত্র।

(৫) বলা হচ্ছে আমি যুবকদেরকে প্রশাসক নিযুক্ত করেছি। অথচ আমি যাদেরকে নিযুক্ত করেছি, তাদেরকে সদগুণাবলীবিশিষ্ট, বীর ও যোগ্য দেখেই নিযুক্ত করেছি। এরা তাদেরই প্রদেশসমূহের অধিবাসী। তাদের কর্মতৎপরতা এরাও অস্বীকার করতে পারেন না। এরা তাদের স্বদেশী। তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে এদের অজানা নেই। রইলো যুবক হওয়া। এ কোন দোষ নয়। আমার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সঃ) উসামা (রাঃ)-কে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন অথচ তখন তিনি যুবকের চেয়েও কম বয়সের ছিলেন।

www.e-ilm.weebly.com

(৬) বলা হচ্ছে আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহকে আফ্রিকার গনীমতমাল পুরস্কার হিসেবে দিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে আমি তাঁকে গনীমতমালের পঞ্চমাংশের এক পঞ্চমাংশ দিয়েছিলাম। যার পরিমাণ এক লাখ হয়। রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং শায়খাইন (রাঃ) তাঁদের সময়েও এ রূপ করেছেন। কিন্তু যখন এটি আমি জানতে পারলাম যে, সেনাসদস্যদের নিকট এটি অপছন্দীয় লেগেছে, তখন আমি আবদুল্লাহ থেকে এ অর্থ ফেরত নিয়ে তাদেরই মধ্যে বন্টন করে দিয়েছি।

(৭) বলা হচ্ছে আমি স্ববংশীয়দের ভালবাসি এবং তাদেরকে বিভিন্ন অনুদান দিয়ে থাকি। নিজ বংশীয়দের ভালবাসা কোন দোষের বিষয় নয়। কিন্তু আমার ভালবাসা আমাকে কখনও অন্যায়ে প্ররোচিত করেনি। আমি বায়তুল মাল থেকে তাদের ন্যায় সঙ্গত প্রাপ্য আদায় করে থাকি। অন্যান্য যে সকল অনুদান আমি দিয়ে থাকি, তা আমার নিজস্ব সম্পদ থেকে দিয়ে থাকি। বায়তুল মালের সম্পদ আমি নিজের বা নিজ আত্মীয় স্বজনের জন্য ব্যয় করা বৈধ মনে করিনা। আপনারা জানেন যে, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) ও শায়খাইন (রাঃ) এর সময়েও নিজ আত্মীয়স্বজনকে প্রচুর পরিমাণে অনুদান দিতাম। অথচ সে সময় আমার সম্পদের প্রয়োজন ছিল। আর এখন তো আমি বংশীয় বয়সে উপনীত হয়েছি। আমার জীবনের আর আশা নেই যে, অর্থ জমিয়ে রাখতে চাইবো। আমি কোন শহরের উপর রাজস্বের অপ্রয়োজনীয় বোঝা আরোপ করিনি যে, কারো আপত্তির অবকাশ থাকে। তাছাড়া সেখান থেকে যে পরিমাণ উসূল হয়, তা সেখানকারই কল্যাণে ব্যয় করা হয়। আমার নিকট শুধুমাত্র গনিমতের পঞ্চমাংশ জমা থাকে। এ সম্পদ মুসলমানরা উপযুক্ত স্থানসমূহে ব্যয় করার পূর্ণ অধিকার রাখে। আল্লাহর সম্পদে এক পয়সারও হস্তক্ষেপ করা হয় না। আমি এ থেকে নিজে কিছুই গ্রহণ করি না। এমন কি নিজ জীবিকার বোঝাও বায়তুল মালের উপর অর্পণ করি না।

(৮) বলা হচ্ছে আমি নিজ শুভাকাংক্ষীদের জমিখণ্ড দান করেছি। প্রকৃতপক্ষে বিজিত এলাকার জমিতে বিজয়ের পর মুহাজির ও আনসাররা অংশ পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা সেখানে রয়ে গেলেন, তাঁদের জমি তো তাদের পরিবারের লোকদের আয়ত্তে রয়েছে। কিন্ত যাঁরা ফিরে চলে এসেছেন, তাঁরা নিজেদের জমি থেকে উপকৃত হতে পারছিলেন না। তথাপি জমি তাদেরই মালিকানায় ছিল। আমি তাঁদের সুবিধার্থে তাঁদের দূরের জমিগুলো স্থানীয় সম্পত্তি মালিকদের নিকট বিক্রি করে জমির মালিকদের নিকট মূল্য হস্তান্তর করেছি।

(মুহাঃ খাযারী ২খ. ৫৯-৬১)

এরূপ বিস্তারিতভাবে তিনি ফিতনাবাজদের প্রতিটি অভিযোগের সপ্রমাণ ও নিরুত্তরকারী জবাব দিলেন। তিনি প্রতিটি জবাব বর্ণনা করে উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞেস করলেন–'আমি যা বলেছি তা কি সত্যি?'

www.e-ilm.weebly.com

উপস্থিত সকলে এক বাক্যে উত্তর দিলো, 'নিঃসন্দেহে আপনি যথার্থ ও সঠিক বলেছেন।'

স্পষ্টতঃই অসৎ উদ্দেশ্যের সংশোধন দলিল প্রমাণের দ্বারা হয় না। প্রতিনিধিদলসমুহ নিজ নিজ শহরে গিয়ে প্রচার করলো যে, আমরা মদীনায় গিয়ে খলীফার নিকট দলিল সম্পূর্ণ করেছি। কিন্তু তিনি পরিস্থিতি সংশোধনের জন্য প্রস্তুত নন।

দুস্কৃতিকারীদের যাত্রা

এখন ফিতনাবাজরা পরস্পর চিঠিপত্রাদির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা শাওয়াল মাসে বসরা, কূফা ও মিসর থেকে হজ্জের ভান করে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করবে এবং সেখানে পৌঁছে নিজ উদ্দেশ্য তলোয়ারের জোরে পূরণ করবে। সেমতে উপরোক্ত তিন স্থান থেকে এক হাজার করে লোকের দল বিভিন্ন দলে রওয়ানা হলো। মদীনার নিকটে পৌঁছে বসরীয় লোকেরা খাশাব নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করলো, কূফীয় লোকেরা আ'ওয়াস নামক স্থানে এবং মিসরীরা যীমারওয়া নামক স্থানে অবস্থান করলো। হযরত উছমান (রাঃ) এর বিরোধিতায় এরা তিন দলই একমত ছিল। কিন্তু পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের বিষয়ে তাদের মতপার্থক্য ছিল। ইবনে সাবা মিসরে অবস্থানের কারণে মিসরীয়রা সকলে হযরত আলী (রাঃ) এর সমর্থক ছিলো। কিন্তু কূফীয়দের গরিষ্ঠসংখ্যা হযরত যুবায়র (রাঃ)-কে এবং বসরীয়দের গরিষ্ঠসংখ্যা হযরত তালহা (রাঃ)-কে পছন্দ করতো।

মিসরীয়দের একটি প্রতিনিধিদল হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট এসে তাঁর নিকট সাহায্য কামনা করলো এবং খেলাফত কবুল করতে অনুরোধ করলো। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেন যীখাশাব, যীমারওয়া এবং আ'ওয়াসের সৈন্যরা অভিশপ্ত। সকল দ্বীনদার মুসলমানের তা জানা রয়েছে। আমি তোমাদের সহযোগিতা করতে পারি না।' বসরীয়রা হযরত তালহা (রাঃ) এবং কূফীয়রা হযরত যুবায়র (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলো। তারাও অনুরূপ উত্তর পেলো।

হযরত উছমান (রাঃ) তাদের উদ্দেশ্যের কথা জানতে পেরে হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট এলেন এবং তাঁর সাথে আত্মীয়তার কথা উল্লেখ করে বললেন আপনি তাদেরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে দিন। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আমি আপনাকে অনেকবার বনূ উমাইয়ার পক্ষপাতিত্ব করতে নিষেধ করেছি। কিন্তু আপনি মারওয়ান, মুআবিয়া, ইবনে আমের, ইবনে আবী সারাহ এবং সাঈদ ইবনে আসের পরামর্শেই চলেন। এখন আমি তাদেরকে কিভাবে ফিরিয়ে দেবো? হযরত উছমান (রাঃ) বললেন, আমি ভবিষ্যতে আপনারই পরামর্শে কাজ করবো এবং তাদের কথা শুনবো না।

www.e-ilm.weebly.com

হযরত আলী (রাঃ) ও মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা ত্রিশ জনের একটি দল নিয়ে মিসরীয়দের নিকট গেলেন। তাদেরকে আশ্বাস দিলেন যে, আমেলদের সম্পর্কে তোমাদের অভিযোগ সমাধান করিয়ে দেবো। এই বলে তাদেরকে মিসরের দিকে ফিরিয়ে দিলেন।

অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) হযরত উছমান (রাঃ) এর নিকট এলেন এবং বললেন, আপনি আমাকে যা বলেছেন তা মসজিদে ঘোষণা করে দিন যাতে সবাই তা অবহিত হয়ে যায় এবং বসরীয় ও কূফীয়দের হাঙ্গামাসৃষ্টির কোন অজুহাত না থাকে।

হযরত উছমান (রাঃ) মসজিদে এলেন এবং এক জোরালো খুতবা দান করলেন। তিনি বললেন, 'আমার যদি কোন ক্রুটি হয়ে থাকে, তাহলে আমি আল্লাহর নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনাদের মধ্যে যারা আহলুর রায় রয়েছেন, আমি তাদের নিকট আবেদন করছি আপনারা আমাকে যথাযথ পরামর্শ দান করবেন। আল্লাহর শপথ, যদি ন্যায় সঙ্গতভাবে আমাকে দাসসুলভ আনুগত্যের কথা বলা হয়, তাহলে আমার তাতে দ্বিমত থাকবে না। আমি ওয়াদা করছি যে, আমি আপনাদের কথা মতো কাজ করবো এবং মারওয়ান প্রমুখের কথা শুনবো না।'

এই বলে হযরত উছমান (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন এবং শ্রোতারাও কেঁদে ফেললো। (আশহারু মাশাহীরিল ইসলাম ৪খ. ৭৯৫)

দুষ্কৃতিকারীরা মদীনায়

মদীনাবাসীরা মনে করেছিলেন যে, এ বিবাদের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু তাদের আশ্চর্যের সীমা রইলো না যখন আকস্মিকভাবে দুষ্কৃতিকারীদের ধ্বনিতে মদীনার গলিসমূহ প্রতিধ্বনিত হলো। মিসর, কূফা ও বসরার দুস্কৃতিকারীদের দলসমূহ হযরত উছমান (রাঃ) এর বাড়ী অবরোধ করলো এবং প্রতিশোধ চাইতে লাগলো। হযরত আলী (রাঃ) মিসরীয়দের নিকট গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা তো মিসরে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলে। আবার ফিরে এলে কেন? তারা বললো, রাস্তায় আমরা একজন বার্তা বাহকের দেখা পেলাম। সে খুব দ্রুত মিসরে যাচ্ছিল। আমরা তাকে তল্লাশি করে তার নিকট আমাদের হত্যার নির্দেশ পেয়েছি। এতে খলীফার সিল রয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) বসরীয় ও কূফীয়দের জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা কেন এলে? তারা জবাব দিল– আমরা আমাদের ভাইদের সাহায্য করতে এসেছি।

হযরত আলী (রাঃ) প্রশ্ন করলেন, তোমাদের রাস্তা ভিন্ন ভিন্ন। তোমরা নিজ নিজ রাস্তায় যথেষ্ট পথ অতিক্রম করেছিলে। তারপরেও তোমাদের সাক্ষাত হলো কিভাবে? দুস্কৃতিকারীরা এর কোন উত্তর দিতে পারলো না। হযরত আলী

www.e-ilm.weebly.com

(রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ, এ সবই তোমাদের চক্রান্ত। দুষ্কৃতিকারীরা বললো, আপনি যাচ্ছে তাই বুঝুন। আমরা উছমান (রাঃ)-কে খলীফা রাখতে চাই না। আল্লাহ্ আমাদের জন্য এ ব্যক্তির রক্ত হালাল করে দিয়েছেন। আপনিও এ কাজে আমাদের সাহায্য করুন। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের সাহায্য করবো না। দুষ্কৃতিকারীরা বললো, তাহলে আপনি আমাদেরকে পত্র দিয়ে কেন ডেকেছেন? হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের কোন পত্র লিখিনি। এ উত্তরে দুষ্কৃতিকারীরা একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

হযরত আলী (রাঃ) যখন দেখলেন যে, পরিস্থিতি তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে এবং দুস্কৃতিকারীরা তাঁকেও এ ঘৃণ্য কাজে জড়াতে চায়, তখন তিনি মদীনার বাইরে আহ্জারুয যায়ত নামক স্থানে চলে গেলেন।

দুস্কৃতিকারীরা হযরত উছমান (রাঃ) এর নিকট গেল এবং নির্দেশনামা তাঁকে দেখিয়ে বললো, আপনি আমাদের সম্পর্কে এ পত্র লিখেছেন? হযরত উছমান (রাঃ) বললেন, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, এ পত্র সম্পর্কে আমার জানাও নেই। দুষ্কৃতিকারীরা বললো, আপনি যদি এ পত্র লিখে থাকেন তাহলে স্পষ্টতঃই আপনি খলীফার যোগ্য নন। আর যদি আপনার পক্ষ থেকে এ পত্র লেখা হয়ে থাকে অথচ আপনার জানা নেই, তাহলেও আপনি খলীফার যোগ্য নন। কেননা যে খলীফার অজ্ঞাতসারে তাঁর পক্ষ থেকে এমন গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ খলীফার সিল মোহরসহ জারী করা হবে তিনি এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের উপযুক্ত নন। দুষ্কৃতিকারীরা হযরত উছমান (রাঃ) এর নিকট দাবী করলো যে, আপনি খেলাফতের পর থেকে ইস্তফা দিন। হযরত উছমান (রাঃ) এ দাবী প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন, আমি এ সম্মানের পোশাক যা আল্লাহ্ আমাকে পরিয়েছে, নিজ হাতে অপসারিত করবো না।'

অবরোধ

দুষ্কৃতিকারীরা যখন দেখলো যে, হযরত উছমান (রাঃ) খেলাফতের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করতে প্রস্তুত নন, তখন তারা তাঁর বাড়ী অবরোধ করলো। এ অবরোধ চল্লিশ দিন যাবত স্থায়ী হলো এবং পরস্পর কঠিনতর হতে লাগলো। এমনকি শেষ দিনগুলোতে তাঁর নিকট পানি সরবরাহেও বাঁধা সৃষ্টি করা হলো।

দুস্কৃতিকারীরা শহরে ঘোষণা করে দিয়েছিলো যে, যে ব্যক্তি ঘরে বসে থাকবে, তাকে কোনরূপ উত্যক্ত করা হবে না। কিন্তু কেউ বাইরে এলে তার মোকাবেলা করা হবে। দুষ্কৃতিকারীদের অভদ্রতা এতই বেড়ে গিয়েছিলো যে,

www.e-ilm.weebly.com

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) কিছু খাদ্য সামগ্রী নিয়ে হযরত উছমান (রাঃ) এর নিকট যাবার চেষ্টা করলে তাঁকে জোরপূর্বক বাঁধা দেয়া হলো। এমত পরিস্থিতি দর্শনে অধিকাংশ সাহাবী নিজ নিজ ঘরে অবস্থান নিলেন এবং অনেকে মদীনা ছেড়ে বাইরে চলে গেলেন। তথাপি হযরত উছমান (রাঃ) এর বাড়ী রক্ষার জন্য প্রায় সাত শত লোকের একটি দল উপস্থিত ছিল। এ দলে হযরত হাসান, হুসাইন, হযরত তালহার পুত্র মুহাম্মাদ, হযরত যুবায়েরের পুত্র আবদুল্লাহ, হযরত আবূ হুরায়রা, সাঈদ ইবনে আস, মারওয়ান প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ রক্ষীবাহিনীর সাথে দুস্কৃতিকারীদের কয়েকদফা সংঘর্ষ হয়। মারওয়ান তো এত জখম হলেন যে, জীবনের আশা রইলো না। হযরত হাসানও কিছুটা জখম হলেন। দুস্কৃতিকারীরা চাইছিলো যে, কোনমতে মোকাবেলা ব্যতীত হযরত উছমান (রাঃ) কে কাবু করা। তারা জানতো যে, যদি যথার্থ মোকাবেলা হয় তাহলে হাসান হুসাইনের কারণে বনূ হাশিম ময়দানে নেমে আসবে।

অবরুদ্ধ অবস্থায়ই তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে হজ্জের আমীর করে মক্কা মুয়াজ্জামার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মক্কাবাসীরা মদীনার পরিস্থিতি অবহিত হোক। এছাড়া ইসলামী প্রদেশসমুহের আমীরদের নিকটেও তিনি দুস্কৃতিকারীদের হাঙ্গামাসৃষ্টির সংবাদ পাঠালেন এবং তাদের সাহায্য কামনা করেন।

অপূর্ব দৃঢ়তা ও অবিচলতা

অবরোধ যখন দীর্ঘস্থায়ী হলো এবং দুস্কৃতিকারীদের অত্যাচার বেড়ে গেল, তখন হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) হযরত উছমান (রাঃ) এর নিকটে উপস্থিত হলেন এবং আরজ করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি মুসলমানদের ইমাম। দুস্কৃতিকারীদের ষড়যন্ত্রের ফলে আজ আপনার জীবন হুমকির সম্মুখীন। আমি আপনার নিকট তিনটি প্রস্তাব রাখছি। এর যে কোন একটি আপনি গ্রহণ করুন। বাইরে বেরিয়ে দুষ্কৃতিকারীদের মোকাবেলা করুন। আপনার সাথে জানবাজদের যথেষ্ট পরিমাণ উপস্থিত রয়েছে। তাছাড়াও আপনি সঠিক পথে রয়েছেন। হকের বিজয়ের জন্য মদীনাবাসী আপনার সাহায্য করবে। অথবা সদরদরজা যা দুস্কৃতিকারীরা ঘিরে রেখেছে, তা ছেড়ে অন্য কোনদিকে পথ করে আপনি মক্কা মুয়াজ্জামায় চলে যান। দুষ্কৃতিকারীদের এ ক্ষমতা নেই যে, মক্কায় আপনার উপর হাত তোলে। অথবা আপনি শামদেশে চলে যান। সেখানে মুআবিয়া (রাঃ) এবং আপনার অন্যান্য সাহায্যকারীরা রয়েছেন।

হযরত উছমান (রাঃ) জবাব দিলেন ঃ প্রথম প্রস্তাবটি আমার নিকট এ জন্য গ্রাহ্য নয় যে, আমি সে প্রথম খলীফা হতে চাই না যিনি নিজ তলোয়ার

www.e-ilm.weebly.com

মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত করবেন। দ্বিতীয় প্রস্তাব এজন্য গ্রহণযোগ্য নয় যে, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট শুনেছি জনৈক কুরাইশ ব্যক্তি মক্কার অসম্মান করবে এবং গোটা দুনিয়ার আজাবের অর্ধেক তার অংশে পড়বে। আমি চাই না যে, আমি মক্কার অসম্মানের কারণ হই। তৃতীয় পথ আমি এ জন্য অবলম্বন করতে পারি না যে, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর হিজরতস্থান এবং তাঁর প্রতিবেশিত্ব কোন মূল্যে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নই। (আশহারু মাশাহীরিল ইসলাম ৪খ. ৮০১)

শাহাদাত

রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ভবিষ্যদ্বানী সমূহের ভিত্তিতে হযরত উছমান (রাঃ) এর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, শাহাদাতের সৌভাগ্য তাঁর জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে। তথাপি তিনি মহানবী (সঃ) এরই নিকট শুনেছিলেন যে, উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে যখন একবার তলোয়ার উন্মুক্ত করা হবে তখন তা কেয়ামত পর্যন্ত কোষহীন থাকবে। সে কারণে তাঁর ইচ্ছা ছিল উম্মতে মুহাম্মাদীকে এ অভ্যন্তরীন আজাব থেকে যতক্ষণ রক্ষা করা যায়, ততক্ষণ রক্ষা করার চেষ্টা করা যাক। সেমতে অবরোধকালে তিনি কয়েকবার ঘরের ছাদে আরোহণ করে অবরোধকারীদের উপদেশ নসিহত করেন এবং বিস্তারিত ভাবে নিজ মাহাত্ম্য ও ফযিলত বর্ণনা করেন। কিন্তু যাদের ঈমানের আলো স্তিমিত হয়ে পড়েছিল সে পাষাণহৃদয় লোকদের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো না।

অবশেষে যখন বিদ্রোহীদের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মালো যে, হযরত উছমান (রাঃ) খেলাফতের দায়িত্ব পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নন এবং আরো বেশীদিন অপেক্ষা করলে হজ্জের মৌসুম শেষ হয়ে যাবার কারণে অনেক হাজী মদীনা মুনাওওরায় আসবেন এবং প্রদেশসমূহ হতে সাহায্যকারী সৈন্য এসে পৌছুবে, তখন তারা তাঁকে শহীদ করার সিদ্ধান্ত করলো।

সদর দরজায় হযরত হাসান, হুসাইন, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র, মুহাম্মাদ ইবনে তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রতিরোধের জন্য উপস্থিত ছিলেন। বিদ্রোহীরা তাঁদের সাথে মোকাবেলা করা সমীচীন মনে করছিলো না। সে কারণে তারা দেয়াল টপকিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়লো। হযরত উছমান (রাঃ) এ সময় কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকর (রাঃ) এ দলের সামনে সামনে ছিলেন। তিনি হযরত উছমান (রাঃ) এর সাথে বেয়াদবীমূলক আচরণ করলেন। হযরত উছমান (রাঃ) বললেন, ভাতিজা, আজ যদি তোমার পিতা জীবিত থাকতেন, তাহলে তোমার এ আচরণ তাঁর পছন্দ হতো না।' মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকর (রাঃ) লজ্জিত হয়ে পিছিয়ে এলেন। গাফিকী তাঁর

www.e-ilm.weebly.com

কপালে লোহার এক আঘাত করলো। এতে তিনি কাত হয়ে পড়ে গেলেন। সাওদান ইবনে ইমরান তাঁর উপর তলোয়ারের আঘাত করলো। কিন্তু কৃতজ্ঞ বিবি নায়েলা বিনতে ফারাফিসা নিজ হাতে তা প্রতিহত করলেন এবং তাঁর আংগুলগুলো কেটে পৃথক হয়ে পড়ে গেল। অতঃপর আমর ইবনে হুমুক নিজ আহাম্মকী ও গোমরাহীর প্রমাণ এভাবে দিলো যে, সে যুন নূরাইনের পবিত্র বুকের উপর উঠে বসলো এবং তাঁকে নয়টি জখম করলো। অতঃপর জনৈক আদি হতভাগা অগ্রসর হলো এবং শিরটি পবিত্র শরীর থেকে পৃথক করে দিল। হযরত উছমান (রাঃ) এর রক্তের ফোটা কুরআনের যে আয়াতের উপর পড়ে তা ছিল ঃ

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم

"তাদের মোকাবেলায় আল্লাহ তোমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ"। (বাকারা ১৩৭)

হযরত উছমান (রাঃ) এর বাড়ী ছিল অতি প্রশস্ত। এ ভয়ানক ঘটনা এত নীরবে ও দ্রুত ঘটে গেল যে, রক্ষীরা টেরও পেলেন না। যখন জানতে পারলেন, তখন প্রত্যেক নিজ নিজ স্থানে হতভম্ব হয়ে পড়লেন। কারো এ ধারণা ছিল না যে, বিদ্রোহীরা এত ধৃষ্টতা করবে যে, রসূলের মদীনায় রসূলের খলীফার গলায় ছুরি চালাবে। হযরত উছমান (রাঃ) এর প্রশাসনিক বিষয়ে যাঁদের অকৃত্রিম মতপার্থক্য ছিল তারাও দুস্কৃতিকারীদের এ কর্মে আফসোস করতে লাগলেন।

হযরত আলী (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত যুবায়র (রাঃ) এবং হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এর নিকট এ সংবাদ পৌছুলে তাঁদের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেল। হযরত উছমান (রাঃ) এর বাড়ীতে গিয়ে দেখেন তিনি স্রষ্টার সান্নিধ্যে চলে গিয়েছেন। সবার মুখ দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে এলো- ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হযরত আলী (রাঃ) নিজ পুত্রদের বললেন, তোমরা এখানে থাকতে আমীরুল মুমিনীন এভাবে শহীদ হয়ে গেলেন। এই বলে তিনি হাসান হুসাইনকে (রাঃ) শাস্তি দিলেন এবং মুহাম্মাদ ইবনে তালহা (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)-কে তিরস্কার করলেন।

খলীফাতুল মুসলিমীনের জীবন বাগিচা ধ্বংস করার পর দুস্কৃতিকারীরা খলীফাগৃহ লুট করলো। অতঃপর বায়তুল মালের উপর হাত পরিস্কার করলো। গোটা মদীনায় দুস্কৃতিকারীদের দৌরাত্ম্য ছিল। তাদের অন্তর ভয়ে আচ্ছন্ন ছিল এবং ভয়ে তাদের মুখ বন্ধ ছিল।

হযরত উছমান (রাঃ) এর শাহাদাত হয় হিজরী ৩৫ সনের ১৮ই যিলহজ্জ শুক্রবার আসরের সময়ে। তিনদিন যাবত লাশ কাপন–দাফন ব্যতীত পড়ে

www.e-ilm.weebly.com

রইলো। কতিপয় ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট গেল। তাঁর সুপারিশে দাফনের অনুমতি পাওয়া গেল। মাগরিব ও ইশার মাঝখানে জানাজা উঠানো হলো। সতেরো ব্যক্তি মিলে জানাজা নামাজ পড়লেন। হযরত জুবায়র ইবনে মুতইম (রাঃ) অথবা হযরত যুবায়র (রাঃ) জানাজা নামাজের ইমামত করেন। জান্নাতুল বাকীর নিকটে হাশশে কাওকাব-এ খলীফাকে রঞ্জিত কাপড়ে দাফন করে দেয়া হলো।

দুঃখজনক পরিণতি

উছমান হন্তাদের তলোয়ার মুসলমানদের জাতিগত ঐক্য চারভাগে বিভক্ত করে দিল। যথা (১) উছমানী (২) শীয়া-ই-আলী (৩) মুরজিয়া (৪) আহলুল জামাআত।

উছমানী নামে পরিচিত হয় শামীয় ও বসরীয়রা। তারা হযরত উছমান (রাঃ)-কে হক ও ন্যায়ের উপর মনে করতো এবং তাঁর হন্তাদের জালিম সাব্যস্ত করে তাদের উপর দণ্ড প্রয়োগ জরুরী মনে করত। তবে শামীয়রা বলত যে, মাজলুম খলীফার অলী হযরত মুআবিয়া (রাঃ), যিনি তাঁর অতি নিকটাত্মীয়। অতএব, আমাদের তাঁর পতাকার নীচে সমবেত হয়ে মাজলুম খলীফার বদলা নেয়া উচিত। বসরীয়রা বদলার দাবীদার হিসেবে হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যুবায়র (রাঃ)-কে মনে করতো। কেননা তাঁরা দুজন হযরত উমর (রাঃ) এর প্রস্তাবিত পরামর্শ কমিটির সদস্য ছিলেন।

কূফীয়রা শীয়া-ই-আলী রূপে আবির্ভূত হয়। তারা হযরত উছমান (রাঃ)-কে খলীফা হবার যোগ্য মনে করতো না। উছমান হন্তারাও এ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মুরজিয়া নামে আখ্যায়িত হয় তারা, যারা সে সময়ে বিভিন্ন শহর বা এলাকায় জিহাদে লিপ্ত ছিলো। তারা বললো, আমরা যখন মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে গেলাম তখন মুসলমানদের মধ্যে কোন বিভেদ ছিল না। ফিরে এসে নিজেদের মধ্যে তলোয়ার চালনা দেখলাম। আমরা জানিনা শীয়া-ই-আলী সঠিক না শীয়া-ই-উছমান। অতএব আমরা কাউকে অভিশাপ করব না আবার কাউকে সমর্থনও করবো না। বরং তাদের বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত করবো।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত নামে তারা আখ্যায়িত হয় যারা হাজার হাজার সাহাবায়ে কেরাম ও প্রসিদ্ধ তাবেয়ীনের ভারসাম্যপূর্ণ মত অবলম্বন করে। তাঁদের বক্তব্য ছিল এই যে, আমরা উছমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ) দুজনকেই ভালবাসি। আমরা কাউকে অভিশাপ দেওয়া বৈধ মনে করিনা। তাঁদের কারো ভুল হয়ে গিয়ে থাকলে তা ইজতিহাদী ভুল যা অপরাধ হিসেবে গণ্য নয়।
(আশহারু মাশাহিরিল ইসলাম ৪খ. ৮১৬ ইবনে আসাকের-এর বরাত)

www.e-ilm.weebly.com

স্পষ্টতঃই এ দুঃখজনক মতভেদের ভিত্তি ছিল এই সাময়িক রাজনৈতিক প্রশ্ন যে, "হযরত উছমান (রাঃ) অপসারণযোগ্য কিনা" এবং ভিন্ন মতাবলম্বী দলসমূহের অবস্থা রাজনৈতিক দলসমূহের মত, পরামর্শ ও গণতন্ত্রভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যাদের উপস্থিতি অপরিহার্য। কিন্তু ইসলামের যেসকল শত্রু হাত পর্দার অন্তরাল থেকে কাজ করছিল তাদের উদ্দেশ্যে ছিল ইসলামী ঐক্যের সুউচ্চ প্রাসাদে এমন ফাঁটল সৃষ্টি করা যা কখনও পূরণ করা না যায়। এসব ইসলামশত্রু প্রচেষ্টায় প্রতি দল নিজেদের নির্দিষ্ট মতসমূহের ব্যাখ্যা কিতাব ও সুন্নাহর মধ্যে অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করলো। অনেক পথভ্রষ্ট দল ইসলামী আকীদায় এমন বিকৃতিসাধন করলো যা তাদের ক্রিয়াকলাপের সমর্থক হতে পারে। ফল দাঁড়ালো তা-ই যা শত্রুদের কাম্য ছিল। অতি শীঘ্র এ সকল রাজনৈতিক দল ধর্মীয় উপদলে রূপান্তরিত হয়ে গেলো। পরবর্তীতে এ সকল উপদল আরো ক্ষুদ উপদলসমূহে বিভক্ত হয়ে গেলো। এভাবে ইসলামী ঐক্যের পোশাক টুকরো টুকরো হয়ে গেলো।

এ সকল মতভেদের আরও বেদনাদায়ক ফল এই হলো যে, খেলাফত আসনটি পূর্ণ করার বিষয় সর্বসাধারণের মতামতের পরিবর্তে তলোয়ারের ভাষায় হতে লাগলো। যে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল শূরা পদ্ধতি, তা লণ্ড ভণ্ড হয়ে গেল। ইসলামী শাসনব্যবস্থার সাথে এরই অধীনে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী জীবন ব্যবস্থাও ধ্বংস হয়ে গেল। এভাবে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর এ ভবিষ্যদ্বানীসমূহ প্রতিফলিত হলো ঃ

'ইসলামী ব্যবস্থা নিজ অক্ষের উপর (কিতাব ও সুন্নাহ) পঁয়ত্রিশ বা ছত্রিশ বা সাইত্রিশ বছর আবর্তিত হতে থাকে।" (আবূ দাউদ)

(ইসলামী ইতিহাসের প্রারম্ভকাল হিজরতের সময় থেকে হিসেব করলে পঁয়ত্রিশতম বছর হযরত উছমান (রাঃ) এর শাহাদাতের সময়ে পড়ে। ছত্রিশতম বছরে উষ্ট্রযুদ্ধ এবং সাঁইত্রিশতম বছরে সিফফীন যুদ্ধ সংঘটিত হয়)

"আমার উম্মতের মধ্যে যখন তলোয়ার স্থাপন করা হবে, তখন তা কেয়ামত পর্যন্ত আর উঠবে না।" (তিরমিযী)

উছমান (রাঃ) এর পরিবার

হযরত উছমান গনী (রাঃ) মক্কায় রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কন্যা হযরত রুকাইয়া (রাঃ)-কে বিবাহ করেন। বদর যুদ্ধের সময় তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর অপর কন্যা হযরত উম্মে কুলছুম (রাঃ) এর সাথে তাঁর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। হযরত রুকাইয়া (রাঃ) এর গর্ভে তাঁর পুত্র জ্যৈষ্ঠ আব্দুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবেই ইন্তেকাল করেন। হযরত উম্মে কুলছুমের পর তিনি নিম্নলিখিত বিবাহ করেন ঃ

www.e-ilm.weebly.com

ফাখতা বিনতে গাজাওয়ান–তাঁর গর্ভে এক পুত্র কনিষ্ঠ আব্দুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সেই ইন্তেকাল করেন।

উম্মে আমর বিনতে জুনদুব দাওসী–তাঁর গর্ভে চার পুত্র জন্মগ্রহণ করেন–আমর, ওয়ালিদ, আবান ও উমর এবং এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন যাঁর নাম মারয়াম।

ফাতেমা বিনতে অলীদ মাখযুমিয়্যা–তাঁর গর্ভে দুপুত্র অলীদ ও সাঈদ এবং এক কন্যা উম্মে সাঈদ জন্মগ্রহণ করেন।

উম্মে বানীন বিনতে উয়ায়না ফাযারিয়্যা–তাঁর গর্ভে আব্দুল মালেক জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সে ইন্তেকাল করেন।

রমলা বিনতে শায়বা–তার গর্ভে তিন কন্যা–আয়েশা, উম্মে আবান ও উম্মে আমর জন্মগ্রহণ করেন।

নায়েলা বিনতে ফারাফিসা কালবিয়্যা –তাঁর গর্ভে মারয়াম নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশবেই ইন্তেকাল করেন।

শাহাদাতের সময় ফাখতা, উম্মুল বানীন, রমলা ও নায়েলা বর্তমান ছিলেন।

হযরত উছমান (রাঃ) এর আমেলগণ

হিজরী ৩৫ সনে হযরত উছমান (রাঃ) যখন শাহাদাত বরণ করেন তখন তাঁর পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রদেশে নিম্নলিখিত আমেলগণ নিযুক্ত ছিলেনঃ

মক্কা – আব্দুল্লাহ ইবনে হাযরামী

তায়েফ–কাসেম ইবনে রাবীআ ছাকাফী

সানআ–য়া'লা ইবনে মুনাব্বিহ

জুনদ–আব্দুল্লাহ ইবনে রাবীআ

বসরা–আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আমের

শাম–মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান

হিমস–আব্দুর রহমান ইবনে খালেদ ইবনে অলীদ

কিন্নাসরীন–হাবীব ইবনে মাসলামা ফিহরী

জর্দান–আবুল আওয়ার সালামী

ফিলিস্তিনি–আলকামা ইবনে হাকীম কিনানী

কূফা–আবু মুসা আশআরী

কারকীসা–জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ

www.e-ilm.weebly.com

আজারবাইজান–আশআছ ইবনে কায়স কিনদী

হুলওয়ান–উতায়বা ইবনে নিহাস

মাহ–মালেক ইবনে হাবীব

হামাদান–নাসীর

রায়–সাঈদ ইবনে কায়েস

ইস্পাহান–সায়েব ইবনে আকরা

মিসর–আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ

এগুলোর মধ্যে বড় প্রদেশ ছিল ৫টি–মিসর, শাম, কিন্নানরীন, বসরা ও কূফা। সেননা কেন্দ্র হওয়ার কারণে অন্যান্য প্রদেশসমূহ এ পাঁচটির অধীনে ছিল। মিসরের অধীনে ছিল আফ্রিকার গোটা অধিকৃত এলাকা। শামের অধীনে দামেশক ব্যতীত হিমস, জর্দান ও ফিলিস্তিন ছিল। কিন্নাসরীনের অধীনে গোটা আরমেনিয়া ছিল। কূফা ও বসরার অধীনে সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম পারস্য ছিল। এ প্রদেশ সমূহের প্রধানগণও শাসনকর্তা রূপে বিবেচিত হতেন।

হযরত উছমান (রাঃ) এর সময়ে বায়তুল মালের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন উকবা ইবনে আমের (রাঃ) এবং কাজী ছিলেন হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রাঃ)।

www.e-ilm.weebly.com

আলী মুরতাযা (রাঃ) এর যুগ

খলীফা নির্বাচন

হযরত উছমান গনী (রাঃ) এর শাহাদাতের পর মদীনা মুনাওওরার পরিবেশ ফিতনা ফাসাদের ধূলায় অন্ধকার ছিল। বহিরাগতরা (মিসর, কুফা ও বসরার দুষ্কৃতিকারীরা) মদীনায় ছেয়ে ছিল। নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামের কেউ কেউ দেশের সেনা ও প্রশাসনিক দায়িত্বে সীমান্ত এলাকায় ও বিভিন্ন প্রদেশে বিক্ষিপ্ত ছিলেন, কেউ কেউ হজ্জ পালনের জন্য মক্কায় অবস্থান করছিলেন, আর কেউ কেউ মদীনায় ফিতনা ফাসাদের প্রাবল্য দেখে বিভিন্ন দিকে চলে গিয়েছিলেন। স্বল্প সংখ্যক অবশ্য মদীনায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বহিরাগতদের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব তাঁদের স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের সুযোগ রাখেনি।

হযরত উছমান (রাঃ) এর শাহাদাতের পর তিনদিন যাবত খেলাফতের আসন শূন্য ছিল। গাফেকী (মিসরীয় দুষ্কৃতিকারীদের নেতা) মসজিদে নববীতে ইমামতির দায়িত্ব পালন করতে লাগলো। এ সময়ে বহিরাগতরা হযরত আলী (রাঃ) এর নাম খলীফা হিসেবে প্রস্তাব করলো এবং তাঁকে এ পদ গ্রহণের জন্য আবেদন করলো। হযরত আলী (রাঃ) প্রথমে অস্বীকার করলেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে, নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামেরও এ-ই মত, তখন তিনি এ গুরু দায়িত্বের বোঝা গ্রহণ করে নিলেন।

সর্বপ্রথম মালিক আশতার বায়আত করলো। অতঃপর অন্য লোকেরা। হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যুবায়র (রাঃ) যেহেতু হযরত উমর (রাঃ) এর প্রস্তাবিত শূরা কমিটির সদস্য ছিলেন এবং তাঁদের পক্ষ থেকে বিরোধিতার আশংকা ছিল, সেজন্য হযরত আলী (রাঃ) তাঁদেরকে ডাকলেন এবং তাঁদেরকে বললেন, আপনি যদি খেলাফতের আকাংখী হন তাহলে আমি আপনার হাতে বায়আত করতে প্রস্তুত রয়েছি। উভয়েই প্রত্যাখ্যান করলেন। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, তাহলে আপনারা আমার হাতে বায়আত করেন। একথা শুনে হযরত তালহা (রাঃ) কিছুটা ইতস্ততঃ করলেন। এতে মালিক আশতার তলোয়ার উঁচিয়ে ধরে বললো, বায়আত করুন নইলে এখনি দেহ থেকে মাথা পৃথক করে ফেলবো। অতএব তাঁরা উভয়ে বায়আত করলেন। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) কে ডাকা হলো। তিনি বললেন, অন্যেরা বায়আত করে নিলে আমি বায়আত করবো। আপনি আমার পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত থাকুন। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, তাঁকে যেতে দাও। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) কে ডাকা

www.e-ilm.weebly.com

হলো। তিনিও এই জবাব দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আপনি আপনার কোন জামিন পেশ করুন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বললেন, আমি কোন জামিন দিতে পারব না। আশতার আবার দাঁড়িয়ে গেল। বললো, তাঁকে আমার হাতে ন্যস্ত করুন। আমি এখনই তার গর্দান মেরে দেবো। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আমি তাঁর জামিন।

নেতৃস্থানীয় আনসারদের একটি বড় অংশ বায়আত করলেন না। যেমন ঃ হাসসান ইবনে ছাবিত, কাব ইবনে মালিক, মাসলামা ইবনে মাখলাদ, আবূ সাঈদ খুদরী, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, নু'মান ইবনে বাশীর, জায়েদ ইবনে ছাবিত, রাফে ইবনে খাদীজ, ফাযালা ইবনে উবায়দ, কা'ব ইবনে উজরা রাযিয়াল্লাহু আনহুম। এ ছাড়া কাদামা ইবনে মাযউন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এবং মুগীরা ইবনে শুবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমও বায়আত করতে অস্বীকার করলেন। অনেকে বিশেষ করে বনূ উমাইয়া বংশের লোকেরা শামের দিকে পালিয়ে গেল এবং বায়আত এড়িয়ে গেল। এরা যাবার সময় হযরত উছমান (রাঃ) এর রক্তমাখা জামা ও হযরত নায়েলার কর্তিত আঙ্গুল সাথে করে নিয়ে যায়। এ দুটি বস্তু দামেশক জামে মসজিদে সর্বসাধারণে সামনে প্রদর্শিত হলে ষাট হাজার উছমান (রাঃ) সমর্থকের দাড়ি অশ্রুতে ভিজে গেল এবং গোটা মসজিদ 'প্রতিশোধ' ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

খেলাফত পূর্ব অবস্থা

নাম আলী, উপনাম আ'বুল হাসান ও আবু তোরাব উপাধী হায়দার। পিতার নাম আবু তালিব, মাতার নাম ফাতিমা। তাঁর বংশ পরম্পরা এই ঃ

আলী পিতা আবু তালিব পিতা আব্দুল মুত্তালিব, পিতা হাশিম, পিতা আবদে মানাফ পিতা কুসাই পিতা কিলাব পিতা মুররা পিতা কা'ব পিতা লুআই।

তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর চাচাতো ভাই হবার গৌরব লাভ করেন এবং উভয়ে হাশেমী ছিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) মহানবী (সঃ) এর নবুওয়াত প্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্মানিত পিতার অনেক পোষ্য ছিল। তার সাহায্যার্থে মহানবী (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ

হযরত আলী (রাঃ) যখন দশ বছর বয়সে উপনীত হয়েছেন তখন মহানবী (সঃ) নবুওয়াত লাভ করেন। একদিন হযরত আলী (রাঃ) দেখলেন রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সম্মানিতা জীবনসঙ্গিনী খাদীজাতুল কুবরা আল্লাহর দরবারে

www.e-ilm.weebly.com

সিজদারত রয়েছেন। উভয়ে নামাজ সেরে নিলে হযরত আলী (রাঃ) শিশুসুলভ ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা দুজনে একি করছিলেন? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমরা এক অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনা করছিলাম। আমি তোমাকেও এর পরামর্শ দিচ্ছি এবং লাত ও উযযার সামনে মাথা নত করতে নিষেধ করছি। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আমি এ বিষয় ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি। আমি আমার পিতার নিকট জিজ্ঞেস করে আপনাকে জবাব দেবো।

রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আলী, এখন কারো সাথে এ বিষয়ে আলাপ করবার প্রয়োজন নেই। তুমি ইতস্ততঃ করলে নিজে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নাও। হযরত আলী (রাঃ) সারারাত ধরে চিন্তা ভাবনা করলেন এবং পরবর্তী দিন সকালে মহানবী (সঃ) এর নিকটে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হিজরত

তেরো বছর যাবত মহানবী (সঃ) মক্কায় ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু এমন সৌভাগ্যবান আত্মা খুব কম ছিলেন যারা এ আলো গ্রহণ করেন। কুরাইশরা এ আলো গ্রহণ করতে শুধু অস্বীকারই করলো না বরং তা নিভিয়ে দিতে চাইলো। আবূ জেহেলের রায় মোতাবেক বিভিন্ন গোত্রের বিশিষ্ট যুবকরা রসূলুল্লাহ (সঃ) কে শহীদ করে দেবার জন্য আদিষ্ট হলো। আল্লাহ তাআলা নিজ নবীকে কাফেরদের এ ইচ্ছার কথা অবহিত করেন এবং তাঁকে মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যেতে আদেশ করেন।

যে রাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় রওয়ানা হচ্ছিলেন, কুরাইশ যুবকেরা তখন উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে নবীগৃহের চারদিকে টহল দিচ্ছিল এবং তাঁর চলাচল পর্যবেক্ষণ করছিল। মহানবী (সঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে নিজ বিছানায় শুইয়ে দিলেন এবং সূরা ইয়াসীনের আয়াত–

'আমি তাদের সামনে ও পিছনে আড়াল ফেলে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে দিলাম। এখন তারা দেখতে পায় না।' '(ইয়াসীন ৯)

পাঠ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। কুরাইশ যুবকেরা মনে করছিল যে, তিনিই (সঃ) বিছানায় শুয়ে আছে। তারা অপেক্ষায় ছিল যে, যখন তিনি বের হবেন, তখন আঘাত করা হবে। সকালে যখন মহানবী (সঃ) এর পরিবর্তে হযরত আলী (রাঃ) বিছানা থেকে উঠলেন, তখন কাফেরদের অস্থিরতার সীমা রইলো না। তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে হযরত আলী (রাঃ) কে প্রশ্ন করলো, মুহাম্মদ কোথায়? হযরত আলী (রাঃ) অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। কাফেররা বুঝে ফেললো যে, মুহাম্মাদ (সঃ) তাদের চোখে ধুলি দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন এবং তাদের আঘাত ফাঁকা পড়েছে।

www.e-ilm.weebly.com

রসূলুল্লাহ (সঃ) রওয়ানা হবার পর হযরত আলী (রাঃ) দু তিন দিন মক্কায় রইলেন। রসূলে আকরাম (স) এর নিকট যাদের আমানত ছিল তিনি তাদের নিকট সেগুলো পৌঁছে দিলেন। এ কাজ সেরে তিনি মদীনায় রওয়ানা হলেন।

বৈবাহিক সম্পর্ক

হিজরতের দ্বিতীয় বছরে হযরত আলী (রাঃ) মহানী (সঃ) এর জামাতা হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) মহানবী (স) এর চতুর্থ কন্যা ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ) তার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু মহানবী (সঃ) বয়সের দিক খেয়াল করে হযরত আলী (রাঃ) এর আবেদনই মঞ্জুর করেন। হযরত আলী (রাঃ) এর দাম্পত্য জীবন যদিও অভাবী ছিল, তথাপি ভালবাসা ও অকৃত্রিমতার সম্পদের কোন অভাব ছিল না। হযরত ফাতিমা যুহরা (রাঃ) এর জীবদ্দশায় তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেননি।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ

হযরত আলী (রাঃ) তাবুক যুদ্ধ ব্যতীত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং হায়দারী জুলফিকার-এর নৈপুন্য প্রদর্শন করেন। ২য় হিজরীতে বদর প্রান্তরে কুফর ও ইসলামের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আরব নিয়ম অনুসারে কুরাইশ কাতার থেকে তিন বীর মোকাবেলার জন্য বের হলো। ইসলামী দল থেকেও তিনজন আনসার মোকাবেলার জন্য ময়দানে বের হলেন। কিন্তু কুরাইশরা বললো, আমরা আনসারদের সাথে মোকাবেলা করা পছন্দ করি না। আমাদের মোকাবেলা কুরাইশ যুবকদের সাথেই হবে যারা আমাদের সমকক্ষ। এতে রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হামজা (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত উবায়দা (রাঃ) কে ময়দানে পাঠালেন।

হযরত হামজা নিজ প্রতিপক্ষ উতবাকে হত্যা করলেন। হযরত আলী (রাঃ) অলীদকে তলোয়ারে ন্যস্ত করলেন। কিন্তু উবায়দা (রাঃ) শায়বার তলোয়ারের আঘাতে আহত হলেন। এ দেখে হযরত আলী (রাঃ) (রাঃ) দ্রুত হযরত উবায়দা (রাঃ) এর সাহায্যে এগিয়ে এলেন এবং প্রতিপক্ষকে তার চিরস্থায়ী ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেন।

৩য় হিজরীতে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে কতিপয় মুসলমানের ইজতিহাদী ভুলের কারণে বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়। এ যুদ্ধে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, মহানবী (সঃ) শহীদ হয়ে গিয়েছেন–এ কারণে বড় বড় জানবাজ মুসলমানের মনোবল দমে গেল। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন সেই জীবনোৎসর্গী পুরুষদের অন্যতম যাঁরা এমত পরিস্থিতিতেও দৃঢ় ও অবিচল ছিলেন।

www.e-ilm.weebly.com

জনৈক কাফের আবু আমের একটি গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পবিত্র পা তাতে গিয়ে পড়ে এবং তিনি তাতে পড়ে গেলেন। হযরত আলী (রাঃ) মহানবী (সঃ) এর হাত ধরেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত তালহা (রাঃ) তাঁকে ভর দিয়ে উঠিয়ে আনেন। তখন জানা গেল যে, তিনি (সঃ) জীবিত ও নিরাপদ আছেন। একদল জীবনোৎসর্গী তাঁকে বেষ্টন করে পাহাড়ে নিয়ে গেলেন। এ যুদ্ধে মহানবী (সঃ) এর ঠোঁট ও চেহারায় জখম হয় এবং একটি দাঁতও শহীদ হয়। হযরত আলী (রাঃ) নিজ ঢাল ভরে ভরে পানি আনতে লাগলেন এবং হযরত ফাতিমা (রাঃ) জখম ধুয়ে ওষুধ পট্টি লাগালেন। উহুদ যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) এর শরীরে ১৭ স্থানে জখম হয়।

৫ম হিজরীতে মদীনার আশে পাশের অধিবাসী য়াহুদদের চক্রান্তে কুরাইশ কাফেররা এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মদীনা মুনাওওরা ঘিরে ফেলে। রসূলুল্লাহ (সঃ)শহর রক্ষার জন্য পরিখা খনন করালেন এবং বিভিন্ন স্থানে সাহাবাদের এজন্য মোতায়েন করেন যে, তাঁরা কাফেরদেরকে ভিতরে ঢুকবার সুযোগ দেবেন না। এ যুদ্ধেও হযরত আলী (রাঃ) হায়দারী তলোয়ারের নৈপুন্য প্রদর্শন করেন।

পরিখার যুদ্ধে সফলতার পর মহানবী (সঃ) য়াহুদদের দুষ্কর্মের প্রতি কারো মনোবিনেশ করলেন। এরা ছিল ঘরের সাঁপস্বরূপ। প্রথমে তিনি বানু কুরায়যার বিরুদ্ধে সেনা অভিযান চালালেন। এ সময়ে ইসলামী পতাকা হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট ন্যস্ত করা হয় এবং তাঁকেই অগ্রবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। তিনি বনু কুরায়যার দুর্গ ঘিরে ফেলে তা আয়ত্ত করে ফেলেন এবং দুর্গের আঙিনায় নামাজ আদায় করেন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে জানা গেল যে, বনু সা'দ খায়বরের য়াহুদদের সাহায্যের জন্য সমবেত হচ্ছে। মহানবী (সঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে তাদের শায়েস্তা করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এ অভিযান সুষ্ঠুভাবে সফল হয়।

৭ম হিজরীতে মহানবী (স) খায়বরের য়াহুদদের উপর আক্রমণের ইচ্ছা করলেন। তারা মদীনার মুনাফিকদের সহায়তায় মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করছিল। মহানবী (সঃ) দুইশো মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে খায়বর পৌঁছুলেন। খায়বরের য়াহুদরা এখানে বড় বড় মজবুত কিল্লা তৈরি করে রেখেছিল। এগুলো জয় করা সহজসাধ্য ছিল না। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় দুর্গ ছিল কামুস। এতে য়াহুদদের প্রসিদ্ধ বীর মুরাহহাব থাকতো। কতিপয় বড় বড় সাহাবী এ কামুস দুর্গ জয় করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। তখন তিনি (সঃ) বললেন, 'আগামী কাল আমি সে ব্যক্তিকে পতাকা দান করবো যে আল্লাহ ও রসূলের প্রিয় এবং আল্লাহ ও রসূল যার প্রিয়। আল্লাহ তাআলা তার হাতে এ অভিযানের সাফল্য দান

www.e-ilm.weebly.com

করবেন।' পরবর্তী দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে ডাকলেন এবং তাঁকে পতাকা দান করলেন। হযরত আলী (রাঃ) আশ্চর্যজনক বীরত্বের সাথে মুরাহহাব ও তার ভাইকে রক্তমাটিতে আছাড় দিলেন এবং ইসলামী পতাকা কিল্লার উপর উড্ডীন করলেন।

৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় ও অতঃপর হুনায়নের যুদ্ধেও হযরত আলী (রাঃ) অগ্রে অগ্রে ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময়ে ইসলামী পতাকা তাঁর হাতে ছিল এবং হুনায়নের যুদ্ধে তিনি ছিলেন সেসকল অবিচল সাহাবার অন্যতম যাঁদের তলোয়ারের আগা যুদ্ধময়দানের ছবি ওলট পালট হওয়া থেকে রক্ষা করে।

৯ম হিজরীতে শামের খৃষ্টান রাজার আক্রমণের সংবাদ শুনে মহানবী (সঃ) তাবুক গমনের ইচ্ছা করেন। যেহেতু মদীনা আক্রমণের আশংকা ছিল, সে কারণে মহানবী (সঃ) নিজ পরিবারবর্গের হেফাজতের জন্য হযরত আলী (রাঃ) কে মদীনায় রেখে যান। মুনাফিকরা হযরত আলী (রাঃ) কে এই বলে খোঁচা দিতে লাগলো যে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে এ যুদ্ধে শরীক করতে পছন্দ করেননি। এর পরিপ্রেক্ষিতে মহানবী (সঃ) তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন যে, হে আলী, তোমার নিকট কি এটি পছন্দনীয় নয় যে, আমার নিকট তোমার মর্যাদা মুসা (আঃ) এর নিকট হারুন (আঃ) এর ন্যায়।

বারাআতের ঘোষণা

৯ম হিজরীতে মুসলমানদের পরিচালনায় প্রথম হজ্জ পালিত হয়। রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) কে আমীরে হজ্জ করে পাঠিয়ে দেন। অতঃপর সূরা বারাআত (তওবা) নাযিল হয়। এতে মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি রহিত করণের ঘোষণা ছিল। আরবের নিয়ম অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কোন নিকটজনই তাঁর পক্ষে এ ধরনের ঘোষণা শোনাতে পারতেন। মহানবী (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে নির্বাচন করেন এবং নিজ উটনী কাসওয়ায় আরোহণ করিয়ে তাঁকে মক্কায় পাঠিয়ে দেন। হযরত আলী (রাঃ) জামরার নিকটে সূরা বারাআতের আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনালেন এবং ঘোষণা করে দিলেন যে, ভবিষ্যতে কোন মুশরিক কাবা শরীফের হজ্জ করতে পারবে না।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

হযরত আলী (রাঃ) যেহেতু রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পরিবারেরই একজন সদস্য ছিলেন এবং নবুওয়াত পাঠশালায়ই তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ হয়েছিল, সেকারণে শিক্ষাগত যোগ্যতায় তিনি অতি উচ্চ স্তরের ছিলেন। মহানবী (সঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেন–"আমি জ্ঞানের শহর, আর আলী তার দরজা।"

www.e-ilm.weebly.com

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কোন শরয়ী বিষয় আমরা হযরত আলী (রাঃ) এর মাধ্যমে অবগত হলে অন্য কারো নিকট সে বিষয়ে প্রশ্ন করার প্রয়োজন থাকে না।

মহানবী (সঃ) এর সময়ে তিনি অহীর লিপিকার ও ফরমান লেখক ছিলেন। হুদায়বিয়ার প্রসিদ্ধ চুক্তিপত্র তাঁরই কলমে লেখা হয়েছিল। য়ামানে ইসলামের প্রসার ঘটলে মহানবী (সঃ) তাঁকে সেখানকার কাজী নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার সাথে পালন করেন। তিন খলীফার সময়েও তাঁর ইলমী সূক্ষ্ম জ্ঞান অনেক বিভ্রাটপূর্ণ বিধান ও বিচারের সঠিক ফয়সালা দানে সাহায্য করেছিল। হযরত উমর (রাঃ) বলতেন, আমাদের মধ্যে মোকদ্দমা সমূহের সবচেয়ে সুন্দর ফয়সালাকারী হচ্ছেন আলী (রাঃ)।

হযরত আলী (রাঃ) আশারা মুবাশশারা (বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন)–এর অন্যতম। হযরত উমর (রাঃ) এর প্রস্তাবিত পরামর্শ কমিটিরও তিনি সদস্য ছিলেন। বায়তুল মুকাদ্দাস যাত্রার প্রাক্কালে হযরত উমর (রাঃ) তাঁকেই নিজ স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন।

খেলাফতের ভাষণ

বায়আতের পর তিনি এক সারগর্ভ খুতবা দান করলেন। এতে তিনি মুসলমানদের ঐক্য ও সম্প্রীতির উপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর খুতবার কতিপয় বাক্য নিম্নরূপ ঃ

'আল্লাহ তাআলা হারামভূমিকে সম্মানিত করেছেন। মুসলমানদের ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মুসলমান সেই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অপর মুসলমানেরা নিরাপদ থাকে। শুধুমাত্র তখন ব্যতীত যখন কোন শরীয়ত নির্ধারিত দণ্ড সাব্যস্ত হয়ে যায়। আল্লাহর বান্দাদের সাথে আচরণের বেলায় আল্লাহকে ভয় করবে। কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে মাটি ও পশুর সাথে আচরণের বিষয়েও প্রশ্ন করা হবে (মানুষের কথা তো উল্লেখ করা হয়েছেই)। আল্লাহর ইবনেদাত করবে, তাঁর বিধানসমূহ থেকে মুখ ফিরাবে না, সৎকাজ করবে।'

প্রতিশোধ দাবী

খুতবার পরে হযরত তালহা (রাঃ) ওযুবায়র (রাঃ)সহ সাহাবায়ে কেরামের একটি দল হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট এলেন এবং বললেন, 'আপনি খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। এখন আপনার প্রথম কাজ হবে শরীয়তের দণ্ড প্রয়োগ করা। আমরাও এ শর্তেই আপনার হাতে বায়আত করেছি।' হযরত আলী (রাঃ)

www.e-ilm.weebly.com

বললেন, আমি উছমান (রাঃ) এর রক্ত বৃথা যেতে দেবো না। কিন্তু এখনও তার সময় আসেনি। আপনারা দেখছেন যে, আমি দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছি। মদীনাতে তাদেরই প্রাধান্য বজায় রয়েছে। খেলাফতের বিষয়ও এখনও সুস্থিতিশীল হয়নি। আপনারা অপেক্ষা করুন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলে আমি অবশ্যই এ দায়িত্ব সম্পন্ন করবো।

হযরত আলী (রাঃ) এ উত্তর শুনে লোকেরা বিভিন্ন রূপ ধারণা প্রকাশ করতে লাগলো। কেউ কেউ বলতে লাগলো, হযরত আলী (রাঃ) এর কথা সঠিক। প্রতিশোধের জন্য এখনও অপেক্ষা করা প্রয়োজন। কেউ কেউ বলতে লাগলো, হযরত আলী (রাঃ) প্রতিশোধের বিষয় এড়িয়ে যাচ্ছেন। তিনি যদি এ দায়িত্ব সম্পন্ন না করেন, তাহলে আমরাই তা সম্পন্ন করবো। অন্যদিকে দুষ্কৃতিকারীরা চিন্তা করলো যে, আলী (রাঃ) এর নিশ্চিন্ত হয়ে শ্বাস ফেলার সুযোগ পেলে আমাদের আর কল্যাণ নেই। অতএব এরূপ পরবেশ যাতে সৃষ্টি না হয়, সে চেষ্টা করতে হবে।

আঞ্চলিক শাসকদের অপসারণ

হযরত আলী (রাঃ) খেলাফতের নিয়ন্ত্রণভার হাতে নিয়েই সর্বপ্রথম কাজ এই করলেন যে, তিনি হযরত উছমান (রাঃ) এর সময়কার সকল আঞ্চলিক শাসকদের অপসারণ করলেন এবং তাদের পরিবর্তে নতুন শাসকদের নাম ঘোষণা করলেন। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (যারা হযরত আলী (রাঃ) এর হিতাকাংখী ছিলেন) হযরত আলী (রাঃ)কে আপত্তি জানালেন এবং বললেন, আপনি শাসকদের অপসারণে তাড়াহুড়া করবেন না। এক্ষুণি আপনি তাঁদেরকে বায়আতের জন্য লিখুন। তাঁরা যখন বায়আত করে সারবেন এবং খেলাফতের বিষয় সুস্থিতিশীল হয়ে যাবে, তখন আপনি তাঁদের অপসারণ করতে পারবেন। আপনি যদি এখনই তাঁদেরকে অপসারিত করেন, তাহলে তাঁরা আপনার খেলাফতকেই মেনে নিতে অস্বীকার করবেন এবং উছমান (রাঃ) এর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার অজুহাতে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। হযরত আলী (রাঃ) এ যুক্তিসংগত মতটি নাকচ করে দিলেন। মুগীরা ইবনে শুবা (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে মক্কায় চলে গেলেন।

হযরত আলী (রাঃ) উছমান ইবনে হানীফকে বসরার, উমারা ইবনে শিহাবকে কূফার, উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে য়ামানের, কায়স ইবনে সা'দকে মিসরের এবং সাহল ইবনে হানীফকে শামের প্রশাসক নিযুক্ত করেন এবং নিযুক্তিনামা দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রদেশসমূহে তাঁদেরকে পাঠিয়ে দিলেন।

www.e-ilm.weebly.com

সাহল (শামের নতুন ওয়ালী) তাবুক পৌঁছুলে আমীর মুআবিয়া (রাঃ) এর সৈন্যরা তাকে বাঁধা দান করলো। সাহল বললেন, আমি শামের নতুন আমেল। সৈন্যরা জবাব দিল, আপনাকে যদি উছমান (রাঃ) পাঠিয়ে থাকে তাহলে ভালো, নইলে উত্তম হবে এই যে, আপনি সোজা ফিরে যান। সাহল মদীনা ফিরে এলেন। কায়স ইবনে সা'দ মিসরে পৌঁছুলে সেখানে তিন দল হয়ে গেল। একদল তাঁকে আমীর মেনে নিল। দ্বিতীয় দল বললো, হযরত আলী (রাঃ) যদি উছমান (রাঃ) এর হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন, তাহলে আমরা তাঁর সাথে আছি। তৃতীয় দল বললো, আলী (রাঃ) যদি উছমান (রাঃ) এর হত্যাকারীদের, যারা আমাদের প্রিয়পাত্র, থেকে প্রতিশোধ না নেন, তাহলে আমরা তাঁর পক্ষে রয়েছি। উছমান ইবনে হানীফ বসরায় পৌঁছুলে সেখানেও মিসরের ন্যায় দু দল হয়ে গেল। উমারা ইবনে শিহাব কূফার পথে থাকতেই তালহা ইবনে খুওয়লিদ আসাদীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। সে বললো, কূফাবাসী আবু মূসা আশআরী ব্যতীত কাউকে আমীর মেনে নেবে না। উত্তম হবে এই যে, আপনি মদীনায় ফিরে যান। নইলে এখনই আমি আপনার শরীর থেকে শির পৃথক করে ফেলবো। উমারা ফিরে এলেন।

উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস য়ামানে পৌঁছে সেখানকার কর্তৃত্বভার নিজ হাতে নিলেন। পূর্বতন আমীর য়া'লা বায়তুল মালের যাবতীয় অর্থ নিয়ে তাঁর আগমনের পূর্বেই মক্কায় চলে গিয়েছিলেন।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর পক্ষ থেকে হযরত আলী (রাঃ) এর নামে পত্র

হযরত আলী (রাঃ) মা'বাদ আসলামীর হাতে হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) এর নামে এক পত্র লিখলেন। জবাবে হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) লিখলেন, কূফাবাসী আমার হাতে আপনার হন্য বায়আত করেছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। হযরত আলী (রাঃ) আরেকটি পত্র হাজ্জাজ ইবনে গাযয়্যার হাতে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর নামে পাঠালেন। তাতে লেখা ছিল আপনি বায়আত করুন নইলে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হোন।

আমীর মুআবিয়া (রাঃ) এর বনূ আস গোত্রের এর দুঃসাহসী ও মুর্খ ব্যক্তির মারফতে হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট তাঁর পত্রে জবাব পাঠালেন। হযরত আলী (রাঃ) আমীর মুআবিয়া (রাঃ) এর পত্র খুলে দেখলেন তাতে শুধু 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখা ছিল। পত্রের বাকী অংশ ছিল শূন্য। খামের উপর লেখা ছিল 'মুআবিয়ার পক্ষ থেকে আলীর নামে।" হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট এসময়ে কতপিয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও বসে ছিলেন। তাঁরা এ

www.e-ilm.weebly.com

রসিকতায় ক্রুদ্ধ হলেন এবং আবাসী বার্তাবাহককে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কি কাজ? আবাসী অতি সাহসিকতার সাথে জবাব দিল ঃ

মহোদয়গণ, আমি শামে পঞ্চাশ হাজার প্রবীণকে এমত অবস্থায় রেখে এসেছি যে, তাদের দাড়ি অশ্রুতে ভেজা। তাঁরা হযরত উছমান (রাঃ) এর রক্তমাখা জামা বর্শাবিদ্ধ করে রেখেছেন এবং শপথ করেছেন যে, উছমান (রাঃ) এর হত্যাকারীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাঁদের তলোয়ার কোষহীন থাকবে। জবাবে খালেদ ইবনে যুফার আবাসী দাঁড়িয়ে গিয়ে বলতে লাগলো, হে দূত, শাম কি মুহাজির ও আনসারদেরকে শামবাহিনীর ভয় দেখাতে চায়? আল্লাহ শপথ, উছমান (রাঃ) এর জামা ইউসুফ (আঃ) এর জামা নয়, মুআবিয়া (রাঃ) এর দুঃখ ইয়াকুব (আঃ) এর দুঃখ নয়। শামে তাঁর শোক প্রকাশকরা থাকলে ইরাকে তাঁর অবজ্ঞাকারীরাও রয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) আবাসী ব্যক্তির মুখে এ অভিযোগ শুনে বললেন, হে আল্লাহ, তুমি ভালই জানো যে, আমি উছমান (রাঃ) এর হত্যা থেকে পবিত্র। আল্লাহর শপথ, উছমানের হত্যাকারীরা তো বেঁচে চলে গিয়েছে।'

আবাসী দূত শাম ফিরে যাবার সময় হযরত আলী (রাঃ) এর সমর্থকরা তাকে মেরে ফেলতে চাইলো। কিন্তু মদীনাবাসীদের মধ্য থেকে তার স্বগোত্রীয়রা তার জীবন রক্ষা করে।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর এ জবাবে হযরত আলী (রাঃ) এর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, ব্যাপারটি সহজে মিটবে না। সেমতে তিনি আমীর মুআবিয়া (রাঃ) এর সাথে মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করলেন। হযরত হাসান (রাঃ) পিতাকে লড়াই এড়াতে ও খেলাফতের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) তা গ্রহণ করলেন না। (আখবারুত তিওয়াল ১৪৪)

হযরত আয়েশা (রাঃ) এর প্রস্তুতি

হযরত উছমান গনী (রাঃ) যখন শহীদ হন, তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হজ্জব্রত পালন উপলক্ষে মক্কায় অবস্থান করছিলেন। হজ্জ সেরে তিনি মদীনা ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে এ মর্মান্তিক ঘটনার সংবাদ পেলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) মক্কায় ফিরে এলেন এবং এখানে এক সাধারণ সমাবেশে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সারাংশ ছিল ঃ

'হে লোকসকল, বিভিন্ন এলাকার লম্পটরা মদীনার গোলামদের সহযোগিতায় উছমান (রাঃ) কে শহীদ করেছে। তাদের এ কর্ম নেহায়েত অন্যায়। দুষ্কৃতিকারীরা উছমান (রাঃ) এর বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ আরোপ করে। কিন্তু সেগুলো প্রমাণ করতে না পেরে তারা বিদ্রোহ ছড়ায়। যে রক্ত আল্লাহ তাআলা

www.e-ilm.weebly.com

তাআলা সম্মানিত করেছেন, তা তারা প্রবাহিত করেছে, সম্মানিত শহরে প্রবাহিত করেছে, সম্মানিত মাসে (যিলহজ্জ মাসে) প্রবাহিত করেছে। অতঃপর যে সম্পদে তাদের হাত লাগানো হারাম ছিল, তা তারা লুট করেছে। আল্লাহর শপথ, উছমান (রাঃ) এর একটি আঙ্গুল দুষ্কৃতিকারীদের এক দুনিয়া থেকে অধিক সম্মানিত।'

মক্কার শাসক আব্দুল্লাহ ইবনে হাযরামী এ বক্তৃতা শুনে বললেন, 'সর্বপ্রথমে মাজলুম খলীফার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে আমি আপনার সাহায্যকারী হবো।' বসরায় পূর্বতন ওয়ালী আব্দুল্লাহ ইবনে আমের এবং য়ামানের ওয়ালী য়া'লা ইবনে মুনাব্বিহও মক্কা মুয়াজ্জামায় এসে গেলেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) এর দলে যোগ দিলেন। বনু উমাইয়ার কিছুসংখ্যক লোক মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কায় চলে এসেছিল। এরাও হযরত আয়েশার পতাকার নীচে একত্রিত হলো। এদের মধ্যে সাঈদ ইবনে আস, অলীদ ইবনে উকবা এবং মারওয়ান ইবনুল হাকামও অন্তভুক্ত ছিলেন। হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যুবায়ের (রাঃ)ও মদীনা থেকে মক্কায় চলে এলেন। তাদের জবানীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) মদীনার সর্বশেষ পরিস্থিতি অবগত হলেন এবং তাঁর প্রতিশোধস্পৃহায় অধিকতর প্রাবল্য সৃষ্টি হলো। তাঁরাই হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বসরায় গিয়ে অর্থনৈতিক ও সেনা সাহায্য সংগ্রহের পরামর্শ দিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) এর প্রভাব ও গুরুত্বের কারণে মক্কা মুয়াজ্জামার দেড় হাজার ব্যক্তি তাঁর নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির পর এ বাহিনী বসরা অভিমুখে রওয়ানা হলো। পথিমধ্যে যারা জানতে পেল যে, উম্মুল মুমিনীন মজলুম খলীফার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন, তারাও এতে শামিল হতে লাগলো। অতএব, এ সংখ্যা অতি শীঘ্র তিন হাজারে উন্নীত হলো। এ সময়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)ও মক্কায় অবস্থান করছিলেন। কেউ কেউ তাঁকেও এতে অংশগ্রহণের আবেদন জানালেন। কিন্তু তিনি তা মঞ্জুর করলেন না। বরং নিজ বোন উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রাঃ)কেও বাঁধা দিয়ে রাখলেন।

বসরার পথে হযরত আয়েশা (রাঃ)

এ বাহিনী বসরার নিকটবর্তী হলে হযরত আয়েশা (রাঃ) বসরার ওয়ালী উছমান ইবনে হানীফের নিকট নিজের আগমনের সংবাদ দিলেন। উছমান ছিলেন হযরত আলী (রাঃ) এর নিযুক্ত ওয়ালী। তিনি ইমরান ইবনে হুসাইন ও আবুল আসওয়াদ দুয়িলী এ দুজনকে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নিকট প্রেরণ করেন, তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জানার জন্য। ইমরান ও আবুল আসওয়াদ হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

www.e-ilm.weebly.com

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার আগমনের উদ্দেশ্য এই যে, দুষ্কৃতিকারীরা নবীর হারাম (সম্মানিত) ভুমিতে উছমান (রাঃ) এর রক্ত প্রবাহিত করে যে ফিতনা বিস্তৃত করেছে সে সম্পর্কে আমি মুসলমানদের অবহিত করবো এবং এ বিবাদ নিরসন যে তাদের দায়িত্ব, সে সম্পর্কে তাদের সচেতন করবো।'

অতঃপর দূত দুজন হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যুবায়ের (রাঃ) এর নিকট গেলেন এবং তাঁদের নিকটও একই প্রশ্ন করলেন। তাঁরা বললেন, আমরা উছমান (রাঃ) এর অন্যায় হত্যার প্রতিশোধ নিতে বের হয়েছি।

দুতেরা প্রশ্ন করলেন- আপনারা দুজনে কি হযরত আলী (রাঃ) এর হাতে বায়আত করেননি? তাঁরা উত্তর দিলেন– 'তবে আমাদের নিকট থেকে তলোয়ারের জোরে বায়আত গ্রহণ করা হয়েছে। তথাপি আমরা এ বায়আত ভঙ্গ করতাম না যদি আলী (রাঃ) উছমান হত্যাকারীদের থেকে প্রতিশোধ নিতেন বা আমাদেরকে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে দিতেন।' এ সকল আলাপ আলোচনার পর দূত দুজনে উছমান ইবনে হানীফের নিকট গেলেন এবং তাঁকে সকল পরিস্থিতি অবহিত করেন। উছমান ইবনে হানীফ দৃঢ় সংকল্প করলেন যে, হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট থেকে সাহায্য না আসা পর্যন্ত তিনি পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিরোধ করবেন। তিনি এক সমাবেশের আয়োজন করলেন যাতে বসরাবাসীকে প্রতিরোধে উৎসাহিত করা যায়। এ সমাবেশে জনৈক কায়স বক্তৃতার মাঝে বললো–

ভাইয়েরা! তালহা, যুবায়র ও তাঁদের সাথীরা যদি মক্কা থেকে জীবন রক্ষার জন্য বসরায় এসে থাকেন তাহলে তা ভুল। কেননা মক্কায় তো কোন প্রাণীকে কষ্ট দেয়া হয় না। আর যদি উছমান (রাঃ) হত্যার প্রতিশোধ নিতে এসে থাকেন, তাহলে, আমরা তো উছমান (রাঃ)এর হত্যাকারী নই। অতএব তাঁদেরকে মোকাবেলা করে ফিরিয়ে দাও।' এ বক্তৃতা শুনে আসওয়াদ ইবনে সারী দাঁড়িয়ে গেল এবং বললো, এ দুটোর কোনটিই নয়। তাঁরা এসেছেন এ জন্য যে, উছমান (রাঃ) হত্যাকারীদের মোকাবেলায় তারা আমাদের নিকটজন হোন বা না হোন, আমাদেরকে নিজেদের সাহায্যকারী করে নেবেন।'

সমাবেশে এ অনুকূল প্রতিকূল মত প্রকাশের দ্বারা উছমান ইবনে হানীফের অনুমান হয়ে গেল যে, বসরায় হযরত তালহা (রাঃ) ও যুবায়ের (রাঃ)-এর সাহায্যকারীও যথেষ্ট রয়েছে। তবুও যেভাবেই হোক উছমান ইবনে হানীফ নিজ সাথীদের নিয়ে বসরা থেকে বের হয়ে মারবাদ নামক স্থনের বাম দিকে অবস্থান গ্রহণ করলেন। এদিক হযরত আয়েশা (রাঃ) সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং মারবাদের ডান দিকে ছাউনি ফেললেন।

www.e-ilm.weebly.com

মোকাবেলা ও সন্ধি

দুপক্ষের সৈন্যরা যখন সামনাসামনি কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালো, তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বাহিনীর ডানপক্ষের অধিনায়ক হযরত তালহা (রাঃ) এবং বামপক্ষের অধিনায়ক হযরত যুবায়র (রাঃ) অগ্রসর হলেন এবং নিজ সাথীদের সম্বোধন করে হযরত উছমান (রাঃ) এর মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন এবং তাঁর অন্যায় হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উৎসাহ দিলেন। অতঃপর হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বয়ং বক্তৃতা করতে শুরু করলেন। তিনি হযরত উছমান (রাঃ) এর নিরপরাধ হওয়ার কথা এবং দুষ্কৃতিকারীদের অন্যায় ও অত্যাচারের কথা বর্ণনা করলেন এবং তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করাকে দ্বীনি দায়িত্ব হিসেবে সাব্যস্ত করলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বক্তৃতায় এমনই প্রতিক্রিয়া হলো যে, বিপক্ষদলের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক যুবক তাঁর সাথে এসে যোগ দিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) মনে করলেন যে, হয়ত উপদেশ নসিহতের মাধ্যমে কার্যোদ্ধার হয়ে যাবে। এই ভেবে তিনি নিজের লোকদের ডেকে ফিরিয়ে নিলেন এবং লড়াই বন্ধ রাখলেন। কিন্তু হাকীম ইবনে জাবালা, যে বসরায় আবদুল্লাহ ইবনে সাবার এজেন্ট ছিল, সে একদল সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলো এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বাহিনীর উপর আক্রমণ করলো। হযরত আয়েশা (রাঃ) নির্দেশ দিলেন যে, শুধুমাত্র প্রতিরোধ করা হোক। কিছুক্ষণ যাবত লড়াই অব্যাহত রইলো। অবশেষে রাতের অন্ধকার তলোয়ারের ঝমকানির উপর আবরণ ফেলে দিল।

দ্বিতীয় দিন হাকীম ইবনে জাবালা ও উছমান ইবনে হানীফ উভয়ে লড়াইয়ের জন্য বের হল। অন্য পক্ষ থেকেও প্রতিরোধ হলো। দিন গড়িয়ে গেলে উছমান এ শর্তে সন্ধি করলেন যে, জেনে নেয়া যাক, তালহা ও যুবায়ের বাধ্য হয়ে বায়আত করেছেন না সন্তুষ্টচিত্তে করেছেন। যদি বাধ্য হয়ে বায়আত করেছেন বলে প্রমাণিত হয়, উছমান তাহলে তালহা ও যুবায়রের হাতে বসরা তুলে দিবেন, আর যদি সন্তুষ্টচিত্তে প্রমাণিত হয়, তাঁরা দুজন ফিরে চলে যাবেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বসরা আয়ত্ত

বসরার কাযী কা'ব ইবনে ছওরকে প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য মদীনা মুনাওরায় পাঠানো হলো। তিনি মসজিদে নববীতে জুমআর দিন মদীনাবাসীকে প্রশ্ন করলেন- হযরত তালহা (রাঃ) ও যুবায়র (রাঃ) সন্তুষ্টচিত্তে বায়আত করেছেন না বাধ্য হয়ে? উসামা ইবনে যায়দ (রাঃ) জবাব দিলেন, আল্লাহর শপথ, বাধ্য করে বায়আত নেয়া হয়েছে। মদীনার ওয়ালী সাহল ইবনে হানীফ, যিনি ছিলেন উছমান ইবনে হানীফের ভাই, এ জবাবের কারণে হযরত উসামা (রাঃ) এর সাথে রূঢ় আচরণ করলেন। হযরত আলী (রাঃ) ও ঘটনার খবর পেলেন। তিনি উছমান ইবনে হানীফের নিকট লিখলেন, 'তালহা (রাঃ) ও যুবায়র

www.e-ilm.weebly.com

(রাঃ) এর প্রতি বলপ্রয়োগ করা হলেও তা মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য করা হয়েছে, বিভক্ত করার জন্য নয়। যদি তাঁদের বায়আত ভঙ্গ করার ইচ্ছা হয়, তাহলে তাঁদের কোন অজুহাত শোনা যাবে না। আঁর অন্য কোন ইচ্ছা থাকলে আলাপ আলোচনা হতে পারে।'

কা'ব ইবনে ছওর বসরা পৌছুলেন এবং সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। হযরত তালহা (রাঃ) ও যুবায়র (রাঃ) সন্ধির শর্ত মোতাবেক উছমানের নিকট বসরা ছেড়ে দেবার দাবী করলেন। উছমান ইবনে হানীফের নিকট হযরত আলীর (রাঃ) পত্র পৌছে গিয়েছিল। এতে মোকাবেলা করার পরামর্শ ছিল। সে কারণে তিনি শর্ত পূরণে অস্বীকার করলেন। এখন লড়াই ব্যতীত উপায় রইল না। হযরত আয়েশা (রাঃ) ও উছমান ইবনে হানীফের সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। উছমান পরাজিত ও বন্দী হলেন। হাকীম ইবনে জাবালা অনেক সাথীসহ নিহত হলো।

বসরা আয়ত্ত করার পর হযরত তালহা (রাঃ) ও যুবায়র (রাঃ) নির্দেশ দিলেন যে, বসরার যেসকল লোক হযরত উছমান (রাঃ) এর হত্যার ঘটনায় শরীক ছিল তাদেরকে বন্দী করে আনা হোক। সেমতে বিভিন্ন গোত্রের প্রচুর লোককে বন্দী করে আনা হলো। তাদের অপরাধ প্রমাণিত হলে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। কিছুসংখ্যক লোক সুযোগ পেয়ে পালিয়ে গেল। এ ঘটনা ঘটে ২৪শে রবিউস সানী হিজরী ৩৬-এ।

হযরত আলী (রাঃ) এর ইরাক সফর

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর পত্র পেয়ে হযরত আলী (রাঃ) তাঁর সাথে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বসরা রওয়ানা হবার সংবাদ পেলেন। এখন তিনি শামের উদ্দেশ্য মুলতবী করে ইরাকের উদ্দেশ্য করলেন এবং মদীনাবাসীকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানালেন।

মদীনায় যেসকল নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন তাঁদের জন্য বিষয়টি ছিল খুব জটিল। কেননা আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাঃ) এর সাথে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) এর লড়াই হতে যাচ্ছিল এবং মুসলমানদের তলোয়ার সমূহের নিজেদের মধ্যেই ঝনঝনানি শুরু হচ্ছিল। অতএব বেশ কিছু সংখ্যক আনসার ও মুহাজির খলীফার নিকটে উপস্থিত হয়ে হযরত আলী (রাঃ)-কে এ উদ্দেশ্য থেকে নিবৃত্ত রাখার চেষ্টা করেন।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমার তো শুধু সে তলোয়ার প্রয়োজন যা মুসলমান ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করবে। আপনি যদি আমাকে সেরূপ তলোয়ার দান করেন তাহলে আমি আপনার সঙ্গ দানে প্রস্তুত রয়েছি। নতুবা আমাকে ক্ষমা করুন।

www.e-ilm.weebly.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি। আমার অন্তর যা মেনে নেয়না, তাতে আমাকে বাধ্য করবেন না।

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে আদেশ করেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেরদের সাথে মোকাবেলা হবে, আমি আমার তলোয়ার কাজে লাগাবো। আর যখন মুসলমানদের সাথেমোকাবেলা হবে, তখন আমি তা উহুদের পাথরখণ্ডে আঘাত করে টুকরা টুকরা করে ফেলবো। সেমতে আমি গতকাল তা টুকরা করেছি।

উসামা ইবনে জায়দ (রাঃ) বললেন, আমাকে একাজে অংশগ্রহণ থেকে ক্ষমা করবেন। আমি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছি যে, কোন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু স্বীকারকারীর সাথে লড়াই করবো না।

আশতার নাখঈ এ সকল সাহাবায়ে কেরামের এরূপ কথাবার্তার কথা জানতে পেরে হযরত আলী (রাঃ)-কে বললো, আপনি এদেরকে বন্দী করছেন না কেন? হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আমি তাঁদের মতের বিপরীতে তাঁদেরকে বাধ্য করতে চাইনা।

যাই হোক, হযরত আলী (রাঃ) ইরাকে তাঁর যথেষ্ট সাহায্যকারী মিলতে পারে এবং সেখানকার বায়তুল মাল ধনসম্পদে পূর্ণ এ ধারণায় নিজ সিদ্ধান্তে অটল রইলেন এবং ৩৬ হিজরীর রবিউস সানী মাসের শেষ দিকে নিজ বাহিনী নিয়ে বসরা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা তার দলের সদস্যদের সহ হযরত আলী (রাঃ) এর বাহিনীতে শামিল ছিল। হযরত আলী (রাঃ) এর পরিকল্পনা ছিল, তিনি তালহা (রাঃ) যুবায়র (রাঃ)-এর পূর্বেই বসরায় প্রবেশ করবেন। কিন্তু যীকার নামক স্থানে পৌছে তিনি জানতে পেলেন যে, হযরত যুবায়র (রাঃ) ও তালহা (রাঃ) বসরা অধিকার করে ফেলেছেন। এখন তিনি সেখানেই ছাউনি ফেললেন।

কূফাবাসীর সাহায্য কামনা

বসরা সফরের সময়ে হযরত আলী (রাঃ) কূফাবাসীর সাহায্য লাভের চেষ্টা করলেন। কূফার ওয়ালী ছিলেন হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)। তিনি এ গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পছন্দ করছিলেন না। হযরত আলী (রাঃ) প্রথমে মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকর (রাঃ) ও মুহাম্মাদ ইবনে জাফারকে কূফা পাঠালেন। অতঃপর মালিক ইবনে আশতার ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু হযরত আবূ মূসা (রাঃ) ও তাঁর কারণে কূফাবাসী যুদ্ধে উৎসাহিত হলো না। অবশেষে হযরত আলী (রাঃ) হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত আম্মার ইবনে য়াসের (রাঃ)-কে কূফা পাঠালেন। এ দুজন যখন কূফা পৌছুলেন, তখন হযরত আবূ মূসা (রাঃ) কূফার জামে মসজিদে এক বিশাল জনসমাবেশে নিম্নরূপ বক্তৃতা করছিলেন ঃ

'হে কুফাবাসী, আপনারা আমার কথা মেনে নিন। এ সেই ফিতনা যা রসূলুল্লাহ (সঃ) জানিয়ে গিয়েছেন। এ ফিতনার সময়ে বসা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পরস্পর ভাই করেছেন এবং আমাদের জন্য একে অপরের রক্ত ও সম্পদ হারাম ঘোষণা করেছেন। আপনারা নিজ নিজ তলোয়ার কোষবদ্ধ করুন, বর্শার ফলা বের করে ছুঁড়ে ফেলুন, ধনুকের তার কেটে ফেলুন এবং নিজ নিজ ঘরে নির্জনে বসে থাকুন।'

হযরত আবূ মূসা (রাঃ) এর পর হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত আম্মার ইবনে য়াসের (রাঃ) মিম্বরে এলেন। তিনি হযরত আলী (রাঃ) এর খেলাফতের ন্যায্যতা, তালহা (রাঃ) যুবায়র (রাঃ) এর অঙ্গীকার ভংগ এবং সৎকাজের আদেশ অসৎকাজে নিষেধের প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন। হযরত হাসান (রাঃ) এর বক্তৃতা শুনে দুদল হয়ে গেল। কা'কা' ইবনে আমর বললেন, 'হে কূফাবাসী আমাদের আমীর আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) যা বললেন, তা তো সত্যি। তবে খেলাফত ব্যবস্থা অব্যাহত থাকাও প্রয়োজন। যদি এ ব্যবস্থা বজায় না থাকে তাহলে জালেমের প্রতিশোধ ও মজলুমের সহায়তা সম্ভব নয়। আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হয়ে গিয়েছেন। তিনি আপনাদেরকে সংশোধনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন। আপনাদের এ আহ্বান সর্বান্তকরণে কবুল করে নেয়া উচিত।'

কা'কা'র পর সাইহান ইবনে সওহান নামে কূফার জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি একই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এসব বক্তৃতায় সমাবেশের রূপ পাল্টে গেল এবং কূফার নয় হাজার যুবক হযরত আলী (রাঃ) এর সাহায্যের জন্য রওয়ানা হলো। কূফীয়রা যীকার নামক স্থানে এসে হযরত আলী (রাঃ) এর বাহিনীর সাথে মিলিত হলো। হযরত আলী (রাঃ) তাদের খুব প্রশংসা করলেন এবং বললেন, 'আমার উদ্দেশ্য এই যে, আমি সংশোধনের চেষ্টা করবো। বসরীয়রা যদি নিবৃত্ত হয় তাহলে ভালো। কিন্তু যদি তারা নিজেদের একগুঁয়েমী পরিত্যাগ না করে, তাহলেও আমি তাদের সাথে নমনীয় আচরণ করবো এবং সর্বাবস্থায় বিপর্যয়ের চেয়ে সংশোধনকে প্রাধান্য প্রদান করবো।' (ইতমাম ২১৯-২২০ ও আখবার ১৪৬)

সন্ধি প্রচেষ্টা

হযরত আলী (রাঃ) কা'কা' ইবনে আমরকে বসরায় পাঠিয়ে দিলেন যাতে সম্ভব হলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মতপার্থক্য নিরসন হয়ে যায়। কা'কা' একজন বিচক্ষণ ও সুবক্তা ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যুবায়র (রাঃ) এর নিকটে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন-আপনারা যে এ কষ্ট করলেন কি উদ্দেশ্যে?

হযরত আয়েশা (রাঃ) ও তাঁর সাথীরা বললেন, আমাদের উদ্দেশ্য মুসলমানদের মধ্যে সংশোধন আনা ও কুরআনের প্রতি আমল করা।' কা'কা

www.e-ilm.weebly.com

বলেলেন– আপনারা সেজন্য কি পন্থা নির্ধারণ করেছেন? তাঁরা বললেন, 'এই যে, উছমান হত্যাকারীদের হত্যা করা হবে। যদি উছমান (রাঃ) হত্যার প্রতিশোধ না নেয়া হয়, তাহলে কুরআন পরিত্যাগ করা হবে।' কা'কা' বললেন, উছমান (রাঃ) হত্যাকারীদের থেকে প্রতিশোধ দাবী তো সঠিক। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত খেলাফতের বিষয়টি সুদৃঢ় না হবে এবং দেশে শান্তি শৃংখলা ফিরে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ দায়িত্ব সম্পন্ন করা যাবে না। দেখুন, আপনারা বসরার দুষ্কৃতিকারীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হারকূস ইবনে যুহায়রের উপর কোন শক্তি প্রয়োগ করতে পারলেন না। আপনারা তাকে হত্যা করাতে চাইলে ছয় হাজার লোক তার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। আপনারা বাধ্য হয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন। আপনারা যদি সাময়িক কল্যাণের খাতিরে উছমান (রাঃ) হত্যাকারীদের একজনকে ছেড়ে দিতে পারলেন, তাহলে আলী (রাঃ) এর কি দোষ? এ ফিতনার দ্বাররোধ এভাবে হতে পারে যে, আপনারা সবাই আমীরুল মুমিনীনের পতাকাতলে সমবেত হোন এবং আমাদেরকে ও নিজেদেরকে বিপদে ফেলবেন না। যার ফল হবে এই যে, উভয়পক্ষ নিবৃত্ত থাকবেন। এ বিষয়টি কোন একক ব্যক্তি বা গোত্রের নয়, বরং গোটা উম্মতের কল্যাণ ও বিপর্যয়ের। আমি আশা করি আপনারা মোকাবেলা ও লড়াইয়ের চেয়ে শান্তি ও নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিবেন।'

কা'কা'য়ের এ বক্তব্যে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও তাঁর দুসাথীর উপর খুব প্রতিক্রিয়া হলো। তাঁরা বললেন, আপনার প্রস্তাব খুবই যুক্তিসংগত। কিন্তু আলী (রাঃ) এর ও কি এই মত? যদি তাঁরও এই মত হয়ে থাকে এবং তিনি উছমান (রাঃ) হত্যাকারীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে প্রস্তুত থাকেন, তাহলে এ বিষয়টি খুব সহজে নিরসন হতে পারে।'

কা'কা' ফিরে এসে হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট গেলেন এবং তাঁকে যাবতীয় কথাবার্তা শোনালেন। হযরত আলী (রাঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। কা'কা'য়ের সাথে বসরীয় কিছু লোক হযরত আলী (রাঃ) এর বাহিনীতে এলো। উদ্দেশ্য ছিল হযরত আলী (রাঃ) ও কূফীয়দের মনোভাব সম্পর্কে অবহিত হওয়া যে, তিনি মূলতঃ সন্ধির প্রতি আগ্রহী কি না। তারা শুনেছিল যে, হযরত আলী (রাঃ) বসরা জয় করে সেখানকার যুবকদের হত্যা করবেন এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদেরকে দাসরূপে ব্যবহার করবেন। এ ধরনের সংবাদ সাবাঈ গোষ্ঠীর লোকেরা প্রচার করেছিল। বসরীয়দের কাছে ডেকে নিয়ে হযরত আলী (রাঃ) এ সকল ধারণা নাকচ করে দিলেন। তাদেরকে সর্বপ্রকারের আশ্বাস দিলেন। কূফীয়দেরকেও তারা সন্ধির প্রতি আগ্রহী দেখতে পেল। এভাবে আশা করা যেতে লাগলো যে, ফিতনা ফাসাদের ধুলি নমিত হয়ে যাবে এবং সম্প্রীতি ও সৌভাগ্যের কিরণ জগতে পুনরায় চমকাতে থাকবে।

www.e-ilm.weebly.com

সাবাঈ গোষ্ঠীর চক্রান্ত

হযরত আলী (রাঃ) সন্ধি সম্পন্ন করার জন্য বসরা গমনের ইচ্ছা করলেন। রওয়ানা হবার পূর্বে তিনি এক সন্ধিমূলক বক্তৃতা প্রদান করলেন। এ বক্তৃতায় তিনি জাহিলিয়্যাতের দুর্ভাগ্য ও ইসলামের সৌভাগ্যের বিষয় আলোচনা করলেন। অতঃপর তিনি বিশেষভাবে মুসলমানদের উপর আল্লাহর সে নেয়ামতের কথা উল্লেখ করলেন যা তাদেরকে ঐক্য ও সৌহার্দ এবং সম্প্রীতি ও ভালবাসার আকারে দান করা হয়েছে। অতঃপর তিনি বর্তমান ফিতনার বিষয়ে আন্তরিক পরিতাপের কথা প্রকাশ করলেন এবং বললেন যে, এ ফিতনা সে সকল ইসলামবিদ্বেষীদের চক্রান্তের ফল যারা ইসলামের সম্মান ও প্রতাপ দেখে জ্বলছিল। তাদের কামনা মুসলমানরা আবার অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হোক। অতঃপর তিনি বললেন, আগামীকাল আমরা বসরায় রওয়ানা হবো। কিন্তু আমাদের এ সফর যুদ্ধবিগ্রহের উদ্দেশ্যে হবে না। বরং ঐক্য ও সমঝোতার উদ্দেশ্যে হবে। অতএব, যারা উছমান (রাঃ) হত্যায় কোন প্রকারে অংশগ্রহণ করেছে, তারা আমার সাথে যাবে না।

হযরত আলী (রাঃ) এর এ বক্তৃতা শুনে সাবাঈদের পায়ের নীচের মাটি সরে গেল। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ও তার উপদেষ্টারা এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলো এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হলো। তারা বললো, এতক্ষণ পর্যন্ত তো তালহা ও যুবায়রই প্রতিশোধ চাইছিলেন। এখন হযরত আলীও তাদের সমমনা মনে হচ্ছে। যদি তাঁদের মধ্যে সন্ধি হয়ে যায়, তাহলে সে সন্ধিপত্রের সিলমোহর লাগবে আমাদের রক্ত দিয়ে। আমাদের সব চক্রান্ত বিফল হয়ে যাবে এবং আমাদের চক্রান্তের ভিত ভূগর্ভ থেকে মাটির উপর চলে আসবে। অতএব, যেভাবেই হোক, এ সন্ধি সফল হতে দেয়া যাবে না।

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা বললো, উত্তম হবে এই যে, আমরা হযরত আলী (রাঃ) এর বাহিনীর সাথে মিশে থাকি। হযরত আলী (রাঃ) আপত্তি করলে আমরা বলবো, আমরা আপনার সাথে এজন্য রয়েছি যে, যদি সন্ধি প্রচেষ্টা সফল না হয়, তাহলে তৎক্ষণাত আপনার সাহায্যের জন্য আমরা উপস্থিত হতে পারবো। হযরত আলী (রাঃ) এর বাহিনীর নিকটে থেকে আমাদের চেষ্টা হওয়া উচিত যাতে কোনপ্রকারে সন্ধি না হয় এবং যুদ্ধ বেঁধে যায়।

সন্ধি বিফল

পরবর্তী দিন হযরত আলী (রাঃ) নিজ বাহিনী নিয়ে বসরা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। হযরত তালহা (রাঃ) ও যুবায়র (রাঃ)ও নিজেদের বাহিনী নিয়ে বসরা থেকে বের হলেন। তিনদিন পর্যন্ত দুপক্ষের সৈন্যরা সামনাসামনি দাঁড়িয়ে রইলো এবং সন্ধির কথাবার্তা চলতে থাকলো। হযরত আলী (রাঃ) হযরত তালহা (রাঃ)

www.e-ilm.weebly.com

ও যুবায়র (রাঃ) এর নিকট বার্তা পাঠালেন যে, কা'কা'য়ের জবানীতে যেসকল কথাবার্তা হয়েছে, আপনারা যদি তাতে বহাল থাকেন তাহলে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া উচিত। হযরত তালহা (রাঃ) ও যুবায়র (রাঃ) জবাব দিলেন, নিঃসন্দেহে আমরা সে বিষয়ে বহাল রয়েছি। অতঃপর এদিক থেকে এ দুজন নিজ নিজ ঘোড়ায় চড়ে বের হলেন এবং ওদিক থেকে হযরত আলী (রাঃ) নিজ ঘোড়ায় আরোহণ করে বের হয়ে এলেন। উভয় পক্ষ এত নিকটবর্তী হলেন যে, দুপক্ষের ঘোড়ার ঘাড় একটির সাথে আরেকটি মিশে গেল।

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আপনারা যে আমার বিরুদ্ধে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন, তা কি কোন শরয়ী দালিলের ভিত্তিতে? আপনাদের নিকট কোন দলিল থাকলে বর্ণনা করুন। নতুবা মুসলমানদের সূত্রকে বিচ্ছিন্ন করবেন না। আল্লাহকে ভয় করুন। আমি কি আপনাদের দ্বীনি ভাই নই? আমার রক্ত আপনার জন্য এবং আপনাদের রক্ত আমার জন্য হারাম নয় কি? হযরত তালহা (রাঃ) বললেন, আপনি হযরত উছমান বিরোধী ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আমি উছমান (রাঃ)এর হত্যাকারীদের অভিশাপ দিচ্ছি। অতঃপর তিনি বললেন, হে তালহা, আপনি কি আমার হাতে বায়আত করেন নি? হযরত তালহা (রাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই। তবে এ অবস্থায় যে, আমার গর্দানের উপর তলোয়ার স্থাপন করা ছিল।

হযরত আলী (রাঃ) হযরত যুবায়ের (রাঃ) এর প্রতি মুখ করলেন এবং বললেন, আপনার স্মরণ আছে কি যে, একদিন আমরা দুজনে হাতে হাত ধরে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) আপনাকে প্রশ্ন করেছিলেন, হে যুবায়র! তুমি কি কি আলী (রাঃ) কে ভালবাস? আপনি জবাব দিলেন হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। এতে রসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন; কিন্তু একদিন তুমি আলী (রাঃ) এর সাথে অন্যায়ভাবে লড়াই করবে। হযরত যুবায়র (রাঃ) বললেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কথা আমার স্মরণ হয়েছে। তাছাড়া হযরত যুবায়র (রাঃ) দেখলেন যে, হযরত আম্মার ইবনে য়াসের (রাঃ) হযরত আলীর বাহিনীতে রয়েছেন। তখন তাঁর রসুলুল্লাহ (সঃ) এর-এ উক্তি স্মরণ হলো যে, আম্মারকে বিদ্রোহী গোষ্ঠী হত্যা করবে। হযরত যুবায়র (রাঃ) এর দৃঢ়বিশ্বাস জন্মালো যে, তাঁর ইজতিহাদী ভুল হয়েছে। তিনি নিজ প্রতিজ্ঞা থেকে নিবৃত্ত হলেন এবং এ বিবাদ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকলেন।

সন্ধি সম্পাদনে আর কোন সন্দেহ রইলো না। উভয় পক্ষের সন্ধিপ্রিয় লোকেরা সুস্থির হলেন যে, মুসলমানদের তলোয়ারে নিজেদের মধ্যে ঝনঝনানি আর হলো না।

কিন্তু সাবাঈ গোষ্ঠী এ সময় দুরভিসন্ধি পাকাচ্ছিল। রাতে উভয়পক্ষের সৈন্যরা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো। রাতের আঁধার কেটে না যেতেই সাবাঈ গোষ্ঠী

www.e-ilm.weebly.com

হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বাহিনীর উপর আক্রমণ করে বসলো। উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। হযরত যুবায়র (রাঃ) ও তালহা (রাঃ) তাবু থেকে বের হয়ে জিজ্ঞেস করলেন এ কিসের শোরগোল? তাদের লোকেরা জবাব দিল, আলী (রাঃ) এর বাহিনী আমাদের আক্রমন করেছে। তখন তালহা (রাঃ) ও যুবায়র (রাঃ) বললেন, পরিতাপের বিষয়, আলী (রাঃ) মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত না করে ছাড়লেন না। আমাদের পূর্ব থেকেই তাঁর প্রতি সন্দেহ ছিল।

ওদিকে হযরত আলী (রাঃ) নিজ সাথীদের জিজ্ঞেস করলেন এ শোরগোল কেন? সাবাঈরা জবাব দিল, তালহা ও যুবায়রের বাহিনী আমাদের উপর আক্রমণ করেছে। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, পরিতাপের বিষয়, তালহা ও যুবায়র (রাঃ) মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত না করে ছাড়লেন না। আমার পূর্ব থেকেই তাঁদের সাথে সন্ধির আশা ছিল না।

উট যুদ্ধ

উভয়পক্ষ থেকে তীব্র লড়াই শুরু হলো। মুসলমানদের তলোয়ার নিজ ভাইদের গলায় চলতে লাগলো। বসরার কাযী কা'ব ইবনে ছওর উম্মুল মুমিনীনের নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন যে, আপনি যদি একটু কষ্ট স্বীকার করেন তাহলে হয়ত এ গৃহযুদ্ধ বন্ধ হতে পারে। হযরত আয়েশা (রাঃ) উটে আরোহণ করে স্বয়ং ময়দানে উপস্থিত হলেন। সতর্কতার কারণে তাঁর হাওদাজ বর্মে আচ্ছাদিত করে দেয়া হয়েছিল। বসরীয়রা যখন উম্মুল মুমিনীনের হাওদাজ দেখলো তখন তারা মনে করলো যে, উম্মুল মুমিনীন স্বয়ং লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে এসেছেন। তারা আরো উৎসাহে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলো।

হযরত আয়েশা (রাঃ) কা'ব ইবনে ছওরকে বললেন, আপনি মুসলমানদের বুঝান, তারা যুদ্ধ থেকে বিরত হোক। কিতাবুল্লাহর ফয়সালা মেনে নিক। কা'ব ইবনে ছওর এ বানী শোনাবার জন্য অগ্রসর হলেন। অমনি এক সাবাঈ তাঁকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ শুরু করে দিল। বসরাবাসী মহানবী (সঃ) এর পরিবারকে আশংকাজনক দেখে হাওদাজ চারিদিক থেকে ঘিরে রাখলো। বনূ যাববা, আযুদ ও বকর ইবনে ওয়ায়িল অগ্রসর হয়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে লাগলো। যে ব্যক্তি উটের রশি ধরে রেখেছিল, সে আহত হয়ে পড়ে গেলে অন্যজন ধরলো, সে শহীদ হয়ে গেলে তৃতীয়জন অগ্রসর হলো। এভাবে সত্তরজন জানবাজ রসূলের ঘরের বাতিতে পতঙ্গের ন্যায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করলো।

হযরত আলী (রাঃ) মনে করলেন, যতক্ষণ হযরত আয়েশা (রাঃ) এর উট দাঁড়িয়ে থাকবে, ততক্ষণ লড়াই ক্ষান্ত হবে না। তাঁর ইশারায় এক ব্যক্তি পিছন থেকে এসে উটের পায়ে তলোয়ার মারলো। উট জখম হয়ে উপুড় হয়ে পড়ে

www.e-ilm.weebly.com

গেল। উট পড়ে গেলেই উটওয়ালারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। হযরত আলী (রাঃ) নির্দেশ দিলেন যে, কোন পলাতককে ধাওয়া করবে না। কোন আহতকে হত্যা করবে না। গণীমতের মাল আহরণ করবে না। অতঃপর মুহাম্মাদ ইবনে আবূবকরকে নির্দেশ দিলেন যে, নিজ বোনকে সাবধানতা ও নিরাপত্তার সাথে নামিয়ে নাও এবং দেখ তাঁর কোন কষ্ট হয়নি তো।

মুহাম্মাদ ইবনে আবূবকর কা'কা ইবনে আমর ও যুফার ইবনে হারিছসহ হযরত আয়েশা (রাঃ) এর উটের নিকট গেলেন এবং হাওদাজের রশি কেটে উটের পিঠ থেকে নীচে নামালেন। হাওদাজ ছিল তীরে জর্জরিত। অতঃপর হযরত আয়েশা (রাঃ) কে পর্দা করে সাবধানতা ও স্বাচ্ছন্দের সাথে নামালেন। জানা গেল যে, আল্লাহর রহমতে তিনি নিরাপদ আছেন। শুধুমাত্র তাঁর এক বাহুতে একটি তীরের খোঁচা লেগেছে। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) নিজেই হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আম্মাজান কেমন আছেন? হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, ভালো আছি। আল্লাহ তোমার ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আল্লাহ আপনার ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন।

এ লড়াইয়ে দুপক্ষ থেকে প্রায় দশ হাজার মুসলমানের জীবনাবসান ঘটে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হযরত তালহা (রাঃ), তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ ইবনে তালহা ও আবদুর রহমান ইবনে আত্তাব প্রমুখ।

হযরত আলী (রাঃ) এর সাথে কথাবার্তার পর হযরত যুবায়র (রাঃ) যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত থাকবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেমতে লড়াইয়ের শুরুতেই তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে এলেন এবং বসরা থেকে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে হেজাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। কিন্তু তিনি সাবা' প্রান্তরে পৌছুলে জনৈক আমর ইবনে জরসূয তাঁকে নামাজরত অবস্থায় শহীদ করে দেয়। আমর ইবনে জরসূয হযরত যুবায়রের হাতিয়ার নিয়ে আনন্দের সাথে হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট এল। হযরত আলী (রাঃ) হযরত যুবায়রের (রাঃ) তলোয়ার চিনতে পেরে বললেন, এ তলোয়ারের মালিক অনেকবার রসূলুল্লাহ (সঃ) এর বিপদ দূর করেছেন। আমি তাঁর হত্যাকারীকে জাহান্নামের সংবাদ দিচ্ছি।' ইবনে জরসূযের কপালে বিষণ্নতার ঘাম দেখা দিল। সে বললো, আমি আপনার দুশমনদের হত্যা করেছি। আর আপনি আমাকে জাহান্নামের সংবাদ দিচ্ছেন।

লড়াই শেষ হয়ে গেলে হযরত আলী (রাঃ) যুদ্ধ ময়দানে একবার পরিভ্রমণ করলেন। নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামকে এ অনর্থক গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে রক্তমাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখে তিনি অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। তিনি বসরার কাযী কা'ব ইবনে ছওরের লাশ দেখে নিজ সাথীদের বললেন, তোমরা তো বলেছিলে বিপক্ষদলে শুধু অবুঝ লোকেরা রয়েছে।' অতঃপর হযরত

www.e-ilm.weebly.com

তালহা (রাঃ) এর মরদেহ দেখতে পেয়ে বললেন, হে আবূ মুহাম্মাদ, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহর শপথ, আমার নিকট এ খুবই অপ্রিয় ছিল যে, আমি কুরাইশকে লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখব। তারপর তিনি তাঁর অনেক প্রশংসা করলেন।

হযরত আলী (রাঃ) উভয় পক্ষের শহীদদের জানাজা নামাজ পড়লেন এবং তাদের দাফনের নির্দেশ দিলেন। তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে, যুদ্ধ ময়দানে কারো জিনিসপত্র বা হাতিয়ার রয়ে গিয়ে থাকলে তা বসরার মসজিদ থেকে যেন নিয়ে যায়।

হযরত আলী (রাঃ) বসরায় প্রবেশ করলেন। জামে মসজিদে খুতবা দিলেন এবং বসরাবাসীর বায়আত গ্রহণ করলেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে সেখানকার ওয়ালী এবং যিয়াদ ইবনে আবূ সুফিয়ানকে রাজস্ব কর্মকর্তা নিযুক্ত করলেন। বসরায় উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) সফিয়্যা বিনতে হারিছ (রাঃ) এর বাড়ীতে অবস্থান করলেন। ক্লান্তি দূর হলে হযরত আলী (রাঃ) তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকর (রাঃ)-এর সাথে তাঁকে মদীনায় রওয়ানা করে দিলেন। পথে স্বাচ্ছন্দের জন্য বসরার চল্লিশজন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে তাঁর সাথে দিলেন। বিদায়ের সময় অনেক লোক হযরত আয়েশা (রাঃ) এর উটের চারিদিকে সমবেত হলো। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমার বৎসরা, নিজেরা একে অপরকে নিন্দা করো না। আল্লাহর শপথ, আমার ও আলী (রাঃ) এর মধ্যে পারিবারিক মনোমালিন্য সদৃশ বিরোধ ব্যতীত কোন শত্রুতা ছিল না। আমি সর্বাবস্থায় তাঁকে একজন ভালো মানুষ মনে করি।'

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, উম্মুল মুমিনীন সঠিক বলেছেন। আমার ও তাঁর মধ্যকার মতপার্থক্য এ শ্রেণীরই। তাঁর মর্যাদা অতি উন্নত। তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সম্মানিতা স্ত্রী।'

হযরত আলী (রাঃ) কয়েক মাইল পর্যন্ত বিদায় অভ্যর্থনা স্বরূপ হযরত আয়েশা (রাঃ) এর সাথে গেলেন এবং এক মঞ্জিল পর্যন্ত নিজ পুত্রদের পাঠালেন। এ ঘটনা ১লা রজব হিজরী ৩৬-এর। (আখবার ১৪৫–১৫০, ইতমাম ২২০–২২৬)

সিফফীন যুদ্ধ

উভয়পক্ষের যুদ্ধ প্রস্তুতি

বসরায় কিছুদিন অবস্থানের পর হযরত আলী (রাঃ) কূফায় চলে এলেন। এখানে তাঁকে উষ্ণ সংবর্ধনা দেয়া হলো। যেহেতু কূফায় তাঁর সমর্থকদের সংখ্যা অধিক ছিল, সে কারণে তিনি মদীনা মুনাওওরার পরিবর্তে কূফায় দারুল খেলাফত (রাজধানী) স্থাপন করলেন।

www.e-ilm.weebly.com

কূফায় অবস্থানকালে তিনি হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর সাথে মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করলেন। তথাপি দলিল পূর্ণ করার জন্য তিনি জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রাঃ) কে দূত করে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর নিকট দামেশকে পাঠালেন এবং তাঁকে বায়আতের দাওয়াত দিলেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এ আহ্বান কবুল করে নিতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, প্রথমে উছমান (রাঃ) হত্যাকারীদের হত্যা করতে হবে। অতঃপর সকল মুসলমান একত্রিত হয়ে নিজেদের ইচ্ছামত নিজেদের খলীফা নির্বাচন করবে।

হযরত আলী (রাঃ) নিজ বাহিনী নিয়ে কূফা থেকে বের হলেন এবং নাখীলা নামক স্থানে এসে অবস্থান নিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)ও বসরা থেকে নিজ বাহিনী নিয়ে এসে তাঁর সাথে মিলিত হলেন। নাখীলায় হযরত আলী (রাঃ) নিজ বাহিনীকে বিন্যস্ত করলেন এবং প্রয়োজনীয় আয়োজনাদি সেরে শাম দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তিনি নাখীলা থেকে রওয়ানা হয়ে জাজীরার পথে রিক্কা পৌছুলেন। অতঃপর ফোরাত নদী পার হয়ে সিফফীন ময়দানে এসে ছাউনি ফেললেন।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) সম্ভাব্য আশংকা থেকে অসাবধান ছিলেন না। শাম দেশের সৈন্য খুব সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত এবং যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। বিশ্বের তৎকালীন অন্যতম পরাশক্তি রোম সাম্রাজ্যের সাথে তাদের প্রায়ই সফল মোকাবেলা হত। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) একাধারে বিশ বছর এ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও শামের ওয়ালী ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও সচ্চরিত্রে শামবাসীদের এতই অনুগত করে নিয়েছিলেন যে, তারা তাঁর ইশারায় জীবনদানে প্রস্তুত ছিল। উছমান গনী (রাঃ) এর শাহাদাতের পর বিভিন্ন ইসলামী রাজ্য থেকে বড় বড় উমাইয়া নেতৃবৃন্দ এসে তাঁরই নিকটে সমবেত হয়েছিলেন। এভাবে তাঁর শক্তি আরো বেড়ে গিয়েছিল।

হযরত আলী (রাঃ) উটযুদ্ধে ব্যাপৃত হবার কারণে তিনি যে অবকাশ পেয়েছিলেন, তা পুরোপুরি কাজে লাগান। দামেশকের জামে মসজিদে সময় সময়ে উছমান (রাঃ) এর রক্তমাখা জামা ও হযরত নায়েলার কর্তিত আংগুলের প্রদর্শনীর মাধ্যমে উছমান (রাঃ) এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ঘৃণার মনোভাব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চললো। সেমতে শামীয়রা প্রতিজ্ঞা করলো যে, যতদিন তারা উছমান (রাঃ) এর হত্যার বদলা না নেবে ততদিন বিছানায় ঘুমোবে না, ঠাণ্ডা পানি পান করবে না। মিসর বিজেতা হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) যিনি রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও যুদ্ধ অভিজ্ঞতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁকেও হযরত মুআবিযা (রাঃ) নিজের সাথী করতে সক্ষম হন।

হযরত আলী (রাঃ) এর রওয়ানা হবার সংবাদ পেয়ে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)ও নিজ বাহিনী নিয়ে ময়দানে এসে উপস্থিত হলেন। এভাবে ইরাকী ও

www.e-ilm.weebly.com

শামীয় মুসলমানদের শক্তিসমূহ সিফফীন ময়দানে এসে সামনাসামনি কাতার বন্দী হয়ে রইলো।

সন্ধি প্রচেষ্টা

দুদিন যাবত উভয় পক্ষে নীরবতা বিরাজ করলো। তৃতীয় দিন বার্তা–প্রস্তাব আদান প্রদানের ধারা শুরু হলো। প্রথম প্রতিনিধিদল হযরত আলী (রাঃ) এর পক্ষ থেকে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর নিকটে পাঠানো হলো। এ প্রতিনিধিদলে ছিলেন বাশীর ইবনে আমর আনসারী, সাঈদ ইবনে কায়স হামাদানী ও শীস ইবনে রিবইয়্যি তামীমী। বাশীর ইবনে আমর, কথাবার্তা শুরু করলেন। তিনি বললেন ঃ

'হে মুআবিয়া! আপনাকে আল্লাহর সামনে যেতে এবং নিজ কর্মের হিসাব দিতে হবে। আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি উম্মতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করবেন না এবং মুসলমানদের রক্ত গৃহযুদ্ধে প্রবাহিত করবেন না।'

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বললেন, 'আপনি এ নসিহত নিজ বন্ধু হযরত আলী (রাঃ)-কে করেন না কেন? বাশীর জবাব দিলেন, তাঁর মর্যাদা আপনার চেয়ে ভিন্ন। হযরত আলী (রাঃ) নিজ ব্যক্তিগত মাহাত্ম্য, দ্বীনি শ্রেষ্ঠত্ব, ইসলাম গ্রহণে অগ্রতা ও রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নৈকট্যের দিক দিয়ে খেলাফত পদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। আপনার উচিত হবে এই যে, আপনি তাঁর নিকট বায়আত করুন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সুখী হোন।'

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বললেন, উছমান (রাঃ) হত্যার প্রতিশোধের দাবী পরিত্যাগ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।' এ সময়ে সাঈদ কথা বলতে চাইলেন। কিন্তু শীস কথা কেটে দিয়ে বললো, হে মুআবিয়া, আমরা আপনার মতলব ভালভাবে বুঝেছি। আপনি নিজে উছমান (রাঃ) এর সাহায্য এড়িয়ে তাঁকে হত্যা করিয়েছেন। যাতে আপনি উছমান (রাঃ) হত্যার বদলার দাবীর অজুহাতে খেলাফতের দাবীদার হতে পারেন। মনে রাখবেন, আপনার এ কর্মপন্থা কোন অবস্থায়ই উপকারী হতে পারে না। আপনি যদি ব্যর্থ হন তাহলে তো স্পষ্টতঃই আপনার চেয়ে কোন হতভাগা হতে পারে না। কিন্তু সফল হলেও জাহান্নামের আগুনের ফুলকি থেকে রেহাই পাবেন না।'

শীসের এ রূঢ় কথাবার্তা হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর নিকট খুবই অপ্রিয় লাগলো। তিনি বললেন, হে পাষাণ গোঁয়ার, আপনি সর্বৈব মিথ্যা বলেছেন। যান আমার ও আপনাদের মধ্যে ফয়সালা তলোয়ারেই হবে।' প্রতিনিধিদল ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন। পরস্পর তিক্ততা আরো বেড়ে গেল।

www.e-ilm.weebly.com

যুদ্ধ শুরু

এখন লড়াই ব্যতীত আর কোন উপায় ছিল না। কেননা, হযরত আলী (রাঃ) প্রথম বায়আত চাইছিলেন এবং উছমান (রাঃ) হত্যার প্রতিশোধ দ্বিতীয় পর্যায়ে রাখছিলেন। পক্ষান্তরে হযরত মুআবিয়া সর্বপ্রথমে উছমান (রাঃ) হত্যার প্রতিশোধ এবং তাঁর অলী হবার কারণে এ দাবী নিজের অধিকার মনে করছিলেন। তথাপি যেহেতু উভয়পক্ষে মুসলমান ছিলেন এবং জানতেন যে, নিজেদের মধ্যেকার গৃহযুদ্ধের ফলে ইসলামের শক্তির অনেক ক্ষতি হবে, সেকারণে অন্তরে লড়াইয়ের প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনা কম ছিল। লড়াই শুরু হলো। তবে তা এরূপ যে, দুপক্ষ থেকে একজন করে বীর বের হতো এবং বীরত্বের প্রতিদান দিত। অন্যরা তামাশা দেখত। পরবর্তীতে লড়াই তীব্র আকার ধারণ করলে একজন করে অধিনায়ক নিজ দল নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলো। মোটকথা এভাবে যিলহজ্জ মাস শেষ হয়ে গেল এবং হিজরী ৩৭-এর মুহাররম মাসের চাঁদ দেখা দিল।

সাময়িক সন্ধি

মুহাররমের চাঁদ দেখে হযরত আলী (রাঃ) ও মুআবিয়া (রাঃ) এক মাসের জন্য সাময়িক সন্ধি করে নিলেন এবং লড়াই পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল।

এ সাময়িক সন্ধিকালে পুনরায় পূর্ণাঙ্গ সন্ধির জন্য প্রচেষ্টা শুরু হলো। বস্তুতঃ এ দীর্ঘসময় এ উদ্দেশ্য সাধনে সবচেয়ে উপযুক্ত ছিল। বিশেষ করে যেহেতু উভয়পক্ষ এ বিষয়ে আকাঙ্খী ছিল। কিন্তু সাবাঈ গোষ্ঠী রাজনৈতিক ছকে নিজেদের দাবার ঘুঁটি চালতে তখনও ব্যস্ত ছিল। শীস ইবনে রিবইয়্যি যে ইতিপূর্বেকার সন্ধি আলোচনা বানচাল করে দিয়েছিল, সে এ গোষ্ঠীরই একজন বিশেষ ব্যক্তি ছিল। সে পরবর্তীতেও এ ধরণের প্রচেষ্টা সফল হতে দিল না।

সাময়িক সন্ধিকালে হযরত আলী (রাঃ) এর পক্ষ থেকে যে প্রতিনিধিদল হযরত মুআবিয়ার নিকট সন্ধির কথাবার্তা বলার জন্য গেল, তাতে য়াযীদ ইবনে কায়স, যিয়াদ ইবনে হাফসা ও আদী ইবনে হাতেম তাঈ ব্যতীত শীস ইবনে রিবইয়্যিও ছিল। প্রতিনিধিদলের নেতারূপে আদী ইবনে হাতেম কথাবার্তা শুরু করলেন এবং বললেন ঃ

'হে মুআবিয়া! আমরা আপনার নিকট ঐক্যের আহ্বান নিয়ে এসেছি। আপনি যদি তা কবুল করে নেন, তাহলে মুসলমানদের মধ্যকার বিবাদ মিটে যাবে এবং তাদের মধ্যে আর খুনখারাবী থাকবে না। দেখুন হযরত আলী (রাঃ) আপনার ভাই, উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আপনি ও আপনার দল ব্যতীত সবাই তাঁকে খলীফারূপে মেনে নিয়েছে। আপনিও তাঁর হাতে বায়আত করে বিষয়টির নিষ্পত্তি করে ফেলুন। নতুবা আশংকা রয়েছে আপনারও উটওয়ালাদের ন্যায় বিপদের মুখোমুখি হতে হবে।'

www.e-ilm.weebly.com

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বললেন, হে আদী, পরিতাপের বিষয়, আপনি আমাকে ধমকাতে এসেছেন না সন্ধি করাতে। আল্লাহর শপথ, আমি 'হরবপুত্র'। আমি যুদ্ধে ভয় পাইনা। আমি জানি আপনিও উছমান (রাঃ) হত্যায় অংশ নিয়েছিলেন। আপনার থেকে তাঁর বদলা নেয়া হবে।'

য়াযীদ ইবনে কায়স ও যিয়াদ ইবনে হাফসা ব্যাপারটি খারাপের দিকে যেতে দেখে বললেন ঃ

'হে মুআবিয়া! যে সকল কথায় কোন লাভ নেই, তা পরিহার করুন। এমন কথা বলুন যাতে নিজেদের মধ্যকার বিবাদ মিটে যায় ও সন্ধির উপায় বের হয়।'

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বললেন, সন্ধির উপায় এই যে, আলী (রাঃ) উছমান (রাঃ) হত্যাকারী যারা তাঁর বাহিনীতে শামিল রয়েছে এবং তাঁর প্রিয়জন ও সাহায্যকারী হয়ে রয়েছে তাদেরকে আমার নিকট সোপর্দ করে দেবেন। আমি প্রথমে তাঁদেরকে হত্যা করবো। অতঃপর আমি আলী (রাঃ) এর আনুগত্য করবো।

এ সময়ে শীস ইবনে রিবইয়্যি অগ্রসর হলো এবং বললো, 'হে মুআবিয়া! আপনি কি আম্মার ইবনে য়াসের (রাঃ)-এর মত মহান ব্যক্তিত্বকে হত্যা করতে চান?

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বললেন, 'কেন আম্মার ইবনে য়াসের (রাঃ) এর কি বিশেষত্ব আছে? আমি তো তাঁকে হযরত উছমান (রাঃ) এর গোলামের বদলায় হত্যা করবো।'

শীস বললো, 'আল্লাহর শপথ, এ হতে পারে না যতক্ষণ না গর্দান কাঁধ থেকে পৃথক হয় এবং পৃথিবীর পিঠ ও আসমানের বুক আপনার জন্য সংকীর্ণ হয়।'

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বললেন, যদি এমনটি হয়, তাহলে প্রথমে আপনাদের হবে।'

মোটকথা শীস ইবনে রিবইয়্যির হস্তক্ষেপে এ দূতিয়ালীও প্রথম দূতিয়ালীর মত ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল।

সর্বশেষ সন্ধি প্রচেষ্টা

অতঃপর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট পাঠালেন। এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন হাবীব ইবনে মাসলামা ফিহরী, শুরাহবীল ইবনে সামাত, মা'ন ইবনে য়াযীদ, আখনাস ইবনে শারীক প্রমুখ। হাবীব ইবনে মাসলামা ফিহরী প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে বললেন ঃ

"হযরত উছমান (রাঃ) ন্যায়সঙ্গত খলীফা ছিলেন। তিনি ছিলেন কিতাব ও সুন্নাতের আমলকারী এবং আল্লাহর নির্দেশের অনুসারী। আপনি তাঁর জীবন ভাল বাসলেন না এবং তাঁকে অন্যায়ভাবে শহীদ করে দিয়েছেন। আপনি যদি বলেন

www.e-ilm.weebly.com

যে, আপনি তার হত্যা থেকে পবিত্র, তাহলে তাঁর হত্যাকারীদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করে দিন। আমরা তাদের থেকে উসমান হত্যার প্রতিশোধ নেবো। অতঃপর মুসলমানরা একত্রিত হয়ে সুম্মিলিত মতে যাকে ইচ্ছা তাকে নিজেদের খলীফা নির্বাচন করবে।

হযরত আলী (রাঃ) ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন- আচ্ছা, আপনি আবার আমাকে বরখাস্ত করেন। ছোট মুখে বড় কথা। চুপ করুন। আপনি এ বিষয়ে কিছু বলার যোগ্য নন। হাবীব বললেন, আপনি আমাকে এমন অবস্থায় দেখবেন, যা আপনার পছন্দনীয় নয়।

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, "আপনি আমাকে ক্রুদ্ধ করতেই পারেন। যান, নিজ মনের ক্ষোভ প্রকাশ করুন। শুরাহবীল ইবনে সামাত বললেন, আমি যদি বলি তাহলে তা-ই বলবো যা আমার সাথী বলেছেন। আপনি তার জবাব দিয়েছেন। আপনার নিকটে কি এ ছাড়া আর কোন জবাব আছে?

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। এই বলে তিনি এক বক্তৃতা করলেন। তিনি প্রথমে রাসূলুল্লাহ (স:) এর নবুওয়াত প্রাপ্তি ও উম্মতের হেদায়েতের কথা উল্লেখ করলেন। অতঃপর হযরত আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহ আনুহমা-র খেলাফতের কথা উল্লেখ করলেন এবং বললেন, তারা নিজেদের খেলাফতকাল উত্তমরূপে অতিবাহিত করেছেন এবং ন্যায় ও সুবিচারের সাথে প্রশাসন চালিয়েছেন। সে কারণে আমাদের তাঁদের প্রতি খেলাফতের ব্যাপারে আহলে বায়ত হবার দিক দিয়ে নিজেদের অধিকার হরণের অভিযোগ ছিল। তথাপি আমরা তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। অতঃপর তিনি হযরত উসমান (রাঃ) এর খেলাফতের কথা উল্লেখ করলেন এবং বললেন– তিনি নিজ জীবনে এমন কিছু কাজ করলেন, যাতে লোকেরা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হলো এবং তারা তাঁকে শহীদ করে দেয়।

তারপর লোকেরা আমার নিকট এল। আমি তাদের এ ব্যাপারে কোনরূপ জড়িত ছিলাম না। তারা আমাকে খেলাফতপদ গ্রহণ করতে বাধ্য করলো। আমি প্রথমে অস্বীকার করলাম। কিন্তু যখন বলা হলো যে, উম্মতের সূত্র বিচ্ছিন্নতা হওয়া থেকে এভাবে রক্ষা পেতে পারে এবং মুসলমানরা আমার ব্যতীত আর কারো খেলাফতে একমত হবে না, তখন আমি তাদের আবেদন কবুল করে নিলাম। প্রথমে তালহা (রাঃ) ও যুবায়ের (রাঃ) বায়আত করার পরে আমার বিরোধিতা করলেন। এখন মুআবিয়া (রাঃ) বিরোধের পতাকা সমুন্নত রাখছেন। অথচ তিনি প্রাথমিককালের অগ্রদলের মধ্যে নন। তিনি নিজ জীবনে ইসলামের কোন নিষ্ঠাপূর্ণ সেবাও করেননি। তিনি, তাঁর পিতা ও তাঁর পরিবার সর্বদা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের শত্রু ছিলেন। তিনি বাধ্য হয়ে ইসলামের গণ্ডীতে প্রবেশ করেছেন। আশ্চর্য, আপনারা তাঁর সঙ্গ দিচ্ছেন, আর রাসূলের

www.e-ilm.weebly.com

আহলে বায়তের বিরোধিতা করছেন। আমি আপনাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এবং অসত্যকে রহিত করে সত্যকে জীবিত করতে পরামর্শ দিচ্ছি।

শুরাহবীল ইবনে সামাত বললেন, “এ বলে দিন যে, উসমান (রাঃ) মাজলুমভাবে নিহত হয়েছেন।

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আমি এ বলবো না যে, তিনি মাজলুম হয়ে নিহত হয়েছেন। তেমনি এও না যে, তিনি জালেম হয়ে নিহত হয়েছেন।

হযরত আলী (রাঃ) এর এ জবাব শুনে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা উঠে দাঁড়ালেন এবং এই বলে বিদায় হয়ে গেলেন যে, যে ব্যক্তি হযরত উসমান (রাঃ) কে মাজলুমভাবে শহীদ বলে মানেন না, তাঁর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। এভাবে সন্ধির এ শেষ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল। (মুহাজারাতে খাযারী ২খ. ৯৬-৯৭)

ফয়সালাকারী লড়াই

মুহররম মাসের শেষ তারিখ সাময়িক সন্ধির মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছিল। সফর মাসের চাঁদ দেখতেই হযরত আলী (রা) নিজ ঘোষকের মাধ্যমে ঘোষণা করে দিলেন যে, আমরা শামীয়দের যথেষ্ট সময় দিয়েছিলাম যাতে তারা অবাধ্যতা থেকে নিবৃত্ত হয় এবং সত্যের প্রতি ধাবিত হয়। কিন্তু তারা তাতে সম্মত হলো না। অতএব আগামীকাল থেকে যথারীতি তাদের মোকাবেলা করা হবে। অতঃপর তিনি নিজ সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন যে, পলায়নপর ব্যক্তিকে হত্যা করবে না। আহতকে মেরে ফেলা যাবে না। কোন সম্পদ অপহরণ করা যাবে না, স্ত্রীলোকদের কোনরূপ অসম্মান করা যাবে না।

অতঃপর তিনি যুদ্ধনীতি মোতাবেক নিজ বাহিনীকে বিন্যস্ত করলেন এবং বিভিন্নভাগে বিভক্ত করে প্রতি ভাগের জন্য পৃথক পৃথক সর্দার নিযুক্ত করলেন। হযরত মুআবিয়া (রা) ও নিজ সৈন্যদের ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করলেন এবং বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে প্রতি ভাগের জন্য পৃথক পৃথক সর্দার নিযুক্ত করলেন এবং লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

পহেলা সফর মঙ্গলবার লড়াই শুরু হলো। এক সপ্তাহ যাবত লড়াইয়ের রূপ ছিল এই যে, দুপক্ষ থেকে একজন করে সর্দার নিজ অংশের বাহিনী নিয়ে ময়দানে বের হতো এবং বীরত্বের পুরস্কার দিতো অতঃপর সন্ধ্যায় ফিরে যেতো। এ সকল মোকাবেলায় কখনো এ দল বিজয়ী হতো, আবার কখনো ও দল। এ ভাবে লড়াই কোন ফয়সালার পর্যায়ে পৌঁছাতে পারলো না।

৮ ই সফর মঙ্গলবার রাতে হযরত আলী (রা) নিজ বাহিনীর সামনে এক জোরালো বক্তৃতা দিলেন এবং সাধারণ আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। পরবর্তী দিন হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ) স্বয়ং মোকাবেলার জন্য বের হলেন। উভয় পক্ষের বাহিনী সর্বশক্তি দিয়ে এক অপরের প্রতি আক্রমণ করলো।

www.e-ilm.weebly.com

সারাদিন ভীষণ লড়াই হলো। রাতে উভয় পক্ষ নিজ নিজ আশ্রয়স্থলে ফিরে এলো। কিন্তু জয় পরাজয়ের কোন সিদ্ধান্ত হতে পারলো না।

৯ই সফর বুধবার সূর্য কিরণের সাথে সাথে তলোয়ারসমূহ পুনরায় কোষ থেকে বেরিয়ে এলো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভয়ানক যুদ্ধ অব্যাহত রইলো। প্রথমে হযরত আলীর (রা) বাহিনীতে পরাজয়ের চিহ্ন দেখা দিল। কিন্তু হযরত আলী (রা) নিজেই তলোয়ার পরিচালনার নৈপূণ্য প্রদশন করে এবং নিজ সাথীদের সাহস বৃদ্ধি করে যুদ্ধ আঙ্গিকের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করলেন। অতঃপর হযরত মুআবিয়া (রা) এর বাহিনীতে পরাজয়ের আলামত দেখা দিল। আশতার নাখঈ নিজ সাথীদের নিয়ে হযরত মুআবিয়া (রা) এর তাঁবুর নিকটে পৌঁছে গেল। কিন্তু হযরত মুআবিয়া (রা) এর রক্ষীবাহিনী নিজেদের জীবন বাজি রেখে তাদেরকে পিছনে হটিয়ে দিল। অবশেষে সে অবস্থায় রাতের আঁধার ছেয়ে গেল। কিন্তু দুপক্ষের বীরদের তলোয়ারসমূহ তেমনই চমকাতে থাকলো।

কাদেসিয়ার লাইলাতুল হারীর-এর ন্যায় সারারাত ভয়ানক যুদ্ধ হলো। তলোয়ারের ঝনঝনানি, ঘোড়ার হ্রেষারব ও বীরদের ধ্বনিতে কেয়ামতের শোরগোল চলতে থাকলো। যখন সূর্য উদিত হলো তখনও মুসলমানরা ঠিক তেমনি যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। একাধারে চব্বিশ ঘণ্টার লড়াইয়ের পর দুপক্ষেই ক্লান্তির ছাপ দেখা যেতে লাগলো। কিন্তু যুদ্ধের ফয়সালা না করে কেউ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরতে প্রস্তুত ছিল না। হযরত আলী (রা) এর সৈন্যসংখ্যা ছিল নব্বই হাজার। হযরত মুআবিয়া (রা) এর আশি হাজার। এভাবে দশ হাজারের পার্থক্য প্রথম থেকেই ছিল। রাতের লড়াইয়ে হযরত মুআবিয়া (রা) এর বাহিনীর বেশি ক্ষতি হয়।

এভাবে ১০ই সফর বৃহস্পতিবার সকালে হযরত আলী (রা) এর বাহিনীর পাল্লা উল্লেখযোগ্যরূপে ভারী দেখা যেতে লাগলো। আশতার সুযোগ বুঝে সর্বশক্তিতে হযরত মুআবিয়ার (রা) বাহিনীর উপর আক্রমণ করলো। হযরত আলী (রা) রীতিমত তাকে সাহায্য করতে লাগলেন। হযরত মুআবিয়া (রা) এর বাহিনী নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ শক্তির আক্রমণ প্রতিহত করতে পারলো না এবং তাদের পা সরে যেতে লাগলো। হযরত মুআবিয়া (রা) এ নাজুক পরিস্থিতি দেখে হযরত আমর ইবনে আস (রা) এর সাথে পরামর্শ করলেন এবং নিজেদের লোকদের ইঙ্গিত করলেন। আর হঠাৎ করে শামীয়রা বর্শায় কুরআন মজিদ উঁচু করে ধরে চীৎকার শুরু করে দিল ঃ

এ আল্লাহর কিতাব, আমাদের ও নিজেদের মধ্যে এর ফয়সালা মেনে নিন। শামীয়রা না থাকলে পশ্চিম সীমান্তের হেফাজত কে করবে? আর ইরাকীরা না থাকলে পূর্বসীমান্ত কে রক্ষা করবে?

www.e-ilm.weebly.com

হযরত আলী (রা) জানতেন যে, এ এক যুদ্ধ কৌশল। তিনি ঘোষণা করলেন– হে আল্লাহর বান্দারা, যুদ্ধ চালিয়ে যাও। ধোকায় পড়োনা। জয় খুব নিকটে। আমি মুআবিয়া, আমর ইবনে আস, হাবীব ইবনে মাসলামা, ইবনে আবী সারাহ ও ইবনে আবী মুয়ীতকে শৈশব থেকে চিনি। তাঁরা তোমাদেরকে ধোকা দেবার জন্য এ চাল চেলেছেন। কিন্তু হযরত আলী (রা) এর দলের সংখ্যা গরিষ্ঠ নেতারা তাঁর কথা মানতে অস্বীকার করলেন। আশআছ ইবনে কায়স কিনদী, মিসআর ইবনে ফিদকী, ইবনে কাওয়া এবং অন্যান্য সেনানায়ক যারা ছিল সাবাঈ গোষ্ঠীর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং লড়াইয়ের সিদ্ধান্তমূলক সমাপ্তি নিজেদের স্বার্থের জন্য পরিপন্থী মনে করতো– তারা বলে উঠলো-এ কিভাবে হতে পারে যে, আমাদেরকে আল্লাহর কিতাবের প্রতি আহ্বান করা হবে আর আমরা তা প্রত্যাখ্যান করবো?

হযরত আলী (রা) যখন যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে বেশী পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, তখন লোকেরা বললো– আপনি যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দিন। নইলে আমরা আপনার সাথে তেমনই আচরণ করবো যেমনটি উসমানের সাথে করেছি।

হযরত আলী (রা) যখন নিজের লোকদের মধ্যে এ দৃষ্টিভঙ্গি দেখলেন, তখন তাঁর পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেল। তিনি আশতারের নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, যুদ্ধ বন্ধ করে এক্ষুনি ফিরে আসুন। নিজের দলেই ফিতনা ছড়িয়ে পড়েছে। আশতার ভগ্নমনে ফিরে এলো। লড়াই বন্ধ হয়ে গেল।

(মুহাজারাতে খাযারী ২ খ. ৯৯)

সালিসী চুক্তি

হযরত আলী (রা) আশআছকে হযরত মুআবিয়া (রা) এর নিকটে পাঠিয়ে জেনে নিলেন যে, আপনার কুরআন মজিদের ফয়সালা মেনে নেবার অর্থ কি? হযরত মুআবিয়া (রা) বললেন, "আমার উদ্দেশ্য হলো এই যে, দুপক্ষ একজন করে সালিস নিয়োগ করবে এবং তাঁদের নিকট থেকে অঙ্গীকার আদায় করবে যে, তাঁরা কিতাবুল্লাহর বাইরে যাবেন না। অতঃপর কুরআন শরীফের নির্দেশ মোতাবেক তাঁরা দুজনে আমাদের বিরোধ নিষ্পত্তির যে উপায় নির্ধারণ করবেন, আমরা তা মেনে নেবো। ইরাকীরা বললো, "আমরা এ প্রস্তাবে সম্মত।"

হযরত মুআবিয়া (রা) শামীয়দের পক্ষ থেকে আমর ইবনে আস (রা) কে সালিস নিয়োগ করলেন। কেউ তাঁর নিয়োগে আপত্তি করলো না। কিন্তু ইরাকীরা এ বিষয়েও একমত হতে পারলো না। আশআছ ও তার সাথীরা হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) এর নাম প্রস্তাব করলো। হযরত আলী (রা.) বললেন আবু মূসা আশআরী (রা.) এর মতের উপর আমার তেমন আস্থা নেই। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কে সালিস নিয়োগ করা হোক। ইরাকীরা বললো, সালিস নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তো আপনার নিকটজন।

www.e-ilm.weebly.com

হযরত আলী (রা) বললেন, শামীয়রা তো কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে নির্বাচন করেনি। ইরাকীরা বললো, সে দায়িত্ব তাদের। হযরত আলী (রা) বললেন, তাহলে আশতারকে সালিস করা হোক। তারা বললো, বেশ, এ সকল আগুন তো আশতারেরই লাগানো। অবশেষে হযরত আলী (রা) যখন দেখলেন যে, ইরাকীরা আবু মুসা আশআরী (রা) ব্যতীত আর কাউকে মেনে নেবে না, তখন বললেন, তোমরা যা চাও করো।'

আমর ইবনে আস (রা) হযরত আলী (রা) এর আশ্রয় শিবিরে এলেন এবং নিম্নরূপ চুক্তিপত্র লেখা হলো ঃ

"এ চুক্তিপত্র, যাতে আলী ইবনে আবু তালিব কূফীয় ও তাদের সাথীদের পক্ষ থেকে এবং মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান শামীয় ও তাদের সমর্থকদের পক্ষ থেকে একমত হয়েছেন। এ সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, আমরা উভয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর কিতাবের ফয়সালা মেনে নেবো। কিতাবুল্লাহ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে ফয়সালাকারী হবে। যে নির্দেশ করবে, আমরা পালন করবো এবং যা নিষেধ করবে, আমরা তা থেকে বিরত থাকবো। আবু মুসা আবদুল্লাহ ইবনে কায়স ও আমর ইবনে আস সালিস নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর কিতাবের বিধান মোতাবেকই ফয়সালা করবেন। যদি কোন বিষয় কিতাবুল্লাহ-এ না পান, তাহলে তারা সুনির্দিষ্ট অর্থপূর্ণ সর্বস্বীকৃত সুন্নাহর শরণাপন্ন হবেন। আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা) এর পক্ষ থেকে উভয় সালিসের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার পূর্ণ আশ্বাস দেয়া হচ্ছে এবং অঙ্গীকার করা হচ্ছে যে, তাঁদের ফয়সালা কার্যকরী করতে উম্মত তাঁদের সাহায্য করবে। তাঁদেরকে ফয়সালা করার জন্য রমজান পর্যন্ত সময় দেয়া হচ্ছে। তাঁরা তাঁদের ফয়সালা এমন এক স্থানে ঘোষণা করবেন যা ইরাক ও শামের মধ্যভাগে অবস্থিত।"

এ চুক্তিপত্রে দুপক্ষ থেকে কতিপয় দায়িত্ববান ব্যক্তির স্বাক্ষর হলো এবং সিদ্ধান্ত হলো যে, দু সালিস দৌমাতুল জানদেল এসে তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। চুক্তিপত্রে তারিখ লেখা হলো ১৩ই সফর হিজরী ৩৭। এ চুক্তিপত্র সম্পন্ন করার পর উভয় পক্ষ নব্বই হাজার জানবাজকে সিফফীন ময়দানে চিরনিদ্রায় শায়িত রেখে নিজ নিজ বাড়ীতে রওয়ানা হলো। মুসলমান শহীদদের সংখ্যা ইসলামের ইতিহাসের সকল যুদ্ধে শহীদদের সর্বমোট সংখ্যার চেয়েও বেশি ছিল।

খারেজীদের আত্মপ্রকাশ

সন্ধির অঙ্গীকারপত্র সম্পন্ন হলে আশআছ থেকে কায়সকে তা বিভিন্ন গোত্রের নিকট পাঠ করে শোনাতে নির্দেশ দেয়া হলো। আনাযা গোত্রের চার হাজার লোক হযরত আলী (রা) এর সাথে ছিল। আশআছ তাদেরকে এ অঙ্গীকার পত্র শোনালেন। তখন দু ভাই দাঁড়িয়ে বললো, আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ফয়সালা

www.e-ilm.weebly.com

আমরা মেনে নেবো না। আল্লাহর দ্বীনের ফয়সালা থাকতে আপনারা কি মানুষকে ফয়সালাকারী নিযুক্ত করলেন? আপনারা যদি এরূপ করেন, তাহলে বলুন আমাদের নিহতদের কি পরিণাম হবে? মুরাদ, বনূ রাসেব ও বনূ তামীমও ঠিক এমনই মন্তব্য করলো।

মুহরিয ইবনে খুনায়স হযরত আলী (রা) এর নিকট এসে বললো, এ ফয়সালা প্রত্যাখ্যান করুন। আমার আশঙ্কা হয় যে, এর পরিণতি আপনার জন্য ভালো হবে না। হযরত আলী (রা) বললেন, তোমরা আমাকে পীড়াপীড়ি করে এ ফয়সালা মেনে নিতে বাধ্য করলে। এখন আমি মেনে নিলে তোমরা আমাকে তা প্রত্যাখ্যান করতে বলছো। এ হতে পারে না।

মোটকথা হযরত আলী (রা) সিফসীন থেকে ফিরে এলে তাঁর দলের মধ্যেই বিভেদ সৃষ্টি হলো। একদল সালিস নিয়োগ পছন্দ করলো এবং বলতে লাগলো যে, মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত সূত্র এভাবে একত্রিত হয়ে যাবে। অপর দল তা অপছন্দ করলো এবং বলতে লাগলো, শরীয়তের বিষয়ে মানুষকে সালিস বানানো জায়েজ নয়। এ মতপার্থক্যের প্রকাশ মুখের থেকে অতিক্রম করে তলোয়ারের আগায়ও হতে লাগলো। শাম থেকে ইরাক পর্যন্ত একের পর এক ছোট খাট সংঘর্ষ অব্যাহত রইলো। হযরত আলী (রা) কুফায় এসে পৌছুলে সালিস নিয়োগে বিরোধী বারো হাজার লোকের একটি দল তাঁর থেকে প্রকাশ্যভাবে পৃথক হয়ে গেল। এ দলটি শীস ইবনে রিবইয়্যিকে নিজেদের আমীর ও আবদুল্লাহ ইবনে কাওয়া য়াশকুরীকে নামাজের ইমাম নির্বাচিত করলো এবং হারুরা নামক স্থানে সমবেত হলো। এ দলটি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী এভাবে ব্যাখ্যা করলো ঃ

ফয়সালা কেবলমাত্র আল্লাহর মানা যেতে পারে। আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার আমাদের দায়িত্ব। হযরত আলী (রা) ও হযরত মুআবিয়া (রা) উভয়ে গুনাহগার। হযরত মুআবিয়া (রা) এ কারণে যে, তিনি ন্যায়সঙ্গত খলীফা হযরত আলী (রা) কে মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন। হযরত আলী (রা) এ কারণে যে, তিনি হত্যাযোগ্য মুআবিয়া (রা) এর সাথে সন্ধির কথাবার্তা বলেছেন এবং কুরআনের স্পষ্ট ফয়সালা থাকতে সে বিষয়ে মানুষকে বিচারক নিয়োগ করেছেন। আমরা প্রথমে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। জয়ের পর আমরা এমন শাসনব্যবস্থা কায়েম করবো যা কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী হবে।

হযরত আলী (রা) এ ফিতনা দমনের জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কে পাঠালেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা তাঁর সাথে বিতর্ক শুরু করে দিল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বললেনঃ

"আর যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদের আশঙ্কা কর তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন সালিস ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিয়োগ

www.e-ilm.weebly.com

করো। তারা দুজনে যদি সমঝোতা করে দিতে চায়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা উভয়ের মধ্যে আনুকুল্য সৃষ্টি করে দিবেন।" (নিসা ৩৫)

স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ নিরসনের জন্য যদি সালিস নিয়োগ করা যেতে পারে, তাহলে উম্মতের বিভেদ নিস্পত্তির জন্য সালিস নিয়োগ করলে ক্ষতি কি?

খারেজীরা জবাব দিল– স্বামী-স্ত্রীর বিরোধের সাথে বিদ্রোহীদের বিষয় অনুমান করা ঠিক হবে না। সেখানে আল্লাহ তাআলা মানুষকে ফয়সালা করার ক্ষমতা দিয়েছেন। কিন্তু এখানে নিজের পক্ষ থেকে ব্যভিচারী ও চোরের ন্যায় সুনির্দিষ্ট নির্দেশ জারী করেছেন। মানুষের হাতে কিছু রাখেন নাই। মুআবিয়া ও তার সাথীরা মুসলমানদের দল থেকে পৃথক হয়ে বিদ্রোহ করেছে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার একটিই ফয়সালা ছিল– হয়তো তারা তওবা করবে, নইলে তাদেরকে হত্যা করে ফেলতে হবে। আপনারা তাদের সাথে সন্ধির কথাবার্তা বলে আল্লাহর এ আদেশের খেলাফ করেছেন। অতএব, আপনারাও কাফের, তারাও কাফের।

তাদের এ বিতর্ক চলতে থাকা অবস্থায় হযরত আলী (রা) নিজে পৌঁছালেন। তিনি জানতে পারলেন যে, তাদের উপর য়াযীদ ইবনে কায়সের প্রভাব রয়েছে। তিনি য়াযীদ ইবনে কায়সের তাঁবুতেই নামলেন। প্রথমে তিনি দুরাকাত নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর য়াযীদকে ইসপাহান ও রায়-এর ওয়ালী নিযুক্ত করলেন। এরপর তিনি তাদের বৈঠকে উপস্থিত হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের দ্বীনি নেতা কে? খারেজীরা ইবনে কাওয়ার নামোল্লেখ করলো। তিনি ইবনে কাওয়াকে ডেকে প্রশ্ন করলেন– তোমরা বায়আতে অন্তর্ভুক্ত হবার পর আবার বেরিয়ে গেলে কেন? ইবনে কাওয়া জবাব দিল– কারণ আপনি আল্লাহর হুকুম পরিহার করে মানুষকে সালিস মেনেছেন।

হযরত আলী (রা) বললেন, আমি উভয় সালিস থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তাঁরা আল্লাহর হুকুম মোতাবেকই ফয়সালা করবেন। তাঁরা যদি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক ফয়সালা করেন তাহলে আমি তা মেনে নেবো। নইলে প্রত্যাখ্যান করবো।

ইবনে কাওয়া প্রশ্ন করলো- আচ্ছা বলুন, আপনি কি হত্যার ব্যাপারে মানুষের ফয়সালা জায়েজ মনে করেন?

হযরত আলী (রা) বললেন, আমি মানুষের ফয়সালা গ্রহণ করিনি। কুরআনের ফয়সালাই কবুল করেছি। অবশ্য ফয়সালা এ দুজন সালিসে ঘোষণা করবেন। কুরআন একটি কিতাব। সে নিজে কথা বলতে পারে না।

ইবনে কাওয়া প্রশ্ন করলো, তাহলে এজন্য ছয় মাসের দীর্ঘ সময়ের কি প্রয়োজন ছিল?

www.e-ilm.weebly.com

হযরত আলী (রা) বললেন, 'যাতে জ্ঞানী ও মুর্খ সকলে কুরআনের হুকুম বুঝতে পারে এবং এ-ও সম্ভব যে, এ সময়ে সন্ধির জন্য পরিবেশ আরো অনুকূল হয়ে যাবে।"

এভাবে হযরত আলী (রা) বুঝিয়ে সুঝিয়ে খারেজীদেরকে কুফায় ফিরিয়ে আনেন এবং দু সালিসের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সালিসির ফল

ছয়মাস সময় অতিবাহিত হয় গেলে চুক্তি অনুযায়ী হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) ও হযরত আমার ইবনে আস দৌমাতুল জানদেল–এ সমবেত হলেন। হযরত আবু মূসা আশআরীর সাথে চারশত লোকের একটি দল ছিল। এর নেতা ছিলেন শুরায়হ ইবনে হানী এবং ইমাম ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)। এরূপে হযরত আমর ইবনে আসের (রা) সাথে চারশত লোকের একটি দল ছিল। এর আমীর ছিল শুরাহবীল ইবনে সাম্মা। এ ছাড়া হযরত মুআবিয়া (রা) এর অনুরোধে কতিপয় নিরপেক্ষ বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন যেমন– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র, আবুল জাহম ইবনে হুযায়ফা, আবদুর রহমান ইবনে য়াগুছ, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহ আনহুম প্রমুখ। তাঁরা উম্মতের সমঝোতার নেক কাজে শরীক থাকবার জন্য উপস্থিত হলেন।

উভয় সালিস আলোচ্য বিষয়ে আলাপ শুরু করলেন। হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) প্রথমে মুসলিম উম্মাহর দুঃখজনক মতভেদ ও তার ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আমর, অনেক জুতার তলা ক্ষয় হয়েছে। এখন কোন উপায় হওয়া প্রয়োজন যাতে মুসলমানেরা পরস্পর গলাগলি হয়ে যায় এবং নিজেদের মধ্যেকার অনৈক্য দূর হয়ে যায়।"

হযরত আমর ইবনে আস (রা) বললেন, আপনার বক্তব্যের সাথে আমি পুরোপুরি একমত। উত্তম এই মনে হচ্ছে যে, যা আমাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে তা লেখক লিখে যাক। কেননা যে বিষয় লেখা হয়ে যায় তাতে ভুল-ক্রটি হতে পারে না। হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। লেখক ডাকা হলো। তাঁকে নির্দেশ দেয়া হলো যে, তিনি কেবল তা-ই লিখবেন যাতে উভয়পক্ষ একমত হয়।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) ও আমর ইবনে আস (রা) লেখককে বললেন, লিখুন ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এ সে সিদ্ধান্ত যাতে আবু মূসা আবদুল্লাহ ইবনে কায়স ও আমর ইবনে আস পরস্পর একমত হয়েছে। আমরা স্বীকারোক্তি করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ উপাসনার যোগ্য নয়, কেউ তাঁর শরীকও

নয়। মুহাম্মদ (স) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে হেদায়েত ও হক দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যাতে তিনি তার সত্যতার কারণে তাকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করে দেন যদিও তা মুশরিকদের নিকট অপছন্দনীয় হয়।

আমর ইবনে আস ঃ আমরা উভয় স্বীকারোক্তি করছি যে, আবু বকর রাসূলুল্লাহ (স) এর খলীফার ছিলেন। তিনি আজীবন আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহর সুন্নত অনুযায়ী উপর কার্য করেছেন এবং নিজের দায়িত্বসূহ সঠিকরূপে পালন করেছেন।

আবু মূসা (লেখকের প্রতি) ঃ সঠিক আছে, লিখুন।

আমর ইবনে আস ঃ এ-ও স্বীকারোক্তি করছি যে, উমরও রাসূলুল্লাহ (স) এর খলীফার ছিলেন। তিনিও হযরত আবু বকর (রা) এর কর্মপদ্ধতি বহাল রাখেন।

আবু মূসা ঃ এ-ও সঠিক। লিখুন।

আমর ইবনে আস ঃ এ-ও স্বীকারোক্তি করছি যে, উমরের পর উসমান মুসলমানদের ঐক্যমত ও সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ ও তাদের সন্তুষ্টিতে খেলাফত পদে অধিষ্ঠিত হন এবং তিনি সত্য ও পরিপক্ক মুসলমান ছিলেন।

আবু মূসা ঃ এ প্রশ্ন আলোচ্য বিষয় নয়।

আমর ইবনে আস ঃ আপনি যদি তাঁকে মুমীন না মানেন তাহলে কি তিনি কাফের ছিলেন?

আবু মূসা ঃ আচ্ছা লিখুন।

আমর ইবনে আস ঃ এখন দুটিই কথা। হয়তো তাকে জালেম হিসাবে হত্যা করা হয়েছে, অথবা মজলুম হিসাবে হত্যা করা হয়েছে।

আবু মূসা ঃ তাঁকে মজলুম হিসাবেই হত্যা করা হয়েছে।

আমর ইবনে আস ঃ যাকে মজলুম হিসাবে হত্যা করা হয়েছে, আল্লাহ তার অলীকে হত্যাকারীদের থেকে বদলা দাবী করার অধিকার দিয়েছেন।

আবু মূসা ঃ হ্যাঁ দিয়েছেন।

আমর ইবনে আস ঃ আপনি জানেন যে, মুআবিয়াই উসমানের নিকটতম অলী।

আবু মূসা ঃ এ-ও সঠিক।

আমর ইবনে আস ঃ তাহলে সেক্ষেত্রে মুআবিয়ার এ অধিকার রয়েছে যে, তিনি উসমান হত্যাকারীদের দাবী করবেন, তারা যেই হোক, যেখানেই থাকুক এবং এ কাজে কোন কিছুই ছেড়ে দেবেন না।

আবু মূসা ঃ এ-ও সঠিক।

আমর ইবনে আস ঃ (লেখকের প্রতি) এ কথাগুলো লিখুন।

www.e-ilm.weebly.com

আবু মূসা ঃ হে আমর! এ বিরোধ মুসলিম উম্মাহর জন্য বিরাট বিপর্যয়। এমন কোন পন্থা চিন্তা করুন যাতে এ বিপদ থেকে রেহাই পাওয়া যায় এবং জাতের কল্যাণের উপায় সৃষ্টি হবে।

আমর ইবনে আস ঃ এমন কি পন্থা হতে পারে?

আবু মূসা ঃ আমার দৃঢ়বিশ্বাস ইরাকীরা মুআবিয়াকে পছন্দ করবে না। আবার শামীয়রা কখনও আলী (রা) এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে না। অতএব, দুজনকেই এ পদ থেকে অপসারণ করে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরকে খলীফার করা হোক।

আমর ইবনে আস ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর কি এ পদ গ্রহণ করবেন?

আবু মূসা ঃ আশা করা যায়, তবে এ শর্তে যে, সকল মুসলমান একমত হয়ে তাঁকে অনুরোধ করবে।

আমর ইবনে আস ঃ সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে কেন নির্বাচন করা হবে না?

আবু মূসা ঃ তিনি যথোপযুক্ত নন।

এরপর আমর ইবনে আস (রা) আরো কতিপয় মনীষীর নাম উল্লেখ করলেন। কিন্তু আবু মূসা (রা) অসম্মতি প্রকাশ করতে লাগলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ব্যতীত আর কারো প্রতি সম্মত হলেন না। এ পর্যন্ত এসে কথাবার্তা শেষ হয়ে গেল এবং যা কিছু সিদ্ধান্ত হলো তাতে উভয়পক্ষের স্বাক্ষর নেয়া হলো।

এ সিদ্ধান্তের সারকথা বের হলো এই যে, হযরত আলী (রা) ও হযরত মুআবিয়া (রা) এর অপরাসরণে তো উভয় পক্ষের ঐকমত্য হলো। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত হলো না যে, এ পদ কাকে ন্যস্ত করা হবে। অতএব এ কাজটি উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার সাধারণ মতামতের উপরে ন্যস্ত করা হলো। যা কিছু প্রস্তাব লেখা হয়েছিল, তা সাধারণ সমাবেশে পাঠ করে শোনানো হলো এবং উভয়পক্ষ নিজ নিজ স্থানে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

এ ফয়সালা হযরত মুআবিয়া (রা) এর জন্য উপকারী হলো। এর আলোকে হযরত আলী (রা) ও হযরত মুআবিয়া (রা) একই স্তরে এসে গেলেন। তাছাড়া যেহেতু তাঁর পক্ষে পুরো শামবাসীর সমর্থন ছিল এবং খলীফা নির্বাচনের বিষয় সাধারণের মতের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল, সে কারণে তাঁর খেলাফত পদ হাসিলের আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপযুক্ত সুযোগ অর্জিত হলো। পক্ষান্তরে হযরত আলী (রা) এর জন্য এ ফয়সালা ছিল ক্ষতির কারণ। রাসূলের মদীনার বায়আত যা তাঁর জন্য বিরাট দলিল ছিল,তাএ ফয়সালার আলোকে বাতিল হয়ে গেল এবং

এ মাসউদীর বর্ণনা। অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, হযরত আবু মূসা আশআরী ও হযরত আমর ইবনে আস-এর এ কথাবার্তা লিপিবদ্ধ হয়নি। উভয়ে আলাপ আলোচনার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, হযরত আলী ও হযরত মুআবিয়া উভয়কে অপসারিত করা হোক এবং উম্মতকে এখতিয়ার দেয়া হোক, তারা নুতন ভাবে যাকে ইচ্ছা খলীফার নির্বাচন করবে। উভয় সালিস এ ফয়সালার ঘোষণা

www.e-ilm.weebly.com

পরবর্তী নির্বাচনে সাফল্য লাভে অতিরিক্ত সমস্যা ছিল। শামীয়রা তো তাঁর বিরোধী ছিলই। ইকারীদের সমর্থনও সালিসি মেনে নেবার কারণে বিভক্ত হয়ে গেল। খারেজীরা, যারা সালিসির ঘোষণা দানের পূর্বে স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল, তারা পূর্ণ শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করলো এবং তাঁর জন্য বিষাক্ত সাঁপে পরিণত হলো। আমর ইবনে আস (রা) নিজ দলসহ শাম পৌছে হযরত মুআবিয়া (রা) কে খেলাফতের মোবারকবাদ দিলেন। শামীয়রা তাঁর হাতে বায়আত করে তাঁকে 'খলীফাতুল মুসলিমীন' উপাধীতে ডাকা শুরু করে দিল।

হযরত আলী (রা) এ ফয়সালার কথা জানতে পেরে তা মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন ঃ 'যেহেতু সালিস দুজন কিতাব ও সুন্নাহ মোতাবেক ফয়সালা করার শর্ত পূরণ করেননি, অতএব, এ গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি কূফার জামে মসজিদে এক খুতবা দিলেন এবং শামদেশে আবার আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন।

করার জন্য সাধারণ সমাবেশে এলেন। প্রথমে হযরত আবু আশআরী (রা) ঘোষণা করলেন ঃ "আমরা হযরত আলী (রা) ও হযরত মুআবিয়া উভয়কে অপসারিত করছি এবং পরবর্তী খলীফার নির্বাচনের অধিকার উম্মতের উপর ন্যস্ত করছি।

অতঃপর হযরত আমর ইবনে আস (রা) এলেন এবং বললেন ঃ "হযরত আলীর (রা) অপসারণের বিসয়ে আমি আবু মূসার সাথে একমত। কিন্তু মুআবিয়াকে আমি অপসারণ করবো না। আমি তাঁকে এ পদে বহাল রাখছি।"

আমর ইবনে আসের এ ঘোষণা সমাবেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো এবং দুসালিসের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হলো। বস্তুতঃ নিম্নলিখিত কারণে উপরোক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয় ঃ

(১) 'সালিসিনামা' লিপিবদ্ধকরণ ও তাতে যথারীতি সাক্ষী রাকার বিয় সকল ঐতিহাসিকই বর্ণনা করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, 'সালিসিনামা' লিপিবদ্ধ করা হবে অথচ মুল ফয়সালা মৌখিক থাকবে।

(২) আমর ইবনে আসের এ ধূর্তামি ও মিথ্যাচারের কি অর্থ থাকতে পারে? তিনি যা কিছু বলেছেন তা নিজে মত প্রকাশ করেছেন মাত্র। তিনি তা হযরত আবু মুসার (রা) প্রতি আরোপ করেননি। অথচ গৃহীত শর্ত মোতাবেক শুধুমাত্র সর্বসম্মত ফয়সালাই গ্রহণযোগ্য ছিল একজন সালিসের মত নয়।

(৩) এ বর্ণনা প্রসঙ্গে ঘোষণা দানের পর সালিস দুজনের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে, হযরত আবু মূসা (রা) বলেন ঃ আপনার দৃষ্টান্ত কুকুরের ন্যায়, তার উপরে বোঝা চাপালেও হাঁপাতে থাকে, না চাপালেও হাঁপাতে থাকে।

আমর ইবনে আস (রা) জবাব দিলেন ঃ 'আপনার দৃষ্টান্ত গাধার মত যে শুধু বোঝা বহন করে।

স্পষ্টতই এ শব্দগুলো এমন যে, কোন সাহাবী, বিশেষ করে হযরত আবু মূসা, আশআরীর প্রতি তা আরোপ করতে অন্তরে সায় দেয় না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

www.e-ilm.weebly.com

খারেজীদের বিশৃঙ্খলা

হযরত আলী (রা) শামদেশ আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। ইতোমধ্যে খারেজীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। তারা বলতে লাগলো– আমরা হযরত আলী (রা) কে সালিসি প্রত্যাখ্যান করতে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি তা মানেননি। এখন তিনি সালিস দুজনের ফয়সালা কিতাব ও সুন্নাহর পরিপন্থী বলে বর্ণনা করছেন এবং আমরা যা বলেছিলাম তা স্বীকার করছেন। অতএব তাঁর উচিত সালিসি মেনে নেবার গুনাহ্ স্বীকার করে তা থেকে তওবা করা। তিনি যদি এরূপ করেন তাহলে আমরা তাঁর সঙ্গ দেবো। নইলে আমরা তাঁর মোকাবেলা করবো। তাঁরা আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্হাবকে নেতা নির্বাচিত করলো এবং কূফা থেকে বেরিয়ে গিয়ে নাহরাওয়ান সেতু নামক স্থানে গিয়ে একত্রিত হলো। এখানে তারা বসরা, আনবার ও মাদায়েন থেকে নিজেদের সমমনা লোকদের আহ্বান জানালো এবং নিজেদের দল খুব মজবুত করলো। খারেজীরা তাদের আকীদা খুব জোরেশোরে প্রচার শুরু করে দিল। তারা যিম্মীদের কোনরূপ উত্যক্ত করতো না এবং বলতো, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (স) এর দায়িত্ব পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু কোন মুসলমান তাদের সাথে একমত নাহলে তাকে ক্ষমা করতো না বরং তাকে মুরতাদ সাব্যস্ত করে হত্যা করে ফেলতো।

আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাব নামে জনৈক সম্মানিত ব্যক্তি তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তারা তাঁকে ধরলো এবং বললো, আপনার গলায় ঝুলানো এ কুরআন শরীফ আপনাকে হত্যার নির্দেশ দিচ্ছে। আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাব বললেন, ভাই আমি তো মুসলমান। এই বলে তিনি নিজের নাম বললেন। খারেজীরা বললো, 'আমাদের এমন একটি হাদীস শোনান যা আপনার পিতার সনদে আপনার কিনট পৌঁছেছে। আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাব বললেন, আমার পিতা রাসূলুল্লাহ (স) থেকে শুনেছেন যে, তিনি বলেন ঃ

'এমন এক ফিতনা প্রকাশ পাবে যাতে মানুষের অন্তর মরে যাবে যেমন তার শরীর মরে যায়। মানুষ রাতে মুমিন হয়ে ঘুমোবে আর সকালে কাফের হয়ে উঠবে। এরূপ ফিতনায় নিহত হবে, হত্যাকারী হবে না।'

খারেজীরা বললো, হযরত আবু বকর ও উমর সম্পর্কে আপনার মত কি? আবদুল্লাহ তাঁদের প্রশংসা করলেন। খারেজীরা বললো, আপনি হযরত উসমানের প্রাথমিক যুগ সম্পর্কে কি বলেন? আবদুল্লাহ তাঁকেও ভালো বললেন। খারেজীরা বললো, আচ্ছা আলী (রা) সম্পর্কে তাঁর সালিসি মেনে নেবার পূর্বে ও পরে আপনার কি মত? আবদুল্লাহ বললেন, আলী তোমাদের চেয়ে কিতাবুল্লাহ অধিক অনুধাবনকারী ও আমলকারী। খারেজীরা বললো, ব্যস, আপনি হেদায়েত থেকে

www.e-ilm.weebly.com

দূরে ও ব্যক্তিত্ব পূজায় লিপ্ত। অতঃপর তারা আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাবকে নদীর তীরে নিয়ে গিয়ে জবাই করে দিল এবং তার গর্ভবতী স্ত্রীর পেট চিরে তাকেও শহীদ করে দিল। তাদের অভ্যন্তরীণ জঘন্যতার অবস্থা ছিল এই। পক্ষান্তরে তাদের বাহ্যিক তাকওয়ার অবস্থা ছিল এই যে, জনৈক খ্রিস্টানের কাছে তারা খেজুর কিনতে চাইল। খ্রিস্টান লোকটি বললো, আপনারা নিয়ে নিন। আপনাদের নিকট থেকে মূল্য নেবো না। খারেজী বললো, আমরা মূল্য পরিশোধ না করে আপনার খেজুর নেবো না। এক খারেজী একটি খেজুর মুখে দিয়েছিল। অন্য সবাই চিৎকার করে উঠলো এবং তার মুখ থেকে সেটি বের করে ছাড়লো।

এক খারেজীর সামনে দিয়ে একটি শুকর যাচ্ছিল। সে সেটি মেরে ফেললো। এতে অন্য খারেজীরা তাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো এই বলে যে, তুমি আল্লাহর জমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাও। চালচলন এমন ছিল যে, তারা লম্বা জামা পরিধান করতো, দীর্ঘ সময় ধরে নামায আদায় করার কারণে কপালে দাগ পড়ে গিয়েছিল এবং কনুইসমূহ উঁচু নীচু হয়ে গিয়েছিল। (বিদায়া৭খ,২৮৭;ইতমাম ২৩৯)

নাওরাওয়ান যুদ্ধ

হযরত আলী (রা) শাম দেশ আক্রমণে বিলম্ব করতে চাইছিলেন না। কিন্তু যখন খারেজীদের এ সকল অত্যাচারের সংবাদ পেলেন, তখন তাঁর সাথীরা বললেন। আমীরুল মুমিনীন, প্রথমে এ ফিতনা নির্মূল করুন। এমন যেন না হয় যে, আমরা শাম আক্রমণ করবো আর তারা আমাদের পরিবার পরিজনদের মেরে ফেলবে। হযরত আলী (রা) এ মত সমর্থন করলেন এবং নিজ বাহিনী নিয়ে নাহরাওয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

নাহরাওয়ান পৌঁছে হযরত আলী (রা) খারেজীদের থেকে এক ক্রোশ দূরে অবস্থান গ্রহণ করলেন। তিনি কায়স ইবনে সা'দ ইবনে উবাদা ও হযরত আবু আইয়ুব আনসারীকে তাদের নিকট পাঠালেন যেন তাঁরা তাদেরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হলো। খারেজীরা নিজেদের মতে অটল রইলো। তখন হযরত আলী (রা) তাদের নিকট বার্তা পাঠালেন ঃ

" তোমাদের দলের যারা ইবনে খাব্বাব ও অন্য মুসলমানদের শহীদ করেছে, তাদেরকে আমার নিকট সোপর্দ করো। আমি শুধুমাত্র তাদেরকে আমাদের ভাইদের হত্যার বদলায় হত্যা করবো এবং এক্ষুনি তোমাদেরকে ছেড়ে শাম অভিযানে চলে যাবো। সম্ভবতঃ আমার ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের অন্তর ঘুরিয়ে দেবেন এবং তোমরা দ্বিতীয়বার হেদায়াত কবুল করবে।"

কিন্তু খারেজীরা জবাব দিল, আমরা সবাই আপনার ভাইদের হত্যা করেছি এবং আমরা সবাই আপনার ও আপনার সমবিশ্বাসীদের হত্যা করা জায়েজ মনে করি।"

www.e-ilm.weebly.com

হযরত আলী (রা) এর সামনে মোকাবেলা ব্যতীত কোন উপায় রইলো না। তিনি নিজ সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধনীতি অনুযায়ী বিন্যস্ত করলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি যথাসম্ভব রক্ত ঝরানো এড়াতে চাইছিলেন, সেজন্য তিনি হযরত আবু আইয়ুব আনসারীকে সাদা পতাকা দিয়ে পাঠালেন এবং ঘোষণা করিয়ে দিলেন যে, যে ব্যক্তি এ পতাকার নিচে আশ্রয় নিবে অথবা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে কূফা বা মাদায়েন চলে যাবে, আমরা তাকে কিছু বলবো না। এ ঘোষণা শুনে খারেজীদের দল থেকে ফরওয়া ইবনে নওফল পাঁচশত লোকসহ বেরিয়ে এল এবং বন্দঞ্জীনের রাস্তা অবলম্বন করলো। কিছুসংখ্যক কুফা চলে গেলে। এবং কিছুসংখ্যক হযরত আলী (রা) এর বাহিনীতে এসে যোগ দিল। এখন খারেজীদের দলে মাত্র দুই হাজার আটশত লোক রয়ে গেল।

দু বাহিনীর মোকাবেলা হলো। খারেজীদের এ ছোট দলটি অত্যন্ত দুঃসাহসের সাথে লড়াই করলো। সকল বড় বড় সর্দার ও অধিকাংশ সৈন্য হায়দারী তলোয়ারের শিকার হলো। যারা অবশিষ্ট ছিল তারা আহত হয়ে বন্দী হলো।

তাদের বীরত্ব এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, জনৈক খারেজী সর্দার শুরায়হ ইবনে আবী আওফার এক পা কেটে যায়। সে এক পায়ে দাঁড়িয়ে তলোয়ার চালাতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, উট খুঁটিতে বাঁধা থেকেও তার উটনীকে হেফাজত করে। অবশেষে কায়স ইবনে সা'দ তার কর্ম সাঙ্গ করে দেন।

লড়াই শেষে হযরত আলী (রা) আহতদেরকে তাদের আত্মীয়দের নিকট চিকিৎসা জন্য সোপর্দ করেন। এদের সংখ্যা ছিল চারশো। নিহতদের ঘোড়া ও হাতিয়ার নিজ সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। এছাড়া তাদের অন্যান্য জিনিসপত্র তাদের ওয়ারিছদের নিকট অর্পণ করে দিলেন।

খিররীত ফিতনা

নাহরাওয়ানের এ শোচনীয় পরাজয়ের পর যদিও খারেজীদের শক্তি ভেঙ্গে যায়, তথাপি তারা স্থানে স্থানে ফিতনা ফাসাদে লিপ্ত রইলো এবং হযরত আলী (রা) কে স্বস্তির শ্বাস নিতে দিল না। খিররীত ইবনে রাশেদা নাজী বনু নাজিয়ার তিনশত লোক সাথে নিয়ে 'বিধান একমাত্র আল্লাহর'-এর দাওয়াত দেয়া শুরু করলো এবং দেশের বিভিন্ন অংশে হত্যা ও লুটতরাজ করতে লাগলো। হযরত আলী (রা) তাদের নির্মূল করতে যিয়াদ ইবনে হাফসাকে পাঠালেন। নাদার নামক স্থানে খিররীতের সাথে যিয়াদের মোকাবেলা হলো। সারাদিন লড়াই অব্যাহত রইলো। রাতের অন্ধকারে খিররীত তার অবশিষ্ট সাথীদের নিয়ে পালিয়ে গেল। যিয়াদ বসরা ফিরে এলেন এবং হযরত আলী (রা) কে সব ঘটনা জানালেন। হযরত আলী (রা) মা'কিল ইবনে কায়সকে চার হাজার সৈন্য দিয়ে খিররীতের

www.e-ilm.weebly.com

পশ্চাদ্ধাবন করতে পাঠালেন। মাকিল খিররীতকে রামাহরমুজের পাহাড়ে ধরলেন। খিররীত নিহত হলো এবং তার সাথীরা কেউ কেউ নিহত হলো অবশিষ্টরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

খিররীত ব্যতীত অন্যান্য খারেজী সর্দাররাও স্থানে স্থানে ফিতনাবাজী অব্যাহত রাখলো এবং হযরত আলী (রা) কখনও তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি।

কুফীয়দের শাম আক্রমণ অনীহা

নাহরাওয়ান যুদ্ধ সেরে হযরত আলী (রা) নিজ বাহিনীকে শামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে নির্দেশ দিলেন। সেনানায়করা বললো, আমীরুল মুমিনীন! আমাদের তীরদান শূন্য হয়ে গিয়েছে। আমাদের তলোয়ার মুড়িয়ে গিয়েছে এবং আমাদের বর্শাগুলো ভেঙ্গে গিয়েছে। আমাদেরকে কূফা যাবার অনুমতি দিন যাতে আমরা সাজ-সরঞ্জাম ঠিক করে নিতে পারি এবং নব উদ্যমী সাথীদের সাহায্য লাভ করতে পারি। হযরত আলী (রা) তাদেরকে নিয়ে ফিরে এলেন এবং নাখীলা নামক স্থানে অবস্থান করলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, সৈন্যরা নাখীলায়ই যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করবে, শহরে (কূফা) প্রবেশ করবে না। তাঁর নির্দেশ তাঁর সঙ্গীরা মানলো না এবং তারা এক এক করে সরে পড়তে লাগলো। তাঁর সাথে রয়ে গেল অতি সামান্য সংখ্যক সৈন্য। হযরত আলী (রা) অবস্থা দেখে বাধ্য হয়ে নিজেও কূফায় চলে এলেন। কিছুদিন পর তিনি কূফার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন যে, এখন শাম আক্রমণের ব্যাপারে আপনাদের অভিপ্রায় কি? তারা টালবাহানা শুরু করে দিল এবং বিভিন্ন অজুহাত খাড়া করতে লাগলো। হযরত আলী (রা) জোরালো বক্তৃতা দিয়ে তাদের অন্তর উত্তপ্ত করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁদের কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। বাধ্য হয়ে তিনি শামের ইচ্ছা মুলতবী করে দিলেন।

মিসরের ঘটনাবলী

খেলাফতের বায়আত গ্রহণের পর হযরত আলী (রা) কায়স ইবনে সা'দ ইবনে উবাদাকে মিসরের ওয়ালী করেছিলেন। কায়স একজন প্রভাবশালী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কর্মকৌশলের মাধ্যমে অতি শ্রীঘ্র অধিকাংশ মিসরবাসীকে হযরত আলী(রা) এর বায়আতে রাজী করিয়েছিলেন। শুধুমাত্র খুরতইবনে এলাকার লোকেরা মাসলামা ইবনে মাখলাদ আনসারী ও মুআবিয়া ইবনে খাদীজের নেতৃত্বে বায়আত থেকে বিরত রইলো। কায়স ইবনে সা'দ সাময়িক কল্যাণের খাতিরে তাদের নিকট বার্তা পাঠান যে, আমি তোমাদের কিছু বলবো না। তবে শর্ত থাকে যে, তোমরা শান্তি-শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না। খুরতুবার লোকেরা এ শর্ত মেনে নিল।

www.e-ilm.weebly.com

হযরত মুআবিয়া কায়স ইবনে সা'দের যোগ্যতা ও পারদর্শিতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। হযরত আলী (রা) যখন উটযুদ্ধ সারলেন এবং সিফফিনের প্রস্তুতি শুরু করলেন তখন তিনি মিসরের ব্যাপারে খুব চিন্তিত হলেন। তিনি আশঙ্কা করলেন যে, এমন যদি হয় যে, ইরাকের দিক থেকে হযরত আলী (রা) আক্রমণ করবেন আর মিসর থেকে কায়স, তাহলে তিনি যাঁতার দুপাটার মাঝে পড়ে নিস্পেষিত হবেন। এ আশঙ্কা থেকে মুক্ত হবার জন্য তিনি পত্রাদি লিখে কায়সকে নিজের সাথে মিলাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হযরত মুআবিয়া এ প্রচেষ্টায় সফল হতে পারলেন না।

এ সময়েই হযরত আলী (রা) কায়সকে লিখলেন যে, খুরতইবনে বাসীর নিকট থেকে বায়আত গ্রহণ করা হোক। নইলে যুদ্ধ করা হোক। কায়স বুঝতে পারছিলেন যে, এ সময় বোলতার ঝাঁকে ঘা না দেয়া শ্রেয়। তিনি হযরত আলী (রা) কে জবাব দিলেন ঃ

"খুরতুবাবাসী আনুগত্য ও মান্যতার জীবন-যাপন করছে। তারা আপনার বিরোধী নয়। এ সময় সমীচীন হবে তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেয়া।"

হযরত আলী (রা) এর নিকট কায়সের এ পত্র এসে পৌছুলে তাঁর কোন কোন উপদেষ্টা তাঁকে বললেন, 'মনে হচ্ছে কায়স মুআবিয়া (রা) এর সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করেন। এ কারণেই তিনি আপনার বিরোধীদের সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত নন।' হযরত মুআবিয়া (রা)এর নিকট এ সংবাদ পৌছুলে তিনি তৎক্ষণাৎ এ সংবাদ কাজে লাগালেন। তিনি প্রচার করা শুরু করলেন যে, কায়স আমাদের লোক। খুরতুবাবাসীদের সাথে তাঁর সদ্ব্যবহার আমাদের জন্য মূল্যবান। হযরত আলী (রা) এর গোয়েন্দারা এ সংবাদ তাঁর নিকট পৌছালো। হযরত আলী (রা) কায়স বিন সাদকে অপসারণ করে তাঁর স্থানে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে মিসরের ওয়ালী নিয়োগ করেন। এ ঘটনা সিফফীন যুদ্ধের পূর্বেকার।

মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর একজন যুবক ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মিসর পৌছে খুরতুবাবাসীর সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। সিফফীনের যুদ্ধের সময় তিনি খুরতুবাবাসীদের নিয়েই ব্যস্ত রইলেন এবং হযরত আলী (রা) কে কোনরূপ সাহায্য করতে পারল না। সিফফীন যুদ্ধ থেকে অবসর হয়ে হযরত আলী (রা) কূফায় ফিরে এসে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকরের নিকট থেকে মিসরের প্রশাসন ফিরিয়ে নেবার ইচ্ছা করলেন। সেমতে তিনি তাঁর বাহিনীর কর্মঠ বীর সেনানায়ক মালেক ইবনে আশতার নাখঈকে মিসরের ওয়ালী করে পাঠান। আশতার নাখই মিসরের পথে থাকতেই তার ইন্তেকাল হয়। কথিত আছে যে, হযরত মুআবিয়া (রা) এর ইঙ্গিতে আশতারকে বিষ প্রয়োগ করা হয়। ইবনে কাছীর (রহ) হযরত মুআবিয়া (রা) এর এ পদক্ষেপের এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, তিনি আশতারকে হযরত উসমান (রা) এর হত্যাকারীদের অন্তর্গত হওয়ায় হত্যাযোগ্য মনে করতেন।

www.e-ilm.weebly.com

আশতারের ইন্তেকালে হযরত আলী (রা) খুব ব্যথিত হলেন। এখন তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকেই মিসরের ওয়ালীরূপে বহাল রাখলেন এবং তাঁকে লিখলেন যে, আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে অব্যাহতি দান করিনি বরং মিসরের অবস্থাদি সংশোধন উদ্দেশ্য ছিল। এখন যেহেতু সে পরকালে পাড়ি জমিয়েছে, তুমি নিজ দায়িত্ব প্রচেষ্টা ও বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করতে থাকো। মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরের নিকট তার মিসর থেকে অব্যাতি খুবই মনঃকষ্টের কারণ হয়েছিল। কিন্তু আশতারের আকস্মিক মৃত্যু ও হযরত আলী (রা) এর সান্ত্বনায় তার মনস্থির হয়ে গেল। তিনি লিখে পাঠালেন যে, আমি আমীরুল মুমিনীনের আজ্ঞাবহ। তাঁর শত্রুদের বিরোধী ও বন্ধুদের সমর্থক আমার চেয়ে অধিক কেউ হতে পারে না।এ ঘটনা দু সালিসের ফয়সালা শোনানোর পূর্বেকার।

দু সালিসের ফয়সালার পর হযরত মুআবিয়া (রা) যখন যথারীতি শাসকত্বের ঘোষণা দিলেন, তখন তিনি মিসরে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি প্রথমে খুরতইবনেসীদের সাথে পত্রাদির মাধ্যমে যোগাযোগ করে তাদের সাহস দিলেন এবং তাদের আশ্বাস দিলেন যে আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য বিরাট সেনাবাহিনী পাঠাবো। খুরতুবাবাসী হযরত মুআবিয়া (রা) এর এ প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলো।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর ছয় হাজার সৈন্যের এক বাহিনী মিসর বিজয়ী হযরত আমর ইবনে আস (রা) নেতৃত্বে মিসর অভিমুখে রওয়ানা করলেন। তিনি আমর ইবনে আস (রা) কে পরামর্শ দিলেন যে, তিনি যেন যথাসম্ভব নমনীয়ত ও হৃদ্যতার সাথে কার্য হাসিল করেন। প্রথমে বিরোধীদের সন্ধি ও ঐক্যের দাওয়াত দেবে। যদি তারা অস্বীকার করে, তাহলে কেবল তাদের সাথে লড়াই করবে যারা মোকাবেলার জন্য ময়দানে আসবে। অন্যদের কোনরূপ উত্যক্ত করবে না। সেই সাথে হযরত মুআবিয়া মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরের নামে একখানা পত্র পাঠালেন। এতে তিনি তাকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি যদি মোকাবেলা না করেন তাহলে তার কোনরূপ ক্ষতি হবে না। মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর হযরত মুআবিয়া (রা) কে রূঢ় ভাষায় উত্তর দেন। অতঃপর সকল বৃত্তান্ত হযরত আলী (রা) কে অবহিত করেন এবং তাঁর নিকট আর্থিক ও সৈন্য সাহায্য কামনা করনে। হযরত আলী (রা) জবাব দিলেন যে, তিনি যেন ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে শত্রুর মোকাবেলা করতে থাকেন। তিনি শীঘ্র তাঁর জন্য সাহায্য প্রেরণেরও আশ্বাস দেন।

আমর ইবনে আস (রা) নিজ বাহিনী নিয়ে মিসরে প্রবেশ করলে পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী খুরতুবার দশ হাজার উসমানী যোদ্ধা তাঁর সাথে যোগ দেয়। এভাবে তাঁর বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াল ষোল হাজার।

www.e-ilm.weebly.com

মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর কিনানা ইবনে বাশীরের নেতৃত্বে দুই হাজার সৈন্যের এক বাহিনী শাম বাহিনীর মোকাবেলার জন্য পাঠালেন এবং নিজে আরো সৈন্য সংগ্রহে লিপ্ত হলেন। কিনানা ইবনে বাশীর অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করেন।

প্রথমে শামীয়রা পরাজিত হয়। কিন্তু খুরতুবীয়দের সাহায্যে সে পরাজয় জয়ে রূপান্তরিত হয়। কিনানা ইবনে বাশীর যুদ্ধ ময়দানে নিহত হন। তাঁর সাথীদের কিছু সংখ্যক শহীদ হয়, আর কিছু পলায়ন করে।

মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রাঃ) দুই হাজার সৈন্যের আরেক বাহিনী নিয়ে আমর ইবনে আস (রা) এর মোকাবেলার জন্য রওয়ানা হচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর নিকট কিনানা ইবনে বাশীর নিহত ও পরাজিত হবার সংবাদ পৌঁছুলো। এ সইবনেদে তাঁর সাথীদের মধ্যে এমন ভীতির সঞ্চার হলো যে, সবাই তাঁকে ছেড়ে পলায়ন উদ্যত হলো। মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রাঃ) নিরাশ হয়ে গেলেন এবং জীবন বাঁচানোর জন্য তিনি একটি পরিত্যক্ত বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। মুআবিয়া ইবনে খাদীজ তাঁর অনুসন্ধানে বের হলো এবং কতিপয় কিবতীর মাধ্যমে তাঁকে জীবিত গ্রেফতার করলো। আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) শাম বাহিনীতে শামিল ছিলেন। তিনি আমর ইবনে আস (রা) কে অনুরোধ করেছিলেন যে, আমার ভাইকে যেন হত্যা করা না হয়। আমর ইবনে আস (রা) মুআবিয়া ইবনে খাদীজের নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও, তাকে হত্যা করবে না। কিন্তু মুআবিয়া বলে পাঠালো যে, মুহাম্মদ উসমান হত্যাকারীদের অন্যতম। আমি তাঁকে কখনই ছাড়বো না। সেমতে মুআবিয়া ইবনে খাদীজ মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ করে দেয়।

হযরত আয়েশা (রা) এর নিকট ভাই মুহাম্মদের শাহাদাতের খবর পৌঁছুলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি আমর ইবনে আস ও মুআবিয়ার জন্য বদদুআ করেন এবং ভাইয়ের সন্তান-সন্ততিকে নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেন।

(বিদায়া নিহায়া ৭খ, ২১৪)

এভাবে হিজরী ৩৮-এ সবুজ শ্যামল ভূমির দেশ মিসর হযরত মুআবিয়ার কর্তৃত্বাধীনে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং হযরত আলী (রা) খারেজীদের বিশৃঙ্খলা ও নিজ বন্ধুদের উদ্যমহীনতার কারণে কিছুই করতে পারলেন না।। তিনি অতি কষ্টে দুহাজার সৈন্যের এক বাহিনী মালেক ইবনে কাব-এর নেতৃত্বে মিসর অভিমুখে রওয়ানা করেন। কিন্তু মালেক রাস্তায় থাকতেই মুহাম্মদের শাহাদাতের সংবাদ পেলেন এবং হযরত আলী (রা) এর পরামর্শ মোতাবেক ফিরে এলেন।

www.e-ilm.weebly.com

বসরার গোলযোগ

মিসর জয়ের পর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে হাযরামীকে বসরায় নিজের পক্ষে প্রচারাভিযান করার জন্য পাঠালেন। উট যুদ্ধের সময় থেকে বসরা হযরত আলী (রা) বিরোধী একটি দল বিদ্যমান ছিল। তারা হায়দারী তলোয়ারের সামনে অবনত মস্তক থাকলেও তাদের অন্তর ছিল হযরত মুআবিয়া (রা) এর সাথে। বসরার ওয়ালী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত আলী(রা) এর নিকট কূফা গিয়েছিলেন। যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান ছিলেন তাঁর ভারপ্রাপ্ত। ইবনে হাযরামীর জন্য এ সুযোগটি ছিল খুব অনুকূল। সেমতে সে বসরায় পৌছে শীঘ্র বনূ তামীম গোত্র ও অন্য মুআবিয়া সমর্থকদেরকে হযরত উসমান (রাঃ)এর হত্যার প্রতিশোধ দাবীতে সোচ্চার করে তুললো। যিয়াদ এ বিশৃঙ্খলা মোকাবেলা করতে পারলেন না। তিনি জীবন বাঁচানোর জন্য আযুদ গোত্রের নিকট আশ্রয় কামনা করেন এবং হযরত আলী (রা) কে এ নতুন বিপদের সংবাদ দেন।

হযরত আলী (রা) আ'য়ান ইবনে যাবীআকে ইবনে হাযরামীর ফিতনা দমন করতে পাঠালেন। কিন্তু ইবনে যাবীআকে ধোকা দিয়ে হত্যা করা হলো। অতঃপর হযরত আলী (রা) জারিয়া ইবনে কাদামা তামীমীকে আরো পঞ্চাশ জন লোক দিয়ে বসরা পাঠালেন যাতে তিনি নজ কওম বনূ তামীমকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ইবনে হাযরামীর ফেতনা থেকে রক্ষা করতে পারেন। জারিয়া ইবনে কাদামা এ অভিযানে সফল হলেন। বনূ তামীম ইবনে হাযরামীর সঙ্গ পরিতাগ করলো। ইবনে হাযরামী তার সত্তরজন সাথীসহ একটি বাড়ীতে আশ্রয় নিল। জারিয়া ইবনে হাযরামীর বাড়ী অবরোধ করলো। প্রথমে তাদেরকে উৎসাহ ও ভীতি প্রদানের মাধ্যমে ফিতনাবাজী থেকে বিরত থাকবার আহ্বান জানালো হলো। কিন্তু তারা যখন বিরত হতে চাইলো না, তখন সে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে তাদেরকে পুড়িয়ে মারা হলো। (বিদায়া নিহায়া ৭খ. ৩১৬)

ইবনে হাযরামী ও তার সাথীদের সাথে এ কঠোর আচরণে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি হলো। এতদিন পর্যন্ত তো ফেতনা ফাসাদের কেন্দ্র ছিল বসরা। এখন এ ফিতনা পারস্য ও কিরমানে ছড়িয়ে পড়লো। তারা কর দিতে অস্বীকার করলো এবং সেখানকার ওয়ালী সাহল ইবনে হানীফকে বের করে দিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)এর পরামর্শক্রমে হযরত আলী (রা) য়িয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে কিরমানের ওয়ালী কুর এ বিদ্রোহ দমনের জন্য রওয়ানা করলেন। যিয়াদ তলোয়ারের পানি দিয়ে বিদ্রোহের আগুনকে ঠাণ্ডা করে দিলেন এবং সেখানে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

www.e-ilm.weebly.com

হযরত মুআবিয়ার (রা) এর বিক্ষিপ্ত আক্রমণ

হযরত মুআবিয়া এ ব্যাপক বিশৃঙ্খলা থেকে ফায়েদা হাসিল করেন। হিজরী ৩৯-এর শুরুতে যখন খেলাফতের অধিকৃত এলাকাগুলোতে ফিতনা ফাসাদের আগুন জ্বলে উঠেছিল এবং আরী প্রেমিকদের উত্তেজনা ও উদ্যম ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল, তখন হযরত মুআবিয়া (রা) বিভিন্ন এলাকায় হিংস্র আক্রমণ শুরু করেন।

তিনি নু'মান ইবনে বাশীরকে দুই হাজার সৈন্যের এক বাহিনী দিয়ে আইনুত তামার অভিমুখে রওয়ানা করেন। এখানে মালেক ইবনে কাব-এর সাথে নু'মানের মোকাবেলা হয়। মালেকের সাথীদের উপর শামীয়দের এমন ভীতি সঞ্চরিত হয়েছিল যে, মাত্র একশত জন ব্যতীত সাবই পালিয়ে গেল। মালেক হযরত আলী (রা) সাহায্য কামনা করেন। হযরত আলী (রা) কূফাবাসীদের একত্রিত করে এক জোরালো ভাষণ দিলেন। কিন্তু তাতে কুফাবাসীর উপর কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। খলীফার দরবার থেকে মালেকের নিকট কোন সাহায্য যেতে পারলো না। তথাপি মালেক তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে বীরেত্বের সাথে নু'মানের মোকাবেলা করতে লাগলেন। অবশেষে মুখাফফাফ ইবনে সুলায়ম তার সাহায্যের জন্য গিয়ে পৌছলেন। নু'মান শাম ফিরে যেতে বাধ্য হলেন।

সুফিয়ান ইবনে আওফকে ছয় হাজার সৈন্যের এক বাহিনী সহ হীত অভিমুখে রওয়ানা করেন। সুফিয়ান হীত পৌছে ময়দান খালি পেলেন। সুফিয়ান আনবার অভিমুখে চললেন। এখানে পাঁচশত লোক মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু একশত লোক ব্যতীত সবাই পালিয়ে গের। এই লোকগুলো তাদের আমীর আশয়াছ নিহত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ত্যাগ করেনি। সুফিয়ান এখান থেকে ধন-সম্পদ ও ভাণ্ডার লুট করে নিয়ে শাম ফিরে যায়।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসআদার নেতৃত্বে একহাজার সাত শতের এক বাহিনী তীমা অভিমুখে প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ তীমাবাসীর নিকট থেকে জোরপূর্ব কর আদায় করতে শুরু করলো। হযরত আলী (রা) মুসায়্যাব ইবনে নাজীহ-এর নেতৃত্বে দু হাজার সৈন্যের এক বাহিনী তার মোকাবেলার জন্য পাঠান। উভয় বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হলো। অবশেষে মুসয়্যাব আবদুল্লাহকে একটি দুর্গে অবরোধ করে তাকে এ শর্তে ছেড়ে দিলেন যে, সে শাম ফিরে যাবে।

যাহহাক ইবনে কায়সের নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনীর বসরার প্রান্ত এলাকায় আক্রমণ করতে পাঠান। হযরত আলী (রা) হুজর ইবনে আদীকে চার হাজার সৈন্যসহ তার মোকাবেলার জন্য পাঠান। উভয় বাহিনীতে সারা দিন লড়াই চললো। রাত হলে যাহহাক শামের পথ ধরলো।

মুআবিয়ার (রা) এ সকল আক্রমণের ফলে তার সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত হয়নি। তথাপি এ ফল অবশ্যই হলো যে, ইসলামী খেলাফতের ভিত দুর্বল হয়ে গেল। হযরত আলীর (রা) অধিকৃত এলাকায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি ছড়িয়ে

www.e-ilm.weebly.com

পড়লো এবং খেলাফত কেন্দ্রের ভাব-গাম্ভীর্য মানুষের মন থেকে দূর হয়ে গেল।

হজ্জের সময়ে হযরত আলী (রা) কাছাম ইবনে আব্বাসকে নিজের পক্ষ থেকে আমীরে হজ্জ করে মক্কা ময়াজ্জমা পাঠান। এদিকে হযরত মুআবিয়া (রা) য়াজীদ ইবনে সাখবারা রহাভীকে তাঁর নিজের পক্ষ থেকে আমীরে হজ্জ করে পাঠান। উভয়ের মধ্যে টানাপোড়েন হলো। অবশেষে ফয়সালা হলো যে, শায়বা ইবনে উসমান ইবনে তালহা হজ্জের নেতৃত্ব দান করবেন। এভাবে খেলাফত শক্তির এ প্রদর্শনস্থলও হযরত আলীর (রা) হাত থেকে চলে গেল।

হিজায ও য়ামানে মুআবিয়া (রা) এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

হিজরী ৪০-এর শুরুতে হযরত মুআবিয়া (রা) বুসর ইবনে আবী আরত্বাতকে তিন হাজার সৈন্যের একবাহিনীসহ হিজায অভিমুখে প্রেরণ করেন। বুসর মদীনা পৌঁছে ইবনো মোকাবেলায় শহর দখল করে নেয়। মদীনার আমেল আবু আইয়ুব মোকাবেলার শক্তি না দেখে হযরত আলী (রা) নিকট কূফায় চলে যান। বুসর মদীনাবাসীর কিনট থেকে জোরপূর্ব বায়আত গ্রহণ করেন। কেউ আপত্তি করলে তার বাড়ীঘর ধ্বংস করে দিল। বুসর মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলতে লাগল।

"আমার শায়খ (হযরত উসমান (রা) আজ কোথায়? কাল তিনি মদীনায় ছিলেন, আজ কোথায়? হে মদীনাবাসী, আল্লাহর শপথ, মুআবিয়া যদি আমার নিকট থেকে অঙ্গীকার আদায় না করতো, তাহলে আমি মদীনার কোন প্রাপ্তবয়স্ক লোককে জীবিত ছাড়তাম না।'

মদীনার পর বুসর মক্কায় পৌঁছুলে সেখানেও সে কোন মোকাবেলা ব্যতীত শহর দখল করলো এবং হযরত মুআবিয়া (রা) এর নামে বায়আত গ্রহণ করলো। মক্কা থেকে বুসর য়ামানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। য়ামানে হযরত আলী (রা) এর পক্ষ থেকে উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ওয়ালী ছিলেন। তিনি সানআ ছেড়ে কুফা চলে গেলেন। বুসর তাঁর দুজন অল্পবয়স্ক সন্তানকে হত্যা করলো। বুসর এখানে আরো অনেক আলী সমর্থককে হত্যা করে। হযরত আলী (রা) এর নিকট বুসরের এসব অত্যাচারের সংবাদ পৌঁছুলে তিনি জারিয়া ইবনে কাদামাকে দুহাজার সৈন্যের এক বাহিনীসহ তার মোকাবেলার জন্য পাঠালেন। জারিয়া নাজরান পৌঁছে সেকানকার উসমান সহায়কদের হত্যা করেন এবং তাদের ঘরে অগ্নিসংযোগ করেন। বুসরের নিকট জারিয়ার আগমনের সংবাদ পৌঁছুলে সে শামের পথ ধরলো। জারিয়া মক্কা পৌঁছে সেখানে হযরত আলী (রা) এর জন্য বায়আতের আহ্বান জানালেন। এ সময়েই আমীরুল মুমিনীন হযরত আলীর (রা) এর শাহাদাতের ঘটনা ঘটে। জারিয়ার অভিযান আর সফল হতে পারলো না।

ইবনে জারীরের বর্ণনা মোতাবেক এ বছরের শেষ দিকে হযরত মুআবিয়া (রা) হযরত আলী (রা) এর নিকট লিখলেন যে, উম্মতের মধ্যে প্রচুর রক্তপাত

www.e-ilm.weebly.com

হয়েছে। আর কতদিন মুসলমানদের রক্ত পানির মত বইতে থাকবে। উত্তম হবে এই যে, উভয়পক্ষ নিজ নিজ অধিকৃত এলাকায় সীমিত থাকবে এবং একে অপরকে উত্যক্ত করবে না। হযরত আলী (রা) হযরত মুআবিয়া (রা) এর সাথে একমত হন এবং দুজনের মধ্যে সন্ধি হয়ে যায়। (বিদায়া নিহায়া ৭ম, ৩২২)

হযরত আলী (রা) এর শাহাদাত

নাহরাওয়ানের ঘটনার পর তিন খারেজী– আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম হিময়ারী বারাক ইবনে আবদুল্লাহ্ তামীমী ও আমর ইবনে বকর তামীমী মক্কায় একত্রিত মিলিত হয়। তিনজনে ইসলামী জগতে গৃহযুদ্ধের কথা উল্লেখ করে অনেকক্ষণ দুঃখপ্রকাশ করতে থাকে। অতঃপর তারা নাহরাওয়ানে নিহতদের স্মরণ করে অশ্রুপাত করলো এবং বললো, ভাইদের মৃত্যুর পর আমাদের জীবনে আর কোন স্বাদ অবশিষ্ট নেই। উত্তম হবে এই যে, আমরা আলী, মুআবিয়া ও আমর ইবনে আসকে ঠিকানায় পাঠিয়ে দেই। তাহলে একদিকে ইসলামী জগতে খুন-খারাবী থাকবে না, অন্যদিকে আমাদের ভাইদের হত্যার প্রতিশোধ নেয়া হবে। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো আবদুর রহমান হযরত আলী (রা) কে, বারাক হযরত মূআবিয়া (রা) কে এবং আমর ইবনে বকর হযরত আমর ইবনে আস (রা) কে শহীদ করবে। ১৭ রমজান হিজরী ৪০ তারিখ এ কাজ সম্পাদনের দিন ধার্য করা হলো।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইবনে মুলজিম কূফা এলো এবং এখানে বনূ রবাব গোত্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলো। এ গোত্র ছিল খারেজী আকীদার। এ গোত্রের কাত্তামা নাম্নী জনৈকা রূপবতী স্ত্রীলোকের প্রতি ইবনে মুলজিম আসক্ত হয়ে পড়লো। সে তাকে বিবাহের পয়গাম দিল। কাত্তামা বললো, তোমার পয়গাম আমি কবুল করবো, তবে এ শর্তে যে, আমিই মহর ধার্য করবো। ইবনে মুলজিম বললো, কি মহর ধার্য করতে চাও? কাত্তামা বললো, তিন হাজার দিরহাম, এক গোলাম, এক বাঁদী ও হযরত আলী (রা) এর শির। ইবনে মুলজিম বললো, আমি নতশিরে মেনে নিলাম। আলী (রা) এর শিরের জন্যই তো আমি কূফা এসেছি। ইবনে মুলজিম ও কাত্তামার বিবাহ হয়ে গেল। উভয়ে মিলে এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কৌশল উপায় চিন্তা করতে লাগলো। ইবনে মুলজিম ও কাত্তামার প্রচেষ্টায় শাবীব ইবনে নাজদাহ্ হারুরী ও দারওয়ান নামে আরো দুজন খারেজী এ চক্রান্তে যোগ দিল।

১৭ই রমজান হিজরী ৪০ রাতে তিনজনে কূফার জামে মসজিদে লুকিয়ে রইলো। ফজরের সময় হযরত আলী (রা) মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং যথারীতি ঘুমন্তদের জাগাতে লাগলেন। শাবীব গুপ্তস্থান থেকে বের হলো এবং হযরত আলী (রা) কে তলোয়ারের আঘাত করলো। তিনি মিহরাবের মধ্যে পড়ে গেলেন। এ সময় ইবনে মুলজিম অগ্রসর হলো এবং হযরত আমীরের মাথায়

www.e-ilm.weebly.com

দ্বিতীয় আঘাত করলো। হযরত আলী (রা) এর দাড়ি রক্তে ভিজে গেল। তিনি চীৎকার করে বললেন, আমার খুনীকে ধরো। শাবীব ও দারওয়ান পালিয়ে গেল। কিন্তু ইবনে মুলজিম ধরা পড়লো। হযরত আলী (রা) কে তাঁর বাড়ীতে আনা হলো। ইবনে মুলজিমকে তাঁর সামনে আনা হলো। তিনি বললেন, আমি যদি মারা যাই, তাহলে এ ব্যক্তিকে হত্যা করবে। আর আমি জীবিত থাকলে আমি নিজে যে শাস্তি সমীচীন মনে করবো, দেবো।

জীবনের আশা যখন আর রইলো না, তখন তিনি পুত্রদের ডাকলেন এবং তাদেরকে তাকওয়া, নেক আমল ও দ্বীনের খেদমতের অসিয়ত করলেন। কেউ বললো– হযরত, আপনার পর আমরা হযরত হাসানের হাতে বায়আত করে নেবো। তিনি জবাব দিলেন, আমি তোমাদের এ আদেশও করি না। এতে নিষেধও করছি না। তোমরা যা ভালো মনে করবে, তা করবে। অবশেষে সেদিনই রাতে রেসালাত আকাশের এ উজ্জ্বল নক্ষত্র অস্তমিত হয়ে গেল। পরযাত্রাকালে তাঁর মুখে ছিল এ আয়াত ঃ 'যে ব্যক্তি বিন্দুসম নেক কাজ করবে তার ফল দেখতে পাবে, আর যে ব্যক্তি বিন্দুসম বদকাজ করবে, তার ফল দেখতে পাবে।' (যিলযাল ৭-৮)

তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। প্রায় ৪ বচর ৯ মাস খেলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর নামাজে জানাজা পড়েন হযরত হাসান (রা)। ইবনে কাছীরের প্রাধান্য প্রদত্ত বর্ণনা মোতাবেক রাজধানী কূফার অভ্যন্তর ভাগে তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত আলী (রাঃ) এর ইন্তেকালের পর হযরত হাসান ইবনে মুলজিমকে ডাকলেন। ইবনে মুলজিম বললো, আমি আলী (রা) এর ন্যায় মুআবিয়াকে (রা)ও হত্যার শপথ করেছি। আমাকে অনুমতি দিলে আমি সে দায়িত্বটুকুও সম্পন্ন করি। আমি ওয়াদা করছি, জীবিত থাকলে আপনার খেদমতে উপস্থিত হবো। হযরত হাসান ইবনে মুলজিমের এ আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে জাফরকে তাকে হত্যার নির্দেশ দিলেন।

ইবনে মুলজিম তার ভ্রান্ত বিশ্বাসে এত দৃঢ় ছিল যে, সে নিহত হবার সময় সূরা আলাক তেলাওয়াত করছিল এবং বলছিল যে, আমি এ সময়ে আমার জিহ্বাকে আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল করতে চাই না।

(কোন কোন শীয়ার ধারণা, হযরত আলী (রা) এর কবর নাজাফে অবস্থিত। আল্লামা ইবনে কাছীর এ ধারণাকে ভিত্তিহীন সাব্যস্ত করেছেন। অতঃপর তিনি খতীব বাগদাদীর বর্ণনা উদ্ধৃত্ত করেছেন যে, নাজাফ যে কবরটিকে হযরত আলী (রা) এর কবর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তা মূলতঃ হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা(রা)। এছাড়াও হযরত আলী (রা) এর কবর সম্পর্কে আরো কতপিয় বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। দেখুন বিদায়া নিহায়া ৭খ. ৩২৯ ও ৩৩০)

www.e-ilm.weebly.com

ইবনে মুলজিমের দ্বিতীয় সাথী বারাক ইবনে আবদুল্লাহ দামেশকে পৌঁছুল এবং সেও ঠিক সেদিনেই মুআবিয়া (রা) ফজরের নামাজ সেরে মসজিদ থেকে বের হবার সময় তাঁর উপর আক্রমণ চালালো। হযরত মুআবিয়া (রা) সাধারণ জখম হলেন এবং শীঘ্র সুস্থ হয়ে গেলেন। বারাক বন্দী হলো এবং তাকে হত্যা করা হলো। এ ঘটনার পর হযরত মুআবিয়া (রা) নিজের মসজিদে একটি কুঠরি করে নেন এবং একজন রক্ষী নিযুক্ত করেন যে তাঁর নামাজের সময় তাঁকে পাহারা দিত।

ইবনে মুলজিমের তৃতীয় সাথী আমর ইবনে বকর মিসরে পৌঁছুলো এবং নির্দিষ্ট সময়ে নিজ কর্তব্য সাধনের চেষ্টা করলো। সৌভাগ্যক্রমে হযরত আমর ইবনে আস (রা) অসুস্থতা বশতঃ মসজিদে আসতে পারেন নি। তাঁর পরিবর্তে খারেজা ইবনে আবু হাবীবা ইমামত করেন। আমর ইবনে বকর খারেজাকে আমর ইবনে আস মনে করে তাঁকে আক্রমণ করে এবং তাঁকে হত্যা করে। আমর ইবনে বকর ধরা পড়ে এবং তাকে হত্যা করা হয়।

আলী (রা) এর পরিবার

হযরত আলী মুরতাযা (রা) সর্বপ্রথম নবী দুলালী খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রা) কে বিবাহ করেন। খাতুনে জান্নাতের গর্ভে তিন পুত্র- হাসান, হুসাইন ও মুহসিন এবং দুই কন্যা জয়নব জ্যেষ্ঠ ও উম্মে কুলসুম জ্যেষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। মুহসিন শৈশবেই ইন্তেকাল করেন। খাতুনে জান্নাত চলে যাবার পর তিনি একাধিক বিবাহ করেন। তাদের থেকে তাঁর সন্তানও জন্মগ্রহণ করেন। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

(১) উম্মুল বানীন বিনতে হারাম ঃ তাঁর গর্ভে আব্বাস, জাফর, আবদুল্লাহ ও উসমান জন্মগ্রহণ করেন।

(২) লায়লা বিনতে মাসউদ তামীমী ঃ তাঁর গর্ভে আবদুল্লাহ ও আবু বকর জন্মগ্রহণ করেন।

(৩) আসমা বিনতে উমায়স ঃ তাঁর গর্ভে য়াহয়া ও মুহাম্মদ কনিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন।

(৪) সাহবা বিনতে রবীআ ঃ তিনি উম্মে অলাদ (সন্তান জন্মদাত্রী বাঁদী) ছিলেন। তাঁর গর্ভে এক পুত্র উমর ও এক কন্যা রুকাইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

(৫) উমামা বিনতে আবুল আস ঃ তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর কন্যা হযরত যয়নবের কন্যা। তাঁর গর্ভে মুহাম্মদ মধ্যম জন্মগ্রহণ করেন।

(৬) খাওলা বিনতে জাফর হানাফিয়া ঃ তাঁর গর্ভে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া জন্মগ্রহণ করেন।

www.e-ilm.weebly.com

৭। উম্মে সাঈদ বিনতে উরওয়া ঃ তাঁর গর্ভে উম্মুল হাসান ও রমলা জ্যেষ্ঠা জন্মগ্রহণ করেন।

৮। মাহয়া বিনতে ইমরুউল কায়স ঃ তাঁর গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন এবং সে কন্যা শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেন।

এছাড়া তাঁর কতিপয় বাঁদীও ছিল। তাদের গর্ভে নিম্নলিখিত সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করেন–উম্মে হানী, মায়মুনা, যয়নব কনিষ্ঠা, রমলা কনিষ্ঠা, উম্মে কুলছুম কনিষ্ঠা, ফাতেমা, উমামা, খাদীজা, উম্মুল কিরাম, উম্মে সালমা, উম্মে জাফার, জামানা, নাফীসা।

ইবনে জারীর তাবারীর বর্ণনামতে, তাঁর ১৪ পুত্র ও ১৭ কন্যা ছিল। ওয়াকিদীর উক্তি অনুসারে তাঁর ৫ পুত্র থেকে বংশ পরম্পরা চালু হয়। তাদের নাম –হাসান (রাঃ), হুসাইন (রাঃ), মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া, আব্বাস, উমর।

www.e-ilm.weebly.com

হযরত হাসান (রা) এর যুগ

নির্বাচন ও মোকাবেলার ইচ্ছা

হযরত আলী মুরতাযা (রাঃ) এর শাহাদাতের পর কুফাবাসী জামে মসজিদে একত্রিত হলো এবং তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হযরত হাসান (রাঃ) এর হাতে বায়আত করলো।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হযরত আলী শাহাদাত ও হযরত হাসান (রাঃ) এর বায়আতের সংবাদ পেয়ে নিজের জন্য পুনরায় বায়আত গ্রহণ করেন এবং ষাট হাজার সৈন্যসহ কূফা অভিমুখে রওয়ানা হন। হযরত হাসান (রাঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর রওয়ানা হবার সংবাদ পেয়ে নিজেও চল্লিশ হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কে প্রতিহত করতে মাদায়েন অভিমুখে যাত্রা করেন।

হযরত হাসান (রাঃ) সাবাত পৌঁছে বিশ্রামের জন্য সেখানে সৈন্যদের অবস্থানের নির্দেশ দিলেন। তিনি এখানে নিজ সৈন্যদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাদের বিস্ময়কর অবস্থা দেখতে পেলেন। তারা তাদের স্বভাবগত ফিতনা প্রিয়তার কারণে সন্ধি পছন্দ করতো না, আবার সাহসহীনতার কারণে মোকাবেলার জন্যও প্রস্তুত ছিল না। তদুপরি তাদের মধ্যে ছিল মতের গড়মিল। তিনি তাদের এ অবস্থা দেখে তাদের একত্রিত করলেন এবং নিম্নরূপ বক্তৃতা দিলেন ঃ

'হে লোকসকল! আল্লাহর মেহেরবানীতে আমার অন্তর কোন মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ নেই। আমার নিকট তোমাদের কল্যাণও আমার নিজের কল্যাণের মতই প্রিয়। সে কারণে আমার আন্তরিক অভিমত এই যে, ঐক্য সর্বদা মতভেদের চেয়ে উত্তম। আমি দেখছি যে, তোমরা লড়াইয়ের প্রতি অনীহা পোষণ করছো। সেজন্য আমি সমীচীন মনে করি না তোমাদেরকে এ কাজে বাধ্য করি, যা তোমরা পছন্দ করো না।'

হযরত হাসান (রাঃ) এর বক্তৃতা শেষ হতেই সমাবেশে এক হাঙ্গামা সৃষ্টি হলো। একদল বলতে লাগলো 'হাসানও তার পিতার মত কাফের হয়ে গেছে।' এই শোরগোলের মধ্যে একদল লোক হযরত হাসানের (রাঃ) উপর আক্রমণ করে বসলো। তাঁর তাঁবুর জিনিসপত্র লুট করে নিলো, তাঁর নীচ থেকে জায়নামায ও তাঁর কাঁধ থেকে চাদর ছিনিয়ে নিলো। হযরত হাসান (রাঃ) তাদের এ অভদ্রতায় ক্রুদ্ধ হলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করলেন এবং চীৎকার

www.e-ilm.weebly.com

করে বললেন, রাবীআ ও হামাদানের গোত্র কোথায়? হযরত হাসান (রাঃ) এর এ চীৎকার শুনেই এ দুইগোত্র ছুটে এলো এবং আক্রমণকারীদের মেরে তাড়িয়ে দিলো। (আখবারুত তিওয়াল পৃঃ ২১৬)

এ ঘটনার হযরত হাসান (রাঃ) এর দৃঢ়বিশ্বাস জমে গেল যে, কুফাবাসী দুষ্টমীতে নিমজ্জিত। খেলাফতের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের বোঝা তাদের সহযোগিতার ভরসায় বহন করা সম্ভব নয়।

সাবাত থেকে হযরত হাসান (রাঃ) মাদায়েন অভিমুখে রওয়ানা হলেন। পথে জাররাহ্ ইবনে কাবীসা নামে জনৈক খারেজী তাঁকে বল্লম মারে। তাঁকে মাদায়েন নিয়ে আসা হলো। এখানে তিনি শ্বেতপ্রাসাদে অবস্থান গ্রহণ করলেন এবং কিছু দিন চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে গেলেন।

হযরত হাসান (রাঃ) কায়স ইবনে সা'দ ইবনে উবাদাকে বারো হাজার সৈন্যসহ অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে প্রেরণ করেন। কায়স ইবনে সা'দ আনবার পৌঁছে যাত্রা বিরতি করছিলেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ)ও আনবার পৌঁছুলেন। তিনি কায়সের বাহিনীকে অবরোধ করলেন এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমেরকে সন্ধি প্রস্তাবসহ হযরত হাসান (রাঃ) এর নিকট প্রেরণ করেন।

সন্ধি

হযরত হাসান (রাঃ) এর নিকট আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমেরের মাদায়েন অভিমুখে অগ্রসর হবার সংবাদ পৌঁছুলে তিনিও নিজ বাহিনী নিয়ে মাদায়েন থেকে বের হন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমেরের বাহিনী হযরত হাসান (রাঃ) এর বাহিনীর সামনে এসে উপস্থিত হলে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমের চীৎকার করে বললো ঃ

'হে ইরাকবাসী, আমি লড়াই করার উদ্দেশ্যে আসিনি। বরং মুআবিয়া (রাঃ) এর পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আবু মুহাম্মদ (হাসান)কে আমার সালাম পৌঁছে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে এ আবেদন করো যে, মুসলমানদেরকে যুদ্ধের ধ্বংস থেকে যেন তিনি রক্ষা করেন'।

ইরাকবাসী এ প্রস্তাব শুনে লড়াই থেকে বিরত থাকতে পছন্দ করলো হযরত হাসান (রাঃ) নিজ বাহিনী নিয়ে মাদায়েন ফিরে এলেন। এখান থেকে তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমেরকে উত্তর পাঠালেন যে, আমি কতিপয় শর্তে মুআবিয়া (রাঃ) এর সাথে সন্ধি করতে ও খেলাফত থেকে নিবৃত্ত হতে প্রস্তুত রয়েছি। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমের হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর নিকট ফিরে গেল এবং তাঁকে সন্ধির সুসংবাদ দিল। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি একটি সাদা কাগজে নিজের সিল দস্তখত দিয়ে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমেরকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন এটি হাসানকে দিও এবং বলো যে, আপনার পছন্দ মত শর্ত লিখে দিন। আমি মেনে নেবো।

www.e-ilm.weebly.com

হযরত হাসান (রাঃ) নিম্নলিখিত শর্তসমূহ লেখেন ঃ

(১) ইরাকবাসীকে সাধারণ নিরাপত্তা দান করতে হবে এবং অতীত ঘটনাবলীর কারণে কাউকে পাকড়াও করা যাবেনা।

(২) আহওয়াজের রাজস্ব আমার নামে লিখে দিতে হবে।

(৩) আমার ভাই হুসাইনকে বাৎসরিক বিশ লাখ দেরহাম অজিফা দিতে হবে।

(৪) অনুদান ও উপহারের বেলায় বনূ হাশিমের হক অন্যদের চেয়ে অগ্রগণ্য মনে করতে হবে।

সন্ধিপত্র সম্পন্ন করে হযরত হাসান (রাঃ) মাদায়েন থেকে কূফা চলে এলেন। মুআবিয়া (রাঃ) ও আনবার থেকে অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়ে কূফায় এলেন। কূফার জামে মসজিদে মুআবিয়া (রাঃ) ইরাকবাসীর বায়আত গ্রহণ করেন। প্রথমে হযরত হাসান (রাঃ) বায়আত করেন। অতঃপর অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ও ছোট বড় সকলে বায়আত করে। খেলাফতের দায়িত্ব থেকে নিবৃত্ত হয়ে হযরত হাসান (রাঃ) মদীনা মুনাওওয়ারায় চলে এলেন এবং অবশিষ্ট জীবন মহানবী (সঃ) এর সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন। এভাবে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হলো ঃ

'আমার এ সন্তান সাইয়েদ। আশা করা যায়, আল্লাহ তার দ্বারা মুসলমানদের দুটি বিরাট দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করবেন।'

এ ঘটনা হিজরী ৪১-এর রবিউল আওয়াল মাসের। যেহেতু দশ বছরের গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাতের পর এ বছর মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সেকারণে এ বছরটিকে 'আমুল জামাআত' বা ঐক্যের বছর বলা হয়।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক হযরত হাসান (রাঃ) এর যুগ অতি সংক্ষিপ্ত হবার কারণে 'খেলাফতে রাশেদা কালের' মধ্যে গণ্য করেননি। তথাপি তাঁর বায়আতের প্রকৃতি তা-ই ছিল যা তার পিতা হযরত আলী (রাঃ) এর বায়আতের ছিল। তাছাড়া মহানবী (সঃ) এর এ বাণী ঃ

'আমার পর খেলাফত ত্রিশ বছর থাকবে'–এর আলোকে তাঁর কাল খেলাফতে রাশেদা কালের মধ্যে শামিল হয়ে যায়। সেকারণে আমরা হযরত হাসান (রাঃ) এর সন্ধি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি উল্লেখ করা সমীচিন মনে করলাম। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

www.e-ilm.weebly.com

খেলাফতে রাশেদা ব্যবস্থা

খেলাফতের মর্যাদা

খেলাফতে রাশেদা শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন স্বয়ং খলীফা। খলীফা প্রশাসনের প্রধান হিসেবে কিতাব ও সুন্নাহর ভাষ্যকার এবং মহানবী (সঃ) এর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে তিনি মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্যমাত্র ছিলেন এবং তাঁর ও অন্য যে কোন মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।

য়ারমূকে মুসলমান ও রোমানদের মধ্যে চূড়ান্ত লড়াই চলছে। রোমানদের পঙ্গুহৃদয় (ভীরু) সৈন্যদের মোকাবেলায় শাম ও ইরাকের ইসলামী সৈন্যরা বীরত্বের পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করছেন। খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) এক অভিনব পদ্ধতিতে ইসলামী সৈন্যদের লড়াই পরিচালনা করছেন। ইসলামী সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বগুণে লড়াইয়ের চিত্রে জয় ও সাফল্যের রং পরিপূর্ণ করে দেয়া হচ্ছে। প্রতিটি ব্যক্তি সাইফুল্লাহর চালচলন ও কথাবার্তায় ধন্যবাদ ধন্যবাদ করে উঠছে। হঠাৎ ইসলামের খলীফার নির্দেশ এসে যায়– বীর খালেদ (রাঃ) কে তাঁর পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া যাচ্ছে। সিপাহসালার খেলাফত দরবারের এ নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দেন। তাঁর কপালে কোন কুঞ্চন দেখা যায় না। তাঁর তলোয়ার পরিচালনায় কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। এ হচ্ছে ইসলামে খলীফার প্রথম মর্যাদা।

মসজিদে নববীতে হযরত উমর (রাঃ) বক্তৃতা করছেন। সমবেত লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল। বললো– হে উমর! থামুন, আমরা আপনার কথা শুনবো না। গমনীতের যে সম্পদ বন্টন করা হয়েছে তা থেকে সবাই একটি করে চাদর পেয়েছে। আপনার নিকট দুটি চাদর কোত্থেকে এলো? আপনি একটি দিয়ে জামা তৈরি করেছেন, আরেকটি গায়ে জড়িয়েছেন।

হযরত উমর (রাঃ) বললেন, আমার পুত্র আব্দুল্লাহ উত্তর দেবে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি বললেন আমীরুল মুমিনীনও একটি চাদর নিয়েছেন। দ্বিতীয় চারদটি যা তিনি জামা বানিয়েছেন, তা আমার অংশ। আমি আমার পিতাকে তা দান করেছি। এ হচ্ছে ইসলামে খলীফার দ্বিতীয় মর্যাদা।

বস্তুতঃ 'খলীফায়ে রাশেদ'-এর যা কিছু স্বাতন্ত্র্য ছিল তা এ হিসেবে ছিল যে, তিনি শরীয়ত বিধানের ভাষ্যকার ও তা বাস্তবায়নকারী। অতএব যদি কারো এ সন্দেহ হতো যে, তার পদক্ষেপ শরয়ী বিধানের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তাহলে তার দৃষ্টিতে তাঁর আর কোন মর্যাদা ছিল না।

ইসলামী যুগের প্রথম খলীফা খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেই খেলাফতের স্বাতন্ত্র্যসীমা নিম্নোক্ত ভাষায় প্রকাশ করে দেন ঃ

www.e-ilm.weebly.com

হে লোকসকল, আমি অনুসরণকারী ব্যতীত কিছু নই, নব্যপন্থী নই। অতএব আমি যদি সঠিক পথে থাকি, তাহলে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। আর যদি আমি তা থেকে বিচ্যুত হই, তাহলে তোমরা আমাকে সোজা করে দেবে।

(আশহারু মাশাহীরে ইসলাম ১১৯)

খোলাফায়ে রাশেদীন রাযিয়াল্লাহু আনহুম এর জীবন ছিল এ সীমারই কর্ম ব্যাখ্যা।

শাসন পদ্ধতি

গঠন প্রণালী অনুসারে আধুনিক শাসন ব্যবস্থা প্রধানত দুভাগে বিভক্ত। গণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক। গণতন্ত্র বা ডেমোক্র্যাসীতে আইন রচনা ও আইন প্রয়োগের যাবতীয় ক্ষমতা থাকে জনগণের। জনগণের নির্বাচিত আইন পরিষদ আইন রচনা করে এবং আইন পরিষদের প্রধান তাঁর পরামর্শদাতাদের (মন্ত্রীদের) একটি দলের (Cabinate) সাথে দেশের শাসনব্যবস্থা সে আইন অনুযায়ী পরিচালনা করেন। একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বা ইমপেরিয়ালিজম (Imperialism)-এ প্রশাসনের যাবতীয় বিষয় রাজার উপর ন্যস্ত থাকে। তার উক্তিই আইন বলে বিবেচিত হয় এবং তাঁর শক্তিই প্রয়োগ ক্ষমতা বলে গণ্য হয়।

উপরে আমরা খলীফার মর্যাদা সম্পর্কে যা লিখেছি তা থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, খেলাফতে রাশেদা শাসন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিকও নয় একনায়কতান্ত্রিকও নয়। ইসলামের শরয়ী আইন পূর্বেই সংকলিত ও বিধিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য শরয়ী আইন প্রয়োগের বিষয়টি খলীফার জন্য পদবীগত দায়িত্ব ছিল। প্রশাসনের এ দিকটিতে তিনি জনগণের নিকট দায়ী থাকতেন এবং উম্মতের প্রতিটি সদস্য সাধারণ বিচ্যুতির জন্যও তাঁকে মিম্বরেই আপত্তি জানাতে পারতো।

খেলাফতে রাশেদার বৈশিষ্ট্য

খেলাফতে রাশেদায় বংশীয় অধিকার ও ওয়ারিসীর কোন ভূমিকা ছিলনা। সর্বাধিক কুরাইশ হবার শর্ত ছিল। চার খুলাফায়ে রাশেদীন ছিলেন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বংশের। হযরত আবু বকর (রাঃ) 'বনু তায়ম' বংশের, হযরত উমর (রাঃ) বনু আদী বংশের এবং হযরত উসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) বনু আবদে মানাফ বংশের ছিলেন। মহানবী (সঃ) এর ইলমী ও আমলী গুণাবলীর কিরণই খলীফা হবার যোগ্যতার মূল বিষয় মনে করা হতো। হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) গুণাবলীর বিচারে সর্বদিক দিয়ে পিতার স্থলাভিষিক্ত হবার যোগ্য ছিলেন। তথাপি হযরত উমর (রাঃ) পরিষ্কার বলেছিলেন– খাত্তাব পরিবারের এক ব্যক্তিই এ দায়িত্বের জবাব দানের জন্য যথেষ্ট।

হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট হযরত হাসান (রাঃ)কে খলীফার করার বিষয় জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তা মুসলিম উম্মাহর মতামতের উপর ছেড়ে দেন।

www.e-ilm.weebly.com

খুলাফায়ে রাশেদীনকে শরীয়তের বিধান সঠিকভাবে অনুধাবন ও কার্যকরকরণে সহায়তা দানের জন্য মজলিসে শূরা থাকতো। হযরত উমর (রাঃ) এর মজলিসে শূরায় হযরত উসমান ইবনে আফফান, হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, হযরত আলী ইবনে আবু তালিব, হযরত মুআয ইবনে জাবাল, হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত জায়দ ইবনে ছাবিত ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মনে হয় পদ্ধতি ছিল এই যে, খলীফা আলোচ্য বিষয়টি শূরা সদস্যদের সামনে উপস্থাপন করতেন। শূরা সদস্যরা সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে খলীফার তা বাস্তবায়িত করতেন। শূরা সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য হলে তিনি নিজে যে কোন একটি দিককে প্রাধান্য দিতেন। কখনো কখনো বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুসারে মুসলমান জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করা হতো। কিন্তু সাধারণের মতামত ও মজলিসে শূরার মতামতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হলে শূরা সদস্যদের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হতো। কাদেসিয়া যুদ্ধের নেতৃত্ব প্রশ্নে এরূপ হয়েছিল। গ্রন্থের অবতরণিকায় আমরা এ বিষয়ে মৌলিক আলোচনা করেছি।

খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনে রাজকীয় শান-শওকতের কোন স্থান ছিল না। তাঁদের আহার, পোশাক, বাসস্থান ও সাজসরঞ্জাম ছিল অতি সাধারণ বরং দরিদ্রের মত। তাঁদের জীবনযাপন ছিল উম্মতের একজন সাধারণ সদস্যের মত। তাঁদের মজলিসে ধনী-দরিদ্রের মর্যাদা সমান ছিল। অতি সামান্য কাজ নিজে করতে তাঁদের কোনরূপ লজ্জাবোধ ছিল না।

আহনাফ ইবনে কায়স একদিন আরবের কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তিসহ হযরত উমর (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করতে এসেছেন। এসে তিনি দেখে আমীরুল মুমিনীন কাপড় গুছিয়ে নিয়ে এদিক-সেদিক দৌড়াদৌড়ি করছেন। আহনাফকে দেখে বললেন, আসুন, আপনিও আমার সাথে আসুন। বায়তুল মালের একটি উট পালিয়ে গিয়েছে। আপনি তো জানেন যে, তাতে অনেক অভাবীর প্রাপ্য জড়িত আছে। এক ব্যক্তি বললো– আমীরুল মুমিনীন,আপনি কেন কষ্ট করছেন। কোন ভৃত্যকে আদেশ করুন, সে খুঁজে নিয়ে আসবে। তিনি বললেন, 'আমার চেয়ে বেশী ভৃত্য আর কে হতে পারে?'

এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, যার কতিপয় ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

খুলাফায়ে রাশেদীন বায়তুল মালকে জাতির সম্পত্তি মনে করতেন। নির্ধারিত ভাতা ব্যতীত তিনি নিজের বা নিজের গোত্রের আরাম আয়েশের জন্য তা থেকে

www.e-ilm.weebly.com

এক পয়সাও নিতেন না। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এ বিষয়ে এত সতর্ক থাকতেন যে, তিনি বায়তুল মালে কিছুই সঞ্চিত থাকতে দিতেন না। যা কিছু আসতো, তা তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। তাঁর ইন্তেকালের পর বায়তুল মাল অনুসন্ধান করে মাত্র এক দীনার পাওয়া গেল। হযরত উমর (রাঃ) এর এ অবস্থা ছিল যে, একবার তাঁর অসুস্থতার জন্য মধুর প্রয়োজন পড়ে। কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। বায়তুল মালে মধু ছিল। তিনি অসুস্থ অবস্থায় মসজিদে এলেন এবং সাধারণ মুসলমানদের নিকট তা ব্যবহারের অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পেয়েই তিনি তাতে হাত লাগান।

খুলাফায়ে রাশেদীন নিজেকে জনগণের খেদমতের পাত্র নয় বরং সেবক মনে করতেন। সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজন সম্পর্কেও তাঁরা অবহিত থাকবার চেষ্টা করতেন। দারুল খেলাফতে (রাজধানীতে) তিনি নিজেই নামাজের ইমামতি ও হজ্জের নেতৃত্ব দান করতেন। এভাবে সাধারণ মুসলমানদের সাথে তিনি মেলামেশা করার সুযোগ লাভ করতেন এবং তারা নিজেদের দাবী ও অভিযোগ তাঁদের নিকট পেশ করতে পারতো। সাধারণ নির্দেশ ছিল যে, কারো কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে সে হজ্জের সময় এসে পেশ করবে। আমলাদের নির্দেশ ছিল যে, তাঁরাও সেসব অভিযোগের জবাবদিহির জন্য যথাস্থানে উপস্থিত থাকবেন।

তাঁরা খেলাফতের গুরুদায়িত্ব বহন ব্যতীত সৃষ্টির সেবাও নিজেদের উদ্দেশ্য মনে করতেন। অভাবীদের সাহায্য করা, দুর্বলদের সেবা করা, এতীম-বিধবাদের অভিভাবকত্ব ও অসুস্থদের শুশ্রুষা এবং মুসাফিরদের তত্ত্বাবধান তাঁদের প্রিয় কর্ম ছিল।

মদীনার শহরতলীতে এক দুর্বল অন্ধ মহিলা ছিল। হযরত উমর (রাঃ) এর রীতি ছিল প্রতিদিন সকালে তিনি মহিলার ঝুপড়িতে গিয়ে তাঁর প্রয়োজনীয় খেদমত করতেন। কিছুদিন পর তিনি অনুভব করলেন যে, আল্লাহর কোন বান্দা তাঁর পূর্বেই এ কাজ সম্পাদন করে যায়। একদিন তিনি বিষয়টি যাঁচাই করার জন্য কিছুটা রাত থাকতেই চলে এলেন। দেখেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) এ মহিলার খেদমত সেরে বের হচ্ছেন। তিনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, হে রসূলের খলীফা! আপনিই কি প্রতিদিন আমার পূর্বে এ কাজ সেরে যান?

এ ধরনের ঘটনাবলী যদি ইতিহাস গ্রন্থসমূহ থেকে একত্রিত করা হয়, তাহলে কতিপয় বৃহদাকার খণ্ড হয়ে যাবে।

www.e-ilm.weebly.com

বিচার কাঠামো

খলীফার অন্যতম বিশেষ দায়িত্ব ছিল উম্মতের বিবাদ নিরসন করা। এ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য তিনি নিজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারতেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর সময় পর্যন্ত খলীফার পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব আমেল ও ওয়ালীগণ সম্পাদন করতেন। কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) এর সময়ে যখন ইসলামী খেলাফতের সীমা প্রশস্ততর ও ইসলামী কৃষ্টির প্রচলন হলো এবং প্রশাসক ও ওয়ালীদের প্রশাসনিক কাজ কর্ম বেড়ে গেল, তখন বিচার বিভাগকে প্রশাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা হলো।

বিচারকদের নির্বাচনের সময় অত্যন্ত চিন্তা ও সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। এ পদের জন্য কেবল তাঁদেরই নির্বাচন করা হতো যাঁরা ইসলামী আইন ও কুরআন সুন্নাহ-এ গভীরতম পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন এবং নিজ ইলমকে কার্যে রূপান্তরিত করার জন্য তাকওয়া ও ন্যায়গুণেও ভূষিত হতেন। ইবনে জওযী (রহঃ) তাঁর 'মানাকিব' গ্রন্থে লিখেছেন– হযরত উমর (রাঃ) একবার দামেশকের কাজীকে প্রশ্ন করেছিলেন, মোকদ্দমার বিচারে আপনার নিয়ম কি? কাজী সাহেব জবাব দিলেন– আমি সর্বপ্রথমে কিতাবুল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করি। অতঃপর রসূলের সুন্নাহর প্রতি। এখানেও যদি কোন সুস্পষ্ট বিধান না পাই, তাহলে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলোতে চিন্তাভাবনা করি এবং আমার সমসাময়িক উলামায়ে কেরামের নিকটও এ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করি। অতঃপর ফয়সালা করি। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, আপনার নিয়ম ঠিক আছে। আরও এটুকু করবেন যে, বিচারের এজলাসে বসার সময়ে আল্লাহর নিকট এ বলে প্রার্থনা করবেন ঃ

'হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট এ তাওফীক প্রার্থনা করি যে, আমি যেন জেনে ফতোয়া দিই, কিতাব ও সুন্নাহর বিধান মোতাবেক ফয়সালা করি এবং আমি তোমার নিকট সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় ন্যায়পরায়ণতার তাওফীক প্রার্থনা করি।'

কাজীদের নির্বাচনে মেধা ও বুদ্ধিমত্তার প্রতিও লক্ষ্য রাখা হতো। একজন কাজী হযরত উমর (রাঃ) কে বলেন, আমি দেখলাম যে, সূর্য ও চন্দ্র লড়াই করছে এবং দুজনেরই সাথে তারকারাজির এক বাহিনী রয়েছে। হযরত উমর (রাঃ) প্রশ্ন করেন, আপনি কোন্ পক্ষে গেলেন? কাজী বললেন, আমি চন্দ্রের পক্ষ গ্রহণ করলাম। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, আপনি ভুল করেছেন। কুরআন বলছে ঃ

"আমি রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন করেছি, রাতের নিদর্শন মুছে দিয়ে দিনের নিদর্শনকে আলোকময় করেছি।" (ইসরা ১২) এই বলে তিনি তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করেন। (আশহারু মাশাহীরিল ইসলাম ২খ. ৪৩৬)

www.e-ilm.weebly.com

এ বিষয়টিও লক্ষ্য রাখা হতো যে, কাজীগণ যেন লোভ-লালসার শিকার বা প্রভাব প্রতিপত্তিতে ভীত না হন। এজন্য কাজীদের বেতনও উচ্চহারে নির্ধারণ করা হতো এবং যথাসম্ভব ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদের নির্বাচন করা হতো। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) এর নিকট তিনি যে ফরমান লিখেন, তাতে উল্লেখ করেন যে, ধনী ব্যক্তি উৎকোচের প্রতি ঝুঁকবে না এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কারো প্রতি ভীত হবে না। কাজীদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, তাঁরা যেন যথাসম্ভব বাদী-বিবাদীর পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দেন। কানজুল উম্মাল গ্রন্থে তাঁর এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে– মোকদ্দমার দুপক্ষকে ফিরিয়ে দিন। তাঁরা পরস্পরে সমঝোতার মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করে নেবে। কেননা বিচারালয়ের ফয়সালার মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু অন্তর পরিষ্কার হয় না। (আশহার ২খ, ৪৩৭)

কাজীদের প্রতি কঠোর তাগিদ ছিলো তারা যেন বাদী ও বিবাদীর মধ্যে সমতা রক্ষা করেন। যায়দ ইবনে ছাবিত (রাঃ) এর আদালতে হযরতঃ উমর (রাঃ) কে একবার বিবাদী হিসেবে উপস্থিত হতে হয়েছিল। হযরত যায়দ (রাঃ) তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করতে চেয়ে ছিলেন। এতে তিনি তাঁর প্রতি খুব অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

প্রতিটি বড় শহরে আলেম ও ফকীহদের একটি দল থাকতো। কাজীরা জটিল মোকদ্দমা ফয়সালার জন্য তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এর প্রয়োজন এ কারণেও ছিল যে, মহানবী (সঃ) এর হাদীছসমূহ তখন পুস্তকের আকারে সংকলিত হয়নি। বরং সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়ে সংরক্ষিত ছিল। কোন গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমা এলে কাজীরা আলেমদের শরণাপন্ন হয়ে রসূল (সঃ) এর সুন্নাহর আলোকে তার ফয়সালা করতেন। যেহেতু কোন কোন সাহাবীর যেসকল হাদীছ জানা ছিল, অন্যদের তা ছিল না, সেকারণে অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন শহরের কাজীদের ফয়সালা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতো।

সেসকল উলামায়ে কেরামের এ-ও দায়িত্ব ছিল যে, তাঁরা ইসলামী আইন বিষয়ে জনসাধারণকে পথ প্রদর্শন করতেন এবং কোন পারিশ্রমিক ও সম্মানী ব্যতীত মুসলমান জনসাধারণকে শরীয়তের আইনের দফাসমূহ অবহিত করতেন। সেজন্য তাঁদের দরস মজলিসসমূহ সুন্নাহ-অন্বেষীদের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকতো এবং লোকেরা সহস্রাধিক মাইল পথ অতিক্রম করে তাঁদের নিকট আসতো।

যেহেতু 'বিবাদ নিরসন' ছিল খলীফার পদবীগত অন্যতম দায়িত্ব, সেহেতু মোকদ্দমার দুপক্ষকে বিচারের জন্য কোন ব্যয় বহন করতে হতো না। বিচার পদ্ধতিও ছিল খুব সাদাসিধা। সাধারণভাবে মসজিদগুলোই বিচারালয় হিসেবে ব্যবহার করা হতো এবং মামলার ব্যক্তি অবাধে বিচারকের নিকট পৌঁছে যেতো।

www.e-ilm.weebly.com

যতদূর জানা যায়, বিচার কার্যাবলীর কোন রেকর্ড সংরক্ষণ করা হতো না। ফয়সালার কোন লিখিত কপি মোকদ্দমার পক্ষদ্বয়কে দেয়া হতো না। ফয়সালা কার্যকর করতে কোন শক্তি প্রয়োগও করা হতো না। মোকদ্দমার পক্ষদ্বয় হতো সত্যান্বেষী পর্যায়ের এবং তারা যখন তাদের বিরোধের বিষয়ে শরীয়তের বিধান জানতে পারতেন তখন নিজেরাই এর সামনে মাথা নত করতেন।

(খাযারী ২খ, ১৩৫)

প্রতিরক্ষা কাঠামো

'জিহাদ' অর্থাৎ ইসলামের রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ইসলামে ফরয সাব্যস্ত করা হয়েছে। অবশ্য তা ফরযে কেফায়া। অর্থাৎ আমীর উম্মতের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্যকে তলব করতে পারেন। জোর করে হলেও। মহানবী (সঃ) ও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর সময়ে যখন প্রয়োজন দেখা দিত, তখন আমীর কওমকে জিহাদে শরীক হতে আহ্বান জানাতেন। যেসব মুসলমান যুদ্ধে শরীক হতেন, তাঁরা গনীমতের মালে অংশ লাভ করতেন। পদাতিক সৈন্য এক অংশ পেতেন, আরোহী সৈন্য লাভ করতেন দুই অংশ। এছাড়া অংশ বন্টনে অন্য কোন তারতম্য লক্ষ্য রাখা হত না।

সেনা দফতর চালু

হিজরী ১৫-এ হযরত উমর (রাঃ) সৈন্যদের জন্য একটি স্বতন্ত্র দফতর চালু করেন। সকল আরবকে সেনাবাহিনীর সদস্য গণ্য করা হলো এবং আরবী নবীর স্বগোত্রীয় হবার কারণে দীন ইসলামের প্রতিরক্ষায় অংশ নেয়া তাদের জন্য আবিশ্যিক সাব্যস্তকরা হলো। সকল সৈন্যের নাম যথারীতি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং রসূলুল্লাহর (সঃ) নৈকট্য ও দ্বীনি খেদমতের বিচারে তাঁদের নিম্নরূপ বেতন নির্ধারণ করা হয় ঃ

মহানবী (সঃ) এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)–বার্ষিক পঁচিশ হাজার দেরহাম।

মহানবী (সঃ) এর স্ত্রীগণ-বার্ষিক দশ হাজার দেরহাম।

বদরী সাহাবী, হযরত হাসান, হুসাইন, আবু যর ও সালমান ফারসী–বার্ষিক পাঁচ হাজার দেরহাম।

হুদায়বিয়া সন্ধির অংশগ্রহণকারীগণ– বার্ষিক চার হাজার দেরহাম।

মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারীগণ–বার্ষিক দুই হাজার দেরহাম।

কাদেসিয়া ও য়ারমূকের পরে প্রসিদ্ধ যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণকারীগণ– এক হাজার দেরহাম।

উপরোক্ত শ্রেণীসমূহের পরের মুজাহিদদের–পাঁচ শত থেকে আড়াই শত পর্যন্ত।

www.e-ilm.weebly.com

স্ত্রীলোকদেরও স্তর অনুযায়ী পাঁচশত থেকে আড়াই শত দেরহাম বার্ষিক এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদেরও বার্ষিক একশত দেরহাম ভাতা নির্ধারণ করা হয়।

(তারিখে তাবারী ৪খ, ১৬২-১৬৩)

এ ব্যাপারে আরব অনারবে কোন পার্থক্য ছিল না। লক্ষ্যণীয় ছিল শুধুমাত্র ইসলামের খেদমত বরং কখনো কখনো হৃদয় জয়ের উদ্দেশ্যে অনারবদের সাথেও বিশেষ ধরণের আচরণ করা হতো। যেমন তসতর জয়ের সময় পারস্যরাজ ও তার কওমের সাথে করা হয়েছিল। হযরত উসমান (রাঃ) এর সময় পর্যন্ত এরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর সময়ে সকল মুজাহিদের বেতন সমান করে দেন।

সৈন্যদের এ ব্যবস্থাপনা এত নিয়মতান্ত্রিক ও হযরত উমর (রাঃ) এর তত্ত্বাবধানে এত কঠোর ছিল যে, কোন ব্যক্তি তার ডিউটিতে অনুপস্থিত থাকবে আর তিনি তা জানতে পারবেন না, তা সম্ভব ছিল না।

যুদ্ধ পদ্ধতি

প্রাক ইসলামী যুগের আরবে জাঁকজমকের সাথে লড়াই হতো। পদ্ধতি ছিল এই যে, প্রথমে দু'পক্ষ থেকে একজন করে বীর বের হয়ে তার বীরত্বের নৈপূণ্য প্রদর্শন করতো। অতঃপর দুপক্ষের সৈন্যরা বিশৃংখলভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হতো। পলায়ন করতো, আবার ফিরে আসতো, আবার পালাতে আবার ফিরে আসতো। ইসলাম কাতারবন্দী পদ্ধতি পছন্দ করেছে।

ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص

'আল্লাহ তাদের প্রিয় জানেন যারা তাঁর রাহে সীমাপ্রাচীরের ন্যায় কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে।' (সফ-৪)

রসূলল্লাহ (সঃ) এর সময় থেকেই কাতারবন্দী হওয়ার নিয়ম শুরু হয় এবং হযরত উমর(রাঃ) এর সময়ে হযরত খালেদ ইবনে আলীদ (রাঃ) এর পরামর্শে 'তা'বিয়া' নামের সুন্দরতম পদ্ধতি চালু হয়। য়ারমূক ও কাদেসিয়্যা ময়দানে এ পদ্ধতিতেই যুদ্ধ হয়। তা'বিয়া পদ্ধতি অনুসারে সৈন্যদের নিম্নরূপ অংশসমূহে বিভক্ত করা হতো ঃ

(১) তালীআ (ভ্রাম্যমান সৈন্য), (২) মুকাদ্দামা (অগ্রগামী), (৩) কলব (কেন্দ্রীয় অংশ, এখানেই সিপাহসালার থাকতেন), (৪) মায়মানা (কলবের ডানদিকের অংশ), (৫) মায়সারা (বামদিকের অংশ), (৬)সাকা (পশ্চাদ অংশ), (৭) রিদ (সাকার পিছনে সহায়ক অংশ), (৮) রায়েদ (সৈন্যদের জন্য ঘাসপানি অন্বেষণকারী দল), (৯) মুজাররাদ (অনিয়মিত সৈন্য), (১০) রুকবান (উষ্ট্রারোহী), (১১) ফুরসান (অশ্বারোহী), (১২) রাজেল (পদাতিক), (১৩) রুমাত (তীরন্দাজ)।

www.e-ilm.weebly.com

এ সকল অংশ আবার ক্ষুদ্রতম অংশসমূহে বিভক্ত হতো। প্রতিটি ক্ষুদ্রদলকে বলা হতো কারদুস। সেনানায়কদের স্তরবিন্যাস ছিল এই ঃ সর্বাধিনায়ক হতেন আমীরআম (Commandar in Chief) অতঃপর তাঁর নায়েব (Deputy Commandar in Chief) এর স্থান ছিল। অতঃপর মায়মানা, মায়সারা, কলব ইত্যাদির আমীরগণ (Wing Commandar)। তাঁদের পরে কারদুসসমূহের আমীরগণ (Squadron Officer) এর স্থান ছিল। অতঃপর আরীফ ও আমীরুল আশীরাগণের (Lieutenant) স্থান ছিল।

কারদুস আমীর হতেন একহাজার সৈন্যের অফিসার। আমীরুল আশীরাগণ একশত করে সৈন্যের অফিসার হতেন। আরিফগণ ছিলেন নিজ নিজ গোত্রের মাতবর। এছাড়া প্রতি বাহিনীতে অর্থ অফিসার, চিকিৎসক, কাযী, সংবাদ সরবরাহকারী, দোভাষী ও লিপিকার থাকতেন। (তারীখে তাবারী ৪খ. ৩২ ও ৮১)

যুদ্ধাস্ত্র

হযরত উমর (রাঃ) এর সময়ে যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারেও উন্নতি সাধিত হয়। প্রথম দিকে আরবরা শুধুমাত্র তলোয়ার, বর্শা ও তীর দ্বারা যুদ্ধ করতো। এসকল সরঞ্জামও তেমন উন্নত হতো না। কাদেসিয়্যার যুদ্ধে ইরানীরা মুসলমানদের তীরকে নাটাই এর সাথে সাদৃশ্য দিয়েছিল। কিন্তু রোম ও পারস্যের শিক্ষিত সৈন্যদের সাথে মোকাবেলার পর মুসলমানরা তাদের যুদ্ধাস্ত্রসমূহ ব্যাপকভাবে ব্যবহার শুরু করে। দামেশ যুদ্ধ ইত্যাদিতে ফাঁদ, কামান, রশির সিড়ি, কাঠের ট্যাংক ইত্যাদি ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রণ নৈপুণ্য

আরব জাতি সর্বদা এক যোদ্ধা জাতি ছিল। কিন্তু তাদের সকল শক্তি ব্যয় হতো নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। ইসলাম তাদেরকে দ্বীনি সূত্রে সংযুক্ত করে ঐক্যবদ্ধ করে। অতঃপর তাদের সামনে একটি মহান উদ্দেশ্য উপস্থাপন করে, যা পার্থিব সম্মানের সাথে সাথে পারলৌকিক সৌভাগ্যের ধারক। মুসলমানরা এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যখন আরবের প্রান্তসমূহ থেকে বের হলো, তখন তারা সৌভাগ্যবশতঃ ফারূক আজমের ন্যায় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ কুশলী ও বিজয়ীর নেতৃত্ব লাভে ধন্য হয়। ফল তা-ই হলো যা হবার ছিল। তারা তৎকালীন দুটি পরাশক্তির বিরুদ্ধে সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করেন। এতে তারা যুদ্ধবিদ্যায় এমন পারদর্শিতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দান করেন ইতিহাসে যার কোন নজীর পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

www.e-ilm.weebly.com

(১) মুসলমানরা যুদ্ধ শুরু করতেন নিজেদের দেশের প্রান্ত থেকে। এতে তারা পরাজিত হলে শীঘ্র নিজ দেশে প্রবেশ করতে পারতেন এবং শত্রু তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে সাহস পেতো না। তাছাড়া তাঁরা প্রাথমিক যুদ্ধগুলোতে এমন সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিতেন যে, শত্রুদের অন্তরে তাঁদের প্রতি ভীতি সঞ্চারিত হতো এবং তারা পর্যায়ক্রমে পিছু হটে যেতে থাকতো। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় য়ারমূক ও কাদেসিয়্যা যুদ্ধই শাম ও পারস্যে মুসলমানদের ভবিষ্যত সাফল্যের ফয়সলা করে দিয়েছিল।

(২) শত্রুদেশের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করার সময় তারা নিজেদের জন্য সহায়ক সৈন্যের ব্যবস্থা করে রাখতেন এবং ফিরে যাবার পথ নিরাপদ রাখতেন। শত্রুকে এমন সুযোগ দিতেন না যাতে তারা পিছন থেকে এসে ঘায়েল করতে পারে। য়ারমূক যুদ্ধে য়াযীদ ইবনে আবূ সুফিয়ানের সাহায্য মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। তেমনি আলী ইবনে হাযরামীর সাহায্যের জন্য যখন ইস্তাখরে সৈন্য পাঠানো হয়েছিলো তখন বসরা থেকে আহওয়াজ পর্যন্ত সেনাচৌকি বসানো হয়েছিল।

(৩) কোন শহর অবরোধ করলে তাঁরা শত্রুর সকল যোগাযোগ মাধ্যম বিচ্ছিন্ন করে দিতেন, যাতে অন্য কোথাও থেকে তাদের কোন সাহায্য না পৌঁছুতে পারে। দামেশক জয়ের সময় হযরত আবূ উবায়দা (রাঃ) দশজন সেনানায়ককে ফাহল ও দামেশকের মাঝখানে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন, যুলকিলাকে হিমস ও দামেশকের মাঝখানে এবং আলকামা ও মাসরুককে ফিলিস্তীন ও দামেশকের মাঝখানে মোতায়েন করেন। এসকল রাস্তা বন্ধ করার পর তিনি খালেদ ইবনে অলীদ ও য়াযীদ ইবনে আবূ সুফিয়ানের সাথে অগ্রসর হন এবং দামেশক অধিকার করেন।

(৪) নিজেদের অধিকৃত এলাকায় শত্রুর আক্রমণের আশংকা দেখা দিলে তাঁরা সকল শক্তি একস্থানে জমা করতেন না। বরং বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধব্যূহ তৈরী করতেন। যেমন মুছান্না ইবনে হারিছা শায়বানী ইরাকে করেছিলেন। তিনি এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সেনাচৌকি স্থাপন করেন এবং ইসলামী শক্তিকে আরব থেকে অনারব পর্যন্ত শিকলের বেড়িসমূহের ন্যায় গ্রথিত করে দিলেন।

(৫) তাঁরা সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতেন। দামেশক বিজয় ছিল হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) এর সময়জ্ঞানের ফল। তেমনি তারা শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হবার জন্য কলা-কৌশলে ত্রুটি করতেন না। হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) দূতের বেশে আরতাবুনের সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবহিত হন। তেমনি লাযকিয়া জয়ের সময় হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) নিজ সৈন্যদের পরিখায় লুকিয়ে রেখে শত্রুকে বিভ্রান্ত করেন।

www.e-ilm.weebly.com

(৬) তাঁরা দুশমনের গতিবিধির প্রতি পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখতেন এবং প্রয়োজনে গোটা ইসলামী সাম্রাজ্যের সৈন্যরা একই সময়ে মেশিনের অংশসমূহের ন্যায় সক্রিয় হতো। হিরাক্লিয়াস যখন জাজিরার মুসলমানদের উপর আকস্মিকভাবে আক্রমণের পরিকল্পনা করেন, তখন একদিক থেকে শামের সৈন্য এবং অন্যদিক থেকে ইরাকের সৈন্যরা অগ্রসর হয় এবং হিরাক্লিয়াসের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়।

(৭) তাঁরা দুশমনের মোকাবেলার জন্য একাধিক ফ্রন্ট সৃষ্টি করতেন। এতে শত্রুর শক্তি বিভক্ত হয়ে যেতো এবং এক স্থান হতে অন্যত্র সাহায্য পৌঁছুতে পারতো না। হিরাক্লিয়াস যখন হিমস আক্রমণ করলেন এবং জাজিরাবাসীদের সাহায্য কামনা করলেন, তখন ইরাকী সৈন্য তৎক্ষণাৎ জাজিরা আক্রমণ করে এবং তাদেরকে হিরাক্লিয়াসের সাহায্য করতে বাধা প্রদান করে।

(৮) তাঁরা দুশমনের শক্তি ভেঙ্গে দিতেন এবং শত্রুপক্ষের লোক দিয়েই গুপ্তচর বৃত্তি করিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতেন। তিকরীত ও মোসেলের যুদ্ধে ইরানীদের মোকাবেলায় আরব খৃষ্টানদের সাথে নিয়ে সাফল্য অর্জন করা হয় এবং তসতর শহর একজন ইরানীর তৎপরতায়ই বিজয় হয়।

অর্থনৈতিক কাঠামো

একটি উন্নত শাসনব্যবস্থার জন্য তার অর্থব্যবস্থা বিশুদ্ধ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) এর সময়ের প্রথম দিকে আয়-ব্যয়ের নিয়ম ছিল অতি সাদামাঠা। মুসলমানদের নিকট থেকে যাকাত ও সদাকাত হিসাবে যে অর্থ-সম্পদ আয় হতো তা অভাবীদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো। গনীমতের পঞ্চমাংশ ও ফাই-এর এমন প্রাচুর্য ছিল না যা বন্টনের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন ছিল।

মুসলমানরা যখন রোম পারস্যের এলাকাসমূহ জয় করেন, ধনসম্পদের প্রাচুর্য এসে গেল এবং তা ন্যায্য প্রাপকদের মধ্যে বন্টন করা শুধুমাত্র খলীফার বা তাঁর মজলিসে শূরার ক্ষমতার মধ্যে রইলো না, তখন সেজন্য সুনির্দিষ্ট বিধিমালা প্রস্তুত করা হলো এবং বায়তুল মালকে সুসভ্য দেশের অনুকরণে সুবিন্যস্ত করা হলো।

ঘটনাটি ছিল এই যে, হিজরী ১৬ সনে বাহরাইন থেকে পাঁচ লাখের বিপুল অর্থ আসে। হযরত উমর (রাঃ) শূরা সদস্যদের ডেকে পরামর্শ করলেন যে, এ অর্থ কিভাবে ব্যয় করা যায়। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আপনার নিকট যে অর্থ জমা হবে, তা বছরেরটি বছরেই ব্যয় করে ফেলুন। হযরত উছমান (রাঃ) বললেন, আয়ের পরিমাণ অধিক। প্রাপকদের নাম তালিকাবদ্ধ না করলে কে

www.e-ilm.weebly.com

পেল আর কে পেল না তা জানা যাবে না। অলীদ ইবনে হিশাম বললেন, আমি শামরাজাদের দেখেছি, তাঁরা এজন্য স্বতন্ত্র দফতর রেখেছেন। হযরত উমর (রাঃ) এ মতটিকে পছন্দ করলেন। তিনি বায়তুল মাল বিভাগ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিলেন এবং আকীল ইবনে আবু তালিব, মাখরামা ইবনে নওফল ও জুবায়র ইবনে মুতইমকে ডেকে এ বিভাগ সাজানোর দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত করেন।

বায়তুল মালের প্রধান দফতর প্রতিষ্ঠা করা হয় মদীনা মুনাওরায় এবং এর অধীনে প্রদেশসমূহের রাজধানীতে বায়তুল মালের দফতর প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রাদেশিক দফতরগুলোতে দেশীয় ভাষায় কাজকর্ম করা হতো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরনো কর্মকর্তারাই এ দায়িত্বে নিযুক্ত হয়। কিন্তু যখন অমুসলিম কর্মচারীদের মধ্যে অসৎ ক্রিয়াকলাপ দেখা গেল তখন আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান অধীনস্থ দফতরগুলোতেও আরবী ভাষার প্রচলন করেন।

(ফুতুহুল বুলদান পৃঃ ৪৩৫ ও আশহার ২খ. ৩৬৫)

রাজস্ব

খেলাফতে রাশেদার রাজস্ব প্রধানতঃ দুভাগে বিভক্ত ছিল যথা ঃ

১। যে রাজস্ব অমুসলিমদের নিকট থেকে আদায় করা হতো।

২। যে রাজস্ব মুসলমানদের নিকট থেকে আদায় করা হতো।

অমুসলিমদের নিকট থেকে যেসব রাজস্ব আদায় করা হতো তা ছিল ঃ

খারাজ ঃ যে সকল দেশ মুসলমানরা যুদ্ধ করে দখল করে, সেখানকার জমি দেশীয় লোকদেরই আয়ত্তে থাকতে দেয়া হয়। তবে ফসলের হিসাবে সেগুলোর উপর খুবই সামান্য কিছু অর্থ ধার্য কধা হয়। অর্থধার্যের পরিমাণ এ থেকে অনুমান করা যায় যে, ইরাকে প্রতি পৌনে এক বিঘা জমিতে গমের উপর খারাজের পরিমাণ ছিল বার্ষিক দুই দেরহাম। যবের উপর এর পরিমাণ ছিল অর্ধেক। খেজুর ছিল ইরাকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফসল। এর উপরই ইরাকের ব্যবসা বাণিজ্য নির্ভর করতো। অথচ তার উপর কোন অর্থ শুল্ক ছিল না।

এভাবে অতি সামান্য পরিমাণে রাজস্ব ধার্য করা সত্ত্বেও হযরত উমর ফারূক (রাঃ) এর সময়ে ইরাকের খারাজের পরিমাণ দাঁড়াতো প্রায় দশ কোটি দেরহাম। এ অংকের মধ্যে শাহী পরিবারের জাগীর বা পলাতক বিদ্রোহীদের সম্পত্তির আয় গণ্য ছিল না। এ দুধরণের সম্পত্তি হযরত উমর (রাঃ) খাস সাব্যস্ত করে বায়তুল মালের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। এসকল জমি থেকে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ ছিল সত্তর লাখ দেরহাম।

খাস জমির আয় জনসাধারণের কল্যাণে ব্যয় করা হতো। কখনো কখনো এ সকল জমি থেকেই ইসলামের খেদমতের জন্য জাগীর দেয়া হতো।

(আশহারুল মাশাহীর ২খ. ৩১৯, সূত্র কিতাবুল খারাজ ও ফুতুহুল বুলদান)

www.e-ilm.weebly.com

জিযিয়াঃ যে দেশ মুসলমানরা জয় করে নেয় বা যারা ইসলামী শাসনব্যবস্থার সাথে নিজেদের যুক্ত করে নেয়, সেখানকার অমুসলিম বাসিন্দাদের যিম্মী বলা হয়। অর্থাৎ তাদের জীবন ও সম্পত্তি হেফাযত করা ইসলামী প্রশাসনের যিম্মায় অত্যাবশ্যক হয়ে যায়। এ হেফাযতের বিনিময়ে মুসলমানরা তাদের নিকট থেকে সাংবার্ষিক অতি সামান্য পরিমাণে কিছু অর্থ আদায় করে, যা জিযিয়া নামে পরিচিত। জিযিয়া দাতাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে তা তিন ধরনের করা হয়েছিল ঃ বার্ষিক আটচল্লিশ দেরহাম, চব্বিশ দেরহাম ও বারো দেরহাম। জিযিয়া যেহেতু সৈন্যসেবার বিনিময় ছিল, এ কারণে ঃ

(১) শুধুমাত্র তাদের নিকট থেকে এ আদায় করা হতো যাদের উপর সৈন্যসেবার দায়িত্ব বর্তাতে পারে। অর্থাৎ ২০ থেকে ৫০ বছরের পুরুষ। বৃদ্ধ, শিশু, স্ত্রীলোক ও পঙ্গুলোকেরা এর বাইরে ছিল। অভাবীদেরও জিযিয়া মাফ করে দেয়া হতো।

(২) কোন সম্প্রদায় সৈন্যসেবার দায়িত্ব নিজেরা স্বীকার করে নিলে তাদেরকে জিযিয়া থেকে বাদ দেয়া হতো। আরমেনিয়া জয়ের সময়ে সেখানকার রাজা শাহরবজার এর সাথে এ ধরনেরই চুক্তি হয়েছিল যা যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে।

(৩) কোন কারণে মুসলমানরা যিম্মীদের হেফাযতের দায়িত্ব পালনে অপারগ হয়ে গেলে জিযিয়ার অর্থও আদায় করা হতো না। হযরত উমর (রাঃ) এর সময়ে যুদ্ধের প্রয়োজনে মুসলমানদের যখন হিমস থেকে সরে আসতে হলো তখন আদায়কৃত জিযিয়া ফেরত দেয়া হয়।

গনীমতঃ যুদ্ধের সময়ে মুসলমানরা দুশমনের যে সকল মাল আয়ত্ত করে নিতেন সেগুলোকে গনীমত বলা হতো। এ মাল পাঁচ ভাগ করে এক ভাগ বায়তুল মালে নিয়ে নেয়া হতো, অবশিষ্ট চারভাগ মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো।

মুসলমানদের নিকট থেকে যেসকল রাজস্ব আদায় করা হতো তা নিম্নরূপ ঃ

(১) যাকাত ঃ মুসলমানদের সম্পদ, ব্যবসায়ের মাল ও পশুর এক নির্দিষ্ট পরিমাণের উপর চল্লিশভাগের এক একভাগ রাজস্ব হিসাবে নির্ধারিত যা বছরে একবার আদায় করা হতো। যাকাতের বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহর কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে।

(২) উশর ঃ মুসলমানদের জমিতে খারাজের পরিবর্তে ফসলের এক দশমাংশ আদায় করা হয়, যা উশর নামে পরিচিত। এ উশর প্রতি ফসলে নেয়া হয়, খারাজের মত বার্ষিক হারে নয়।

(৩) সদকাসমূহ ঃ এতে সদকায়ে ফিতর, কুরবানী, কাফফারা ইত্যাদির অর্থ এবং জাতীয় প্রয়োজনের সময় সাধারণ দানের অর্থ অন্তর্ভুক্ত। এরও বিস্তারিত বিবরণ ফিকহর কিতাব সমূহে বর্ণিত আছে।

এসকল রাজস্ব ব্যতীত নগর শুল্ক প্রচলিত ছিল। মুসলমান ব্যবসায়ী যখন

www.e-ilm.weebly.com

তার মাল অন্য দেশে নিয়ে যেতো, তখন সেখান থেকে নগর শুল্ক আদায় করা হতো। হযরত উমর (রাঃ) নির্দেশ দিলেন যে, যে দেশ মুসলমানদের নিকট থেকে যে নিয়মে নগরশুল্ক আদায় করে সেদেশের ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে ঠিক সে নিয়মে নগর শুল্ক আদায় করতে হবে। এ শুল্ক বছরে মাত্র একবার আদায় করা হতো এবং দুইশত দেরহামের কম মালে আদায় করা হতো না।

রাজস্ব আদায়ে সতর্কতা

রাজস্বের এ তালিকায় একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে জানা যায় যে, খেলাফতে রাশেদা শাসনব্যবস্থায় মুসলমানদের চেয়ে অমুসলিমদের উপর রাজস্বের বোঝা অনেক হালকা ছিল। তদুপরি তা আদায়ের ক্ষেত্রে অতি সাবধানতা অবলম্বন করা হতো যাতে যিম্মীদের উপর কোনরূপ অত্যাচার হতে না পারে। কাযী আবূ ইউছুফ (রহঃ) কিতাবুল খারাজ-এ বর্ণনা করেছেন, ইরাক থেকে বার্ষিক খারাজ আদায় হয়ে এলে হযরত উমর (রাঃ) কূফা ও বসরার দশজন করে সম্ভ্রান্ত লোককে ডেকে সাক্ষ্য নিতেন। তাদেরকে আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে হতো যে, খারাজ আদায়ে কোন মুসলিম বা অমুসলিমের প্রতি জুলুম করা হয়নি। যা কিছু আদায় হয়েছে, তা তাদের সন্তুষ্টচিত্তে আদায় হয়েছে। ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জওযী (রহঃ) হযরত উমর (রাঃ) এর মানাকিব-এ বর্ণনা করেছেন, হযরত আমর ইবনে মায়মূন (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) এর সাথে তাঁর শাহাদাতের কয়েকদিন পূর্বে সাক্ষাত করেন। তিনি দেখেন যে, হযরত উমর (রাঃ) হুযায়ফা ইবনে য়ামান ও উছমান ইবনে হানীফের সাথে উদ্বেগের সাথে বলছেন, আপনারা ইরাকে রাজস্ব আদায়ে কি পন্থা অবলম্বন করেন? আমার আশংকা হয়, আপনারা নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশী আদায় করেন কি না। তারা দুজনে বললেন- হযরত, তা হতে পারে না। হযরত উমর বললেন, যদি জীবিত থাকি তাহলে আমি এমন ব্যবস্থা করে যাবো যে, ইরাকের কোন বিধবা মহিলা কারো মুখাপেক্ষী থাকবে না। এ ঘটনার চারদিন পর হযরত উমর (রাঃ) শহীদ হন। (আশহারুল মাশাহীর ২খ. ২২০)

জ্ঞানবিদ্যা

কুরআন কারীম

ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র বিন্দু কুরআন কারীম। পরবর্তী যুগে এরই খেদমতের জন্য মুসলমানরা শত শত জ্ঞানবিদ্যা আবিষ্কার করেছে। একারণে সর্বপ্রথমে যে কিতাব লিপিবদ্ধ করা হয়, তা এ কিতাবুল্লাহ।

www.e-ilm.weebly.com

মহানবী (সঃ) এর যুগেই কুরআন কারীমের আয়াতসমূহ ও সূরাসমূহ বিন্যস্ত করা হয়েছিল। বেশ কতিপয় সাহাবীর কুরআন মজীদ পুরোপুরি মুখস্থ ছিল এবং বিপুল সংখ্যক সাহাবীর কুরআন কারীমের বিভিন্ন সূরা মুখস্থ ছিল। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, মহানবী (সঃ) প্রতি বছর রমজানে হযরত জিবরাঈলের উপস্থিতিতে পূর্ণ কুরআন কারীম পাঠ করতেন। যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন, সে বছর তিনি দুবার পূর্ণ কুরআন কারীম আবৃত্তি করেন। শেষবারের পূর্ণ আবৃত্তির সময় হযরত জায়দ ইবনে ছাবিত (রাঃ)ও উপস্থিত ছিলেন। তথাপি মহানবী (সঃ) এর জীবদ্দশায় পুরো কুরআন শরীফ একত্রিত ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। কারণ হিসেবে আল্লামা কাস্তলানী উল্লেখ করেছেন যে, যেহেতু সেসময় কুরআন কারীমের আয়াতসমূহ মানসুখ হতে থাকতো সেকারণে কুরআন কারীমকে এক পুস্তকের আকারে সংকলিত করা সমীচীন ছিল না। অবশ্য বিভিন্ন আয়াত ও সূরা সাহাবায়ে কেরামের নিকট খেজুরের ডাল, হাড় ও পাথরের টুকরায় লিপিবদ্ধ ছিল।

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর সময়ে য়ামামার যুদ্ধে সাতশত কারী সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হন। তখন হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে বলেন, যদি হাফেজগণের শহীদ হবার ধারা অব্যাহত থাকে, তাহলে আমি আশংকা করি কুরআন কারীম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কিনা। অতএব কুরআন কারীমকে এক পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করা হোক। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) কিছুটা ইতস্ততঃ করার পর তাঁর সাথে একমত হলেন। তিনি হযরত জায়দ ইবনে ছাবেত (রাঃ), যিনি অহীর লেখক ও শেষ পাঠের সাক্ষী ছিলেন, তাঁকে ডেকে এ দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করেন। হযরত জায়দ ইবনে ছাবেত (রাঃ) নিজের স্মৃতিকে অন্যদের স্মৃতির সাথে যাঁচাই ও মহানবী (সঃ) এর যুগে লিপিবদ্ধ কপিসমূহের সাথে তুলনা করার পর কালাম মজীদ এক পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেন।

কুরআন মজীদ সংকলনের কাজ সম্পন্ন হলেও তার কপিসমূহ প্রচারের কাজ অবশিষ্ট ছিল। এ সৌভাগ্য লাভ করেন হযরত উছমান (রাঃ) ইবনে আসাকির ও ইবনে আছীর-এর বর্ণনা অনুসারে এর বিস্তারিত ঘটনা নিম্নরূপ ঃ

হিজরী ৩০ সনে আজারবাইজান ও বাবুল আবওয়াব জয়ের উপলক্ষে বিভিন্ন ইসলামী রাজ্য শাম, মিসর ও ইরাকের সৈন্যরা একত্রিত হয়। এসময় তাদের কুরআন পাঠে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। মিসরীয়দের পঠন ভঙ্গি ছিল ভিন্ন, ইরাকীদের ভিন্ন, শামীয়দেরও ভিন্ন ছিল। পঠনভঙ্গিতে বিভিন্নতার কারণে কেরাআত বা পাঠরীতিতেও সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি হলো। তদুপরি তাদের সবাই নিজ পাঠরীতিকে বিশুদ্ধ এবং অন্যদেরটি ভুল বলে সাব্যস্ত করতে লাগলো। হযরত হুযায়ফা ইবনে য়ামান (রাঃ) এ দৃশ্য দেখে খুব চিন্তিত হলেন। প্রথমে

www.e-ilm.weebly.com

তিনি কূফায় কতিপয় নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামের সাথে আলোচনা করে তাঁদেরকে এ দুরবস্থা সম্পর্কে সচেতন করেন। অতঃপর তাঁদের পরামর্শক্রমে তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় গিয়ে সকল বৃত্তান্ত হযরত উছমান (রাঃ)-কে শোনালেন এবং বললেন, উম্মতের কল্যাণ চাইলে এ বিপদের বিহিত করুন। হযরত উছমান (রাঃ) সাহাবায়ে কিরামকে একত্রিত করে পরামর্শ করলেন। সবার পরামর্শে তিনি হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর সময়ে সংকলিত কুরআন কারীমের কপি হযরত হাফসা (রাঃ) এর নিকট থেকে চেয়ে নিলেন এবং তার আটটি কপি করে এক একটি কপি বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন।

এভাবে হযরত উছমান (রাঃ) এর সময়েই কুরআন কারীমের নির্ভরযোগ্য কপিসমূহ বিভিন্ন দেশ ও শহরে প্রচারিত হয়ে যায় এবং আল্লাহর এ কিতাব আল্লাহর ওয়াদা

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

"আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর হেফাজতকারী।"

মোতাবেক সকল প্রকারের বিকৃতি সাধন থেকে সংরক্ষিত হয়ে যায়। (নিহায়াতুল কাওলিল মুফীদ, শায়খ মক্কী ১৮৫–১৯১)

আল্লাহর গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা ব্যতীত খুলাফায়ে রাশেদীন তা মানুষের স্মৃতিতে সংরক্ষণের উপরও গুরুত্বারোপ করেন। সকল অধিকৃত ইসলামী দেশে কুরআনের তা'লীমের ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং ইবনে জওযীর বর্ণনা অনুযায়ী হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত উছমান(রা) মুয়াজ্জিন, ইমাম ও কুরআনের তা'লীমদাতাদের জন্য সম্মানীর ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু তাই নয়। হযরত উমর (রাঃ) তাদের জন্যও ভাতার ব্যবস্থা করেন যারা কুরআন শিক্ষালাভ করেন। এ উৎসাহদান ও সুবিধাপ্রদানের ফল দাঁড়ালো এই যে, ইসলামী দেশসমুহের মসজিদসমূহ ও মকতবসমূহ আল্লাহর কালামের আওয়াজে গুঞ্জরিত থাকতো। শুধুমাত্র দামেশকের জামে মসজিদ যেখানে হরত দাবু দারদা (রাঃ) কুরআন কারীম শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করতেন, সেখানে ষোলশত ছাত্র ছিলেন।

হাদীছ শরীফ

কুরআন কারীমের পরেই রসূলুল্লাহ (সঃ) এর হাদীছের মর্যাদা। হাদীছ মূলতঃ কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা। মহানবী (সঃ) এর জীবদ্দশায় মহানবী (সঃ) হাদীছ লিখতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ তখন কুরআনের আয়াতসমূহের সাথে তা মিশে যেতে পারতো। মুসলিম শরীফের বর্ণনা অনুসারে মহানবী (সঃ) বলেছিলেন।

"কেউ কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখে থাকলে তা যেন মুছে ফেলে।"

অবশ্য মৌখিকভাবে হাদীছ বর্ণনার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট পৌছে দেয়।'

www.e-ilm.weebly.com

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর সময়ে কুরআন কারীম লিপিবদ্ধ হয়ে গেলে হাদীছের লিখিত ও মৌখিকভাবে প্রচার প্রসার ব্যাপক ভাবে হতে থাকে। ইসলামী বিজয় উপলক্ষে সাহাবায়ে কেরাম দূর দূরান্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন এবং যেখানে যান সেখানে নবুওয়াতী ইলম সাথে করে নিয়ে যান। শাম, মিসর, ইরাক প্রভৃতি বড় বড় শহরে হাদীছের পাঠদান কেন্দ্র গড়ে উঠে। নও মুসলিমরা যারা ইসলামের আলো গ্রহণ করলেন, কিন্তু ইসলাম প্রবর্তকের বিশ্বজনীন সৌন্দর্য দর্শন করতে পারেননি এবং নতুন ইসলামী প্রজন্ম যারা সর্বোত্তম যুগের (খায়রুল কুরূন) কল্যাণ ও বরকতের পরে জন্মগ্রহণ করেন, তারা অতি আগ্রহের সাথে এ সকল ঈমানী মুনিমুক্তায় নিজেদের আঁচল পরিপূর্ণ করতে থাকেন।

খেলাফতে রাশেদা যুগে হাদীছের প্রতি এতই আগ্রহ ছিল যে, লোকেরা এক একটি হাদীছ শুনবার জন্য শত শত মাইল পথ সফর করতেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) একটি হাদীছের জন্য এক মাসের পথ সফর করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনায়স (রাঃ)-এর নিকট (শাম) গিয়েছিলেন। তেমনি হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রাঃ) একটি হাদীছ শুনবার জন্য এক দীর্ঘ সফর করেন। অপর এক মনীষী হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর নিকট থেকে একটি হাদীছ শুনতে মদীনা থেকে দামেশক সফর করেছিলেন। জনৈক সাহাবী হযরত ফাযালা ইবনে উবায়দ (রাঃ)-এর নিকট হাদীছ শুনতে মিসর সফর করেছিলেন। আবুল আলিয়ার বরাত দিয়ে কুতায়বা (জনৈক তাবেয়ী) বর্ণনা করেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাহাবায়ে কেরামের বরাতে কোন হাদীছ শুনতাম। কিন্তু আমরা নিজেরা সফর করে স্বয়ং সে সাহাবীর নিকট থেকে সে হাদীছটি না শুনে ধৈর্য ধারণ করতে পারতাম না।

অধ্যায় পরিচ্ছেদ বিন্যস্ত করে হাদীছের কিতাবসমূহের সংকলন যদিও অনেক পরের যুগে হয়েছে, তথাপি এ যুগেও অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী আলেম নিজ নিজ হাদীছ ভাণ্ডারকে সংকলনাকারে সংরক্ষণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রাঃ) ও হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (মিফতাহ-৮১)

ফিকাহ

কুরআন ও হাদীছের পরে ফিকাহর স্থান। মহানবী (সঃ) এর সময়ের পরে যেসকল নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সে সম্পর্কে ফকীহ সাহাবায়ে কেরাম কুরআন ও হাদীছের আলোকে যে বিধি বিধান আবিষ্কার করেন তা-ই ফিকাহ নামে পরিচিত। ফিকহ ইসলামী আইনের উপবিধির মত। খুলাফায়ে রাশেদীন নিজেরা ফকীহ ছিলেন। বিশেষ করে হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)

www.e-ilm.weebly.com

এর ফিকহী দৃষ্টি ছিল অতি প্রসিদ্ধ। তাছাড়া তাঁদের বিশেষ উপদেষ্টাগণও ফকীহ ছিলেন। কোন নতুন প্রশ্ন দেখা দিলে খুলাফায়ে রাশেদীন এ দলের সাথে পরামর্শ করে ফয়সলা করতেন, অতঃপর সে ফয়সলা সাধারণ্যে ঘোষণা করা হতো। খুলাফায়ে রাশেদীন বিভিন্ন সময়ে যে ভাষণ দান করতেন তাতেও প্রয়োজনীয় মাসায়েল বর্ণনা করতেন। এ সকল খুতবা যেহেতু বড় বড় সমাবেশে হতো, সে কারণে এ মাসআলাগুলো খুব প্রচার লাভ করতো। তাছাড়া ফিকাহ্ শিক্ষাদানের জন্য অধিকৃত এলাকার বিভিন্ন শহরে ফকীহ সাহাবায়ে কেরামকে পাঠানো হতো। সেমতে হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে কূফায়, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মা'কেল (রাঃ) ও হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)-কে বসরায়, হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হযরত মুআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) কে মিসরে পাঠান। এ সকল মনীষীর ইলমী ধারায় হাজার হাজার ইলম পিপাসু তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং এভাবে কয়েকটি শহর ইসলামী ফিকাহর কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠে।

অন্যান্য বিদ্যা

ইসলামের পূর্বে আরবে সাহিত্য ও কাব্যের প্রতি ব্যাপক আগ্রহ ছিল। হযরত উমর (রাঃ) এ উৎসাহকে এর সঠিক স্থানে ব্যয় করেছেন। তিনি কুরআন শরীফ বুঝবার জন্য সাহিত্য ও আরবী ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন এবং ঘোষণা করে দেন যে, যে ব্যক্তি আরবী ভাষা জানে না সে যেন কুরআন শরীফ না পড়ায়। (কানযুল উম্মাল ১খ. ২২৮)

হযরত উছমান (রাঃ) ও হযরত জায়দ ইবনে ছাবিত (রাঃ) কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 'ফরায়েজ'কে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে সংকলিত করেন।

হযরত আলী (রাঃ) ইলমে নাহু আবিষ্কার করেন। তিনি এক ব্যক্তিকে কুরআন শরীফ ভুল পড়তে শুনে চিন্তা করলেন যে, এমন বিদ্যা আবিষ্কার করতে হবে, যার সাহায্যে ই'রাব (বিভক্তি চিহ্ন)-এর ভুল পরিহার করা যায়। সেমতে আবুল আসওয়াদ দুয়িলীকে তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে এ বিদ্যা সংকলনের নির্দেশ দিলেন।

এ সকল জ্ঞান বিদ্যা আবিষ্কার ও প্রচার ছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের প্রতিও তারা যথেষ্ট মনোযোগ দেন। এজন্য যেহেতু কোন ইলমী ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল না, এজন্য নও মুসলিম ও অমুসলিমদের দ্বারাও একাজ নেয়া হয়। হীরা বিজয়ের পর সেখান থেকে একদল শিক্ষক আনা হয় এবং মদীনা মুনাওয়ারায় শিশুদেরকে লেখাপড়া শেখাতে তাদের নিযুক্ত করা হয়।

(মুহাজারাতে খাযারী ২খ. ১৪৫)

www.e-ilm.weebly.com

নির্মাণ

খেলাফতে রাশেদা যুগে বিজয়সমূহের সাথে সাথে নির্মাণের ধারাও অব্যাহত থাকে। এসকল নির্মাণকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়– যথা ধর্মীয়, দেশীয়, সামরিক ও কল্যাণমূলক।

(১) হযরত উমর (রাঃ) এর সময়ে যে সকল বড় বড় শহর বিজয় হয়, সেখানে জামে মসজিদও নির্মিত হয়। রওজাতুল আহবাব গ্রন্থ প্রণেতা এরূপ মসজিদের সংখ্যা চার হাজার বলে বর্ণনা করেছেন। দুই হারাম শরীফ (মক্কা ও মদীনা) ইসলামের কেন্দ্রবিন্দুরূপে পরিগণিত। মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার তুলনায় হারাম শরীফের ভবন যথেষ্ট ছিল না। হযরত উমর (রাঃ) আশেপাশের জমি কিনে ভবন সম্প্রসারিত করেন। এভাবে তিনি মসজিদে নববীতেও সম্প্রসারণ করেন। সেখানে বিছানা ও আলোরও ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর হযরত উছমান (রাঃ) তাঁর সময়ে মসজিদে নববী নতুন আঙ্গিকে নির্মাণ করেন এবং চুনা ও পাথরের সুদৃশ্য মজবুত প্রশস্ত ভবন নির্মাণ করেন।

(২) সামরিক প্রয়োজনে হযরত উমর (রাঃ) এর সময়ে কূফা, বসরা, ফুসতাত, জীজা ও মোসেলে নতুন শহর প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর কয়েকটির বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যেসব স্থানে ছাউনি প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেখানে দুর্গ ও ব্যারাক নির্মাণ করা হয়। প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে দারুল ইমারাত (গভর্ণর হাউজ), দেওয়ান (সেক্রেটারিয়েট), বায়তুল মাল ও কয়েদখানার মজবুত ও সুদৃশ্য ভবনাদি নির্মিত হয়। হযরত আলী (রাঃ) এর খেলাফতকাল অস্থিতিশীলতায় কেটে যায়। তথাপি সে সময়ে কতিপয় দুর্গ নির্মাণ করা হয়। এ গুলোর মধ্যে ইসতাখর -এর 'হিসনে যিয়াদ' উল্লেখযোগ্য।

(৩) এ সময়ে জনকল্যাণমূলক নির্মাণের প্রতি সর্বাধিক মনোযোগ দেয়া হয়। হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত উছমান (রাঃ) এর সময়ে রাস্তা, সেতু, কুঁয়া, চারণভূমি ও মেহমানখানা প্রচুর পরিমাণে নির্মিত হয়। হযরত উমর (রাঃ) এর সময়কার খালগুলোর মধ্যে নহরে মা'কিল, নহরে আবূ মূসা, নহরে সা'দ ও নহরে আমীরুল মুমিনীন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নহরে আমীরুল মুমিনীন সে বিরাট খাল যা নীল নদের ফুসতাত স্থান থেকে কেটে লোহিত সাগরের সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়েছিল। এ খাল ৬৯ মাইল দীর্ঘ ছিল এবং এমন প্রশস্থ ছিল যে, বড় বড় জাহাজ সহজে অতিক্রম করতে পারতো। হযরত উছমান (রাঃ) এর সময়ের 'মিহরাজ বাঁধ' যা দ্বারা মদীনাকে খায়বরের দিক থেকে আসা প্লাবন থেকে রক্ষা করা হয় এবং হযরত আলী (রাঃ) এর সময়কার 'ফোরাত সেতু' যা যুদ্ধের প্রয়োজনে নির্মাণ করা হয়েছিল এদুটিও তাদের উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

www.e-ilm.weebly.com

বিবিধ ব্যবস্থাপনা

মুদ্রা

ইসলামের পূর্বে আরবে ইরানী ও রোমান মুদ্রা চালু ছিল। হযরত উমর (রাঃ) এর সময়ে হিজরী ১৮ সনে ইসলামী মুদ্রা প্রস্তুত করা হয়। হযরত উমর (রাঃ) ইরানী দেরহাম ওজন করিয়ে দেখেন এর কোন কোনটি বিশ কীরাত, কোনটি বারো কীরাত, আর কোনটি দশ কীরাত। হযরত উমর (রাঃ) এ তিন মুদ্রা একত্রিত করে এর এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ চৌদ্দ কীরাত দেরহামের ওজন সাব্যস্ত করেন। এভাবে দশ দেরহামের ওজন দাঁড়ায় সাত মেছকাল। এ দেরহাম ইরানী দেরহামের নমুনায় প্রস্তুত করা হয়। কোনটির নকশা আলহামদুলিল্লাহ, কোনটির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কোনটির মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ করা হয়। হযরত উছমান (রাঃ) এর সময়ে যখন দেরহাম প্রস্তুত করা হয়, তখন তাতে আল্লাহু আকবার খোদাই করা হয়।

বস্তুতঃ খেলাফতে রাশেদা যুগে শুধুমাত্র দেরহাম প্রস্তুত করা হয়। দিনার প্রস্তুত করা হয়নি। দিনার বনূ উমাইয়ার সময়ে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের সময়ে প্রস্তুত করা হয়। (তারীখে ইসলাম আসসিয়াসী ২খ. ৩৭৫)

ডাক

ডাক বিভাগ পারস্যরাজ দারার আবিষ্কার। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ইরানে এ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইরানের পর রোম ও অন্যান্য সভ্যদেশে এর প্রচলন হয়।

ইসলামে হযরত উমর (রাঃ) সর্বপ্রথম এ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সর্বপ্রথমে এ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাঁদের এ ধারণা সঠিক নয়। কেননা হযরত উমর (রাঃ) এর সময়ের ঘটনাবলীতে বিভিন্ন স্থানে 'বারীদ' শব্দের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

হিজরী ১৮ সনে রোম সম্রাট মুসলমানদের প্রতি সন্ধির হস্ত প্রসারিত করেন। এ সময় হযরত আলী (রাঃ) এর কন্যা ও হযরত উমর (রাঃ) এর স্ত্রী রোম সম্রাজ্ঞীকে কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করেন। এ উপঢৌকন সামগ্রীতে একটি মূল্যবান হার ছিল। হযরত উমর (রাঃ) নিজ সাবধানপ্রিয় মনোভাবের তাগিদে হারটি রেখে দিলেন এবং মজলিসে শূরায় বিষয়টি পেশ করেন। মজলিসে শুরা সর্বসম্মতভাবে বললো যে, হার উম্মে কুলছুমকে দিয়ে দেয়া উচিত। কিন্তু বিষয়টি যেহেতু খলীফার ব্যক্তিগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ছিল, সেকারণে তিনি বললেন, 'কিন্তু দূত তো মুসলমানদের দূত এবং ডাকও তাদেরই ডাক।' অতঃপর তিনি নির্দেশ দিলেন যে, হারটি বায়তুল মালে শামিল করে নেয়া হোক এবং উম্মে কুলছুমকে

www.e-ilm.weebly.com

তার হাদিয়ার জন্য যা কিছু ব্যয় হয়েছে তা দিয়ে দেয়া হোক। (তারীখে তাবারী)

তেমনি হযরত উমর (রাঃ) জনৈক নসর ইবনে হাজ্জাজকে প্রেমের অপরাধে মদীনা থেকে দেশান্তর করে বসরা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নসর ইবনে হাজ্জাজ অস্থির হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে হযরত উমর (রাঃ) এর দূত বসরা শাসকের নামে ডাক নিয়ে আসে। তার ফিরে যাবার সময় হলে তার ঘোষক ঘোষণা করে দিল, 'জেনে রাখুন, মুসলমানদের ডাক এখন চলে যাবে। কারো কোন প্রয়োজন থাকলে সে পত্র লিখে দিক।'

নসর ইবনে হাজ্জাজও হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট এক পত্রে নিজ বেদনাগাঁথা লিখে পাঠায়। (আশহারুল মাশাহীর ২খ. ৩৭২)

এসকল ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত উমর (রাঃ) এর সময়ে ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য এর প্রথম দিককার দায়িত্ব ছিল আমেলগণের চিঠিপত্রাদি পৌঁছানো। তথাপি ডাক রওয়ানা হবার পূর্বে সাধারণ ঘোষণা করা হতো এবং সাধারণ জনগণের কেউ কোন পত্র পাঠাতে চাইলে পাঠাতে পারতো। এ বিভাগ একজন বিশেষ কর্মকর্তার অধীনে পরিচালিত হতো। তাকে আমেলুল বারীদ বা ডাক কর্মকর্তা বলা হতো।

তারিখ

আরবে ইসলামের পূর্বে বড় বড় কতিপয় ঘটনা থেকে সন গণনা করা হতো। প্রথমে কা'ব ইবনে লুওয়াই-এর মৃত্যু থেকে সন গণনা করা হতো। অতঃপর হস্তীবাহিনীর ঘটনা থেকে সন গণনা হতে থাকে। অতঃপর ফিজার বর্ষ চালু হলো। হযরত উমর (রাঃ) এর সময়ে যখন বিভিন্ন দফতর প্রতিষ্ঠা করা হলো এবং আয়-ব্যয়ের খাতা তৈরী করা হলো, তখন ইসলামী তারিখের প্রয়োজন অনুভূত হলো।

হযরত উমর (রাঃ) মজলিসে শূরা আহ্বান করলেন এবং এ বিষয়টি উত্থাপন করা হলো। বিভিন্ন জনে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। হযরত আলী (রাঃ) হিজরতের ঘটনা, যা ইসলামের উন্নতি ও অগ্রগতির তারকা উদয়ের কাল, তা থেকে ইসলামী তারিখ শুরুর প্রস্তাব করেন। হযরত আলী (রাঃ) এর মত পছন্দ করা হলো এবং ইসলামী তারিখের শুরু সাব্যস্ত করা হলো হিজরতের ঘটনা।

www.e-ilm.weebly.com

গ্রন্থপঞ্জী

১। শায়খুল হিন্দ অনূদিত কুরআন মজীদ;
২। সিহাহ সিত্তা;
৩। মানসুর আলী নাসিফ- আত-তাজুল জামিউ লিল উসূল;
৪। আবূ হানীফা দীনূরী–আখবারুত তিওয়াল;
৫। আবূ জাফর তাবারী- তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক;
৬। বালাজুরী- ফুতূহুল বুলদান;
৭। ইবনে আছীর- আল কামিল;
৮। ইবনে কাছীর- বিদায়া নিহায়া;
৯। রফিকবেগ- আশহারু মাশাহীরিল ইসলাম;
১০। মুহাম্মাদ খাযারী বেগ-মুহাজারাতুল উমামি'ল ইসলামিয়া;
১১। ঐ লেখক- ইতমামুল ওয়াফা ফী সীরাতিল খুলাফা;
১২। শিবলী নুমানী- আলফারূক।

সমাপ্ত

www.e-ilm.weebly.com

www.e-ilm.weebly.com